RAMYANI BEEKSHYA
Rajasthan Parva
(A Bengali Travelogue)
By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক :
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬৫

মূল্য : ১৫·০০ (পনেরো টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট : সুভাষ সিংহ রায়
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা-১৪

উৎসর্গ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

इयं विसृष्टिर् यत आबभूव
यदि वा दधे यदि वा न ।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्
सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥

ऋग्वेद १०।१२९।७

He, from whom this creation came into being.
Whether He upheld it or He did not,
He who oversees it in the eternal region,
He verily knows it or perhaps He does not know.

(Rigveda, X. 129.7)

রাজস্থানের স্থাপত্যশিল্প
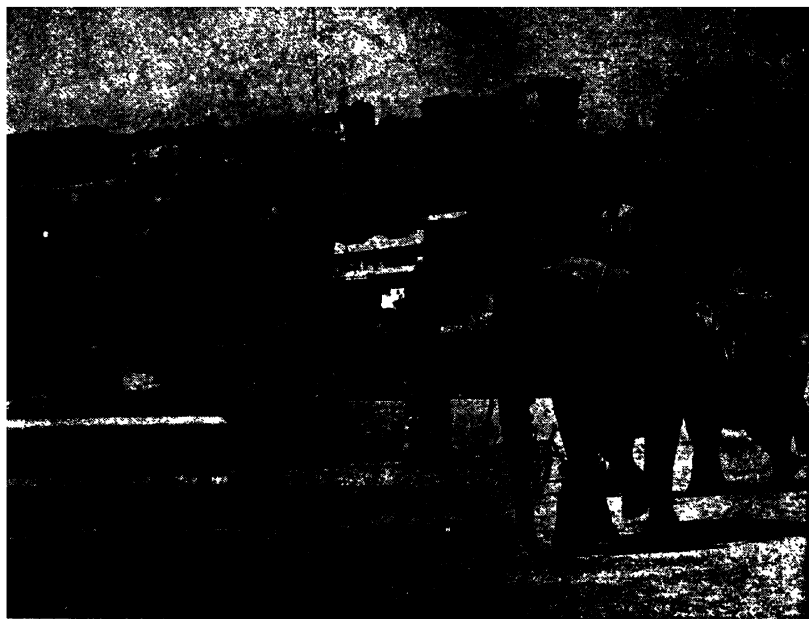
জয়পুরে অম্বর প্রাসাদ—বাহির ও ভিতরের দৃশ্য

[ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র
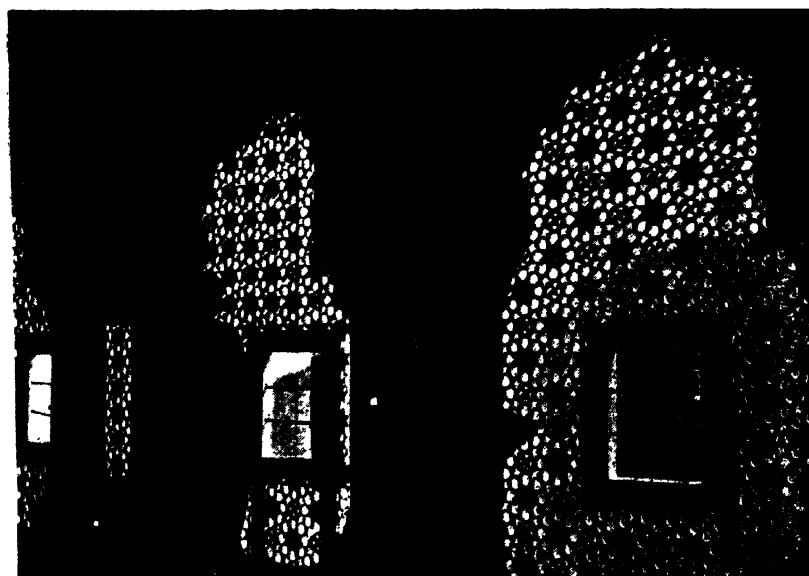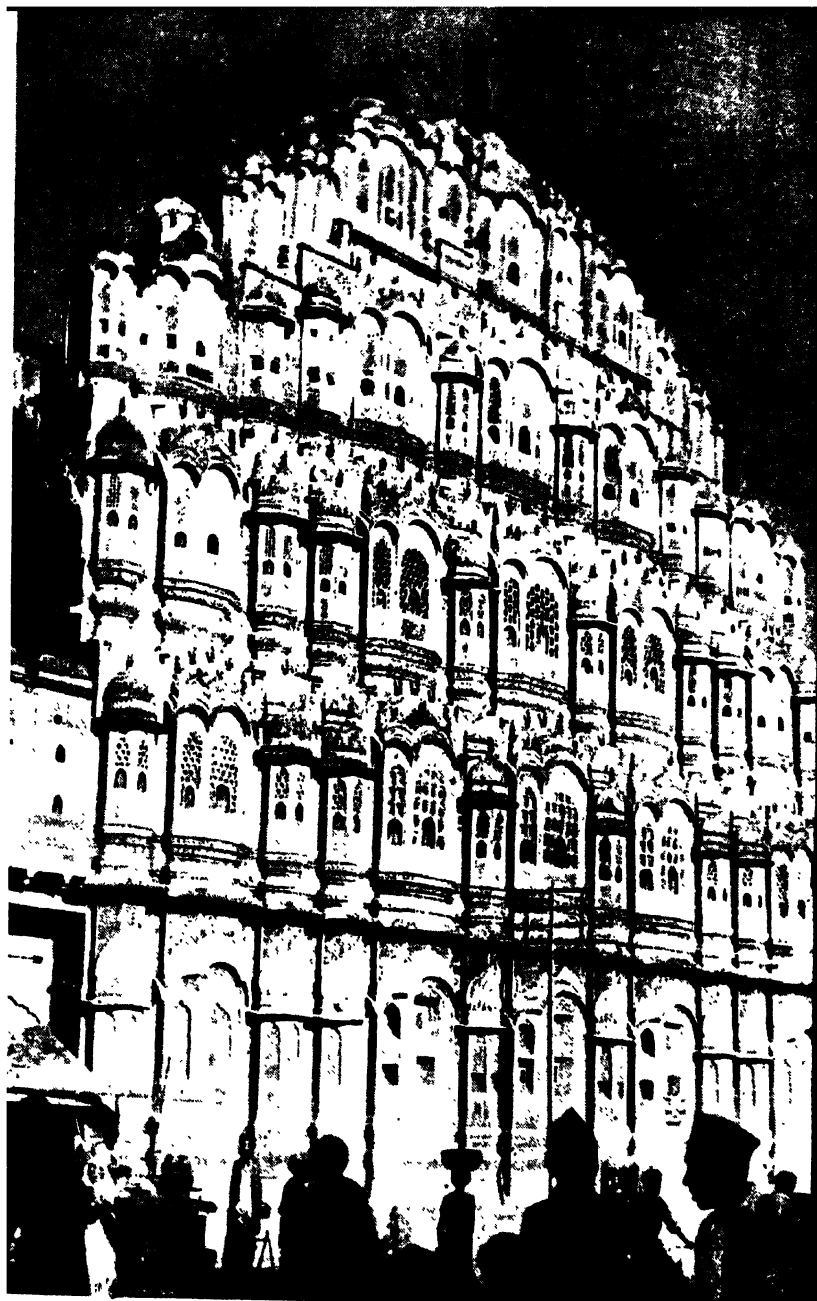
জয়পুরের হাওয়া মহল

আজমীরের আড়াই দিনকা ঝোঁপরা

পুষ্কর [ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র

চিতোর গড় [ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র

চিতোরের জয়স্তম্ভ [ফটো—ডঃ শীতাংশু
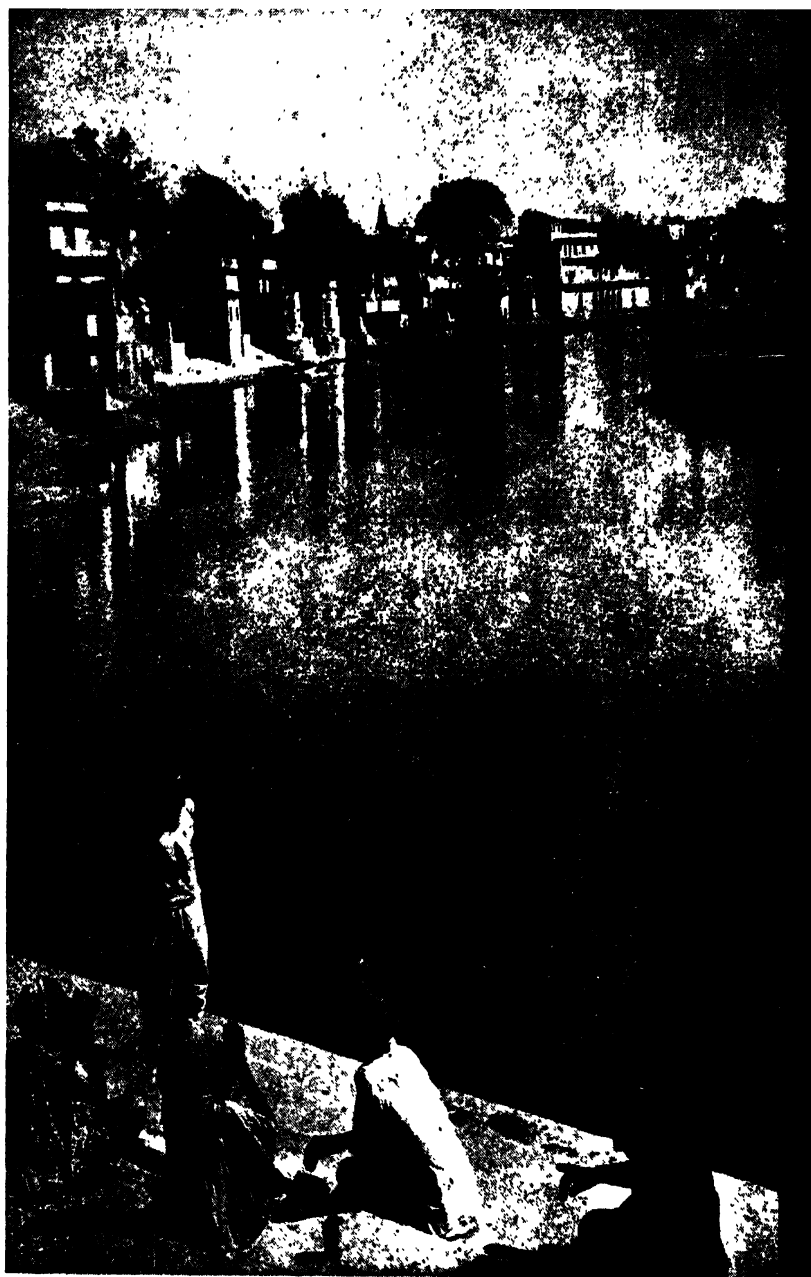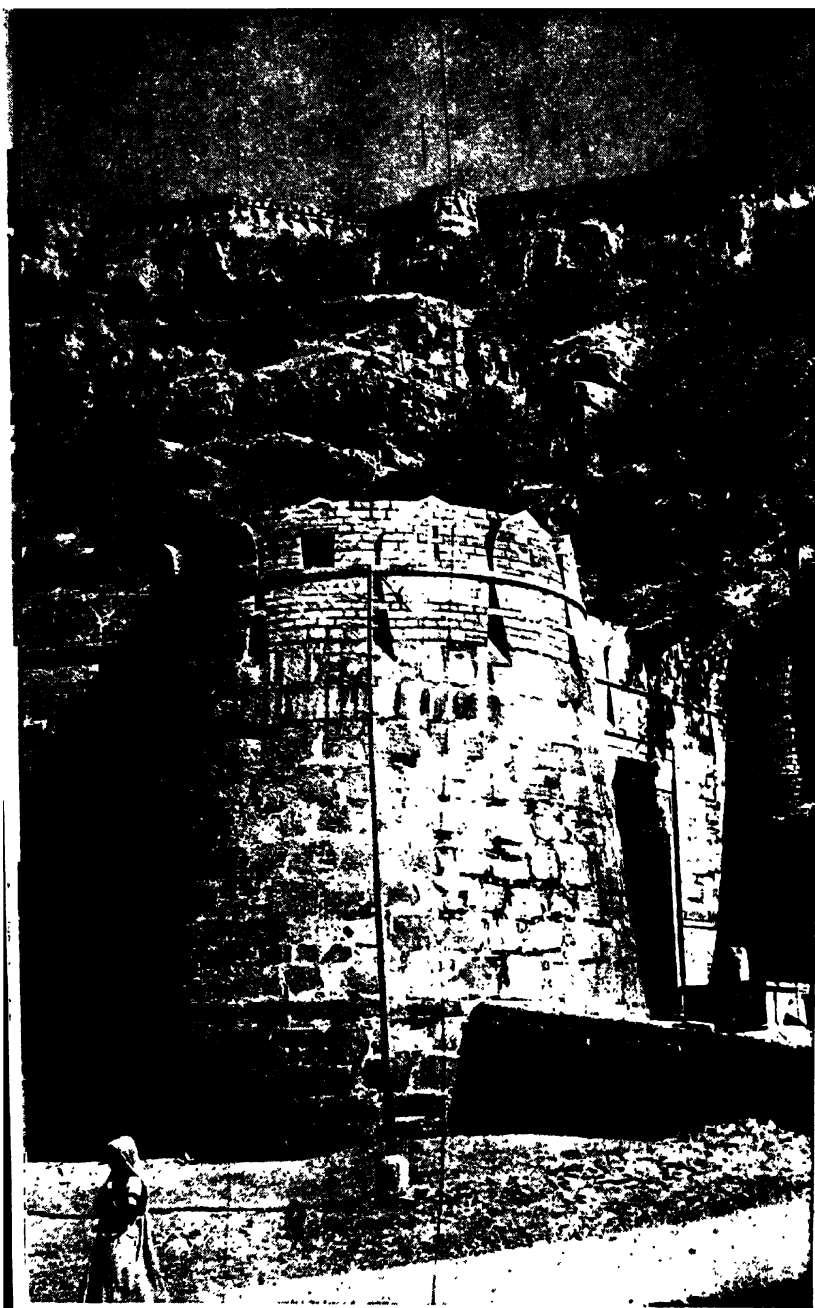
(উপরে) উদয়পুরের জগনিবাস [ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র

(নিচে) আবু পাহাড়ে দিলওয়ারা জৈন মন্দির

দিলওয়ারা জৈন মন্দির, আবু [ফটো—ডঃ শীতাংশু
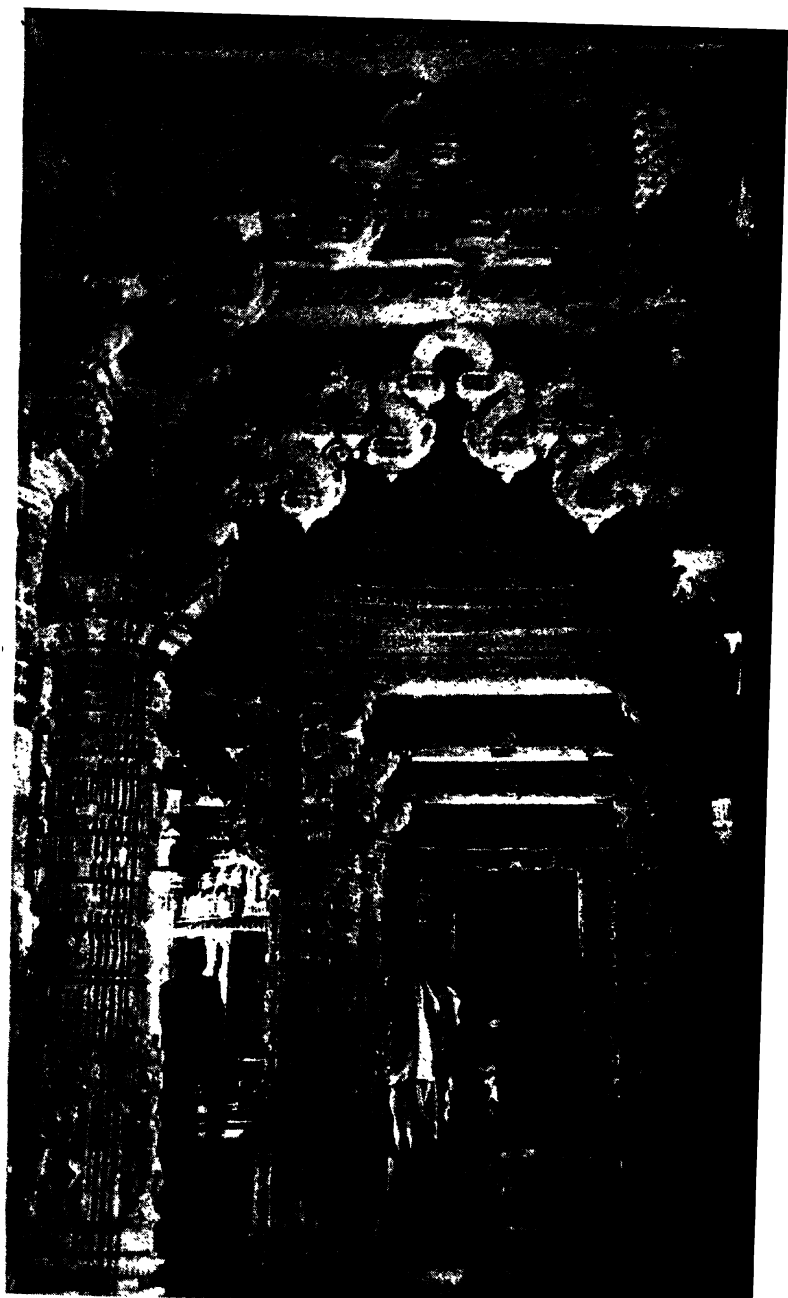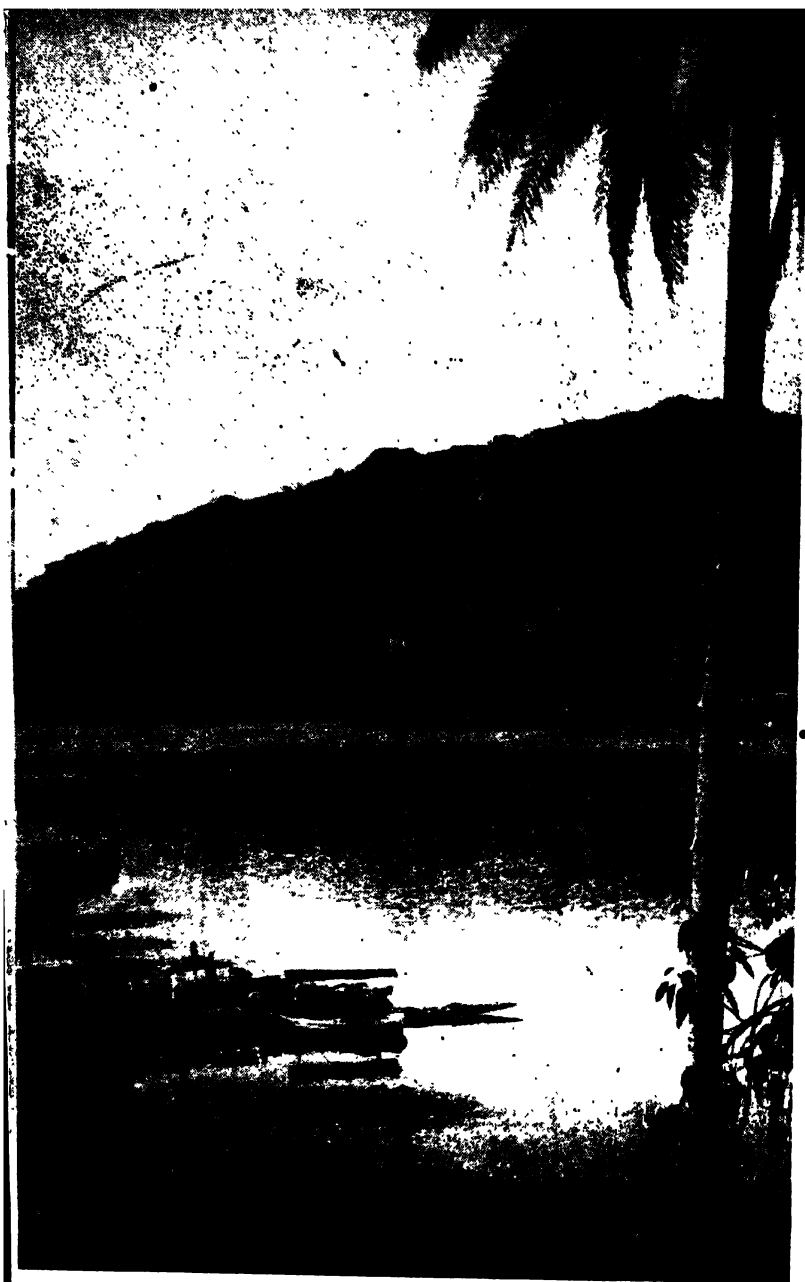
নখি লেক, আবু [ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র

(উপরে) বিকানীর দুর্গ (নিচে) যোধপুরের যশোবন্তথারা

রাজস্থানী গ্রাম্য পরিবার [ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র

১

দিল্লীতে স্বাতি বলেছিল, এবারের পূজোয় তারা সৌরাষ্ট্র যাবে রম্যাণি বীক্ষ্য করতে।

কথাটা অশুদ্ধ হলেও তার পরিহাসটুকু ভাল লেগেছিল। বলেছিলুম : তোমার রম্যাণি বীক্ষ্যর কি শেষ নেই?

স্বাতি হেসেছিল আমার প্রশ্ন শুনে। বলেছিল : শেষ! ভারতবর্ষের কি শেষ আছে?

তা বটে।

কিন্তু দোহাই তোমার : সেই সঙ্গে মিনতি জানিয়েছিল স্বাতি : তুমি এলে রাজস্থানের ওপর দিয়ে এসো না। এসো ডিঙিয়ে।

তার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, এমন অনুরোধ সে কেন করছে! কিন্তু কারণ তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় নি, সে নিজেই বলেছিল : রাজস্থান দেখলেই তো আবার ভ্রমণ-কাহিনী লিখবে। ও-দেশের ব্যাপারে আমার অরুচি ধরেছে।

এ কথার উত্তরে সেদিন আমি হেসেছিলুম। বোধ হয় আমাদের বিধাতাও হেসেছিলেন।

পূজোর আগেই স্বাতির চিঠি পেলুম। লিখেছে, খুব জোর তোড়জোড় হচ্ছে। লম্বা পাড়ি। মামী নাকি বলছেন, সোজা দ্বারকা। কিন্তু স্বাতি আবু পাহাড় বাদ দিতে রাজী নয়। আর মামার অন্য ভাবনা। পয়সা যখন ষোল-আনা দিতে হবে, তখন জয়পুর, আর আজমীর কী দোষ করল! হোক না দেখা জায়গা। অনেক দিন পরে দেখলে আবার নতুন লাগবে। চিঠি শেষ করে স্বাতি লিখেছে পুনশ্চ—এবারে তুমি সঙ্গে থাকবে না বলে আরও

ভাল লাগছে। চোখ জুড়িয়ে প্রাণ ভরে দেখতে পাব। তথ্য আর তত্ত্বের চাপে খাবি খেতে হবে না।

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। নিজের জন্য যতটা, তার চেয়ে বেশি লজ্জা পেয়েছিলুম আমাদের সমাজের জন্য। আমি জানি যে এ শুধু স্বাতির মুখের কথা নয়, এ আমাদের শিক্ষিত সমাজের কথা। এই যন্ত্রের যুগে তাদের ভাববার সময় গেছে ফুরিয়ে, ইচ্ছা মরে গেছে। এ যেন একটা নূতন যুগ। নতুন মানুষ ঠিক পুরনো মানুষের মতো নয়। মৌমাছির মতো মধু আহরণেই সারা দিন ব্যস্ত। কিসের জন্য এ মধু সঞ্চয়, সে প্রশ্ন মনে জাগে না। জীবনের লক্ষ্য বা আদর্শ, এ সব অবাস্তর চিন্তা। এই হালকা হাওয়ায় নেশা আছে, নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে দিতে ভাল লাগে। সবাই দিচ্ছে। আমিও যদি দিতে পারতুম তো আমারও লজ্জা থাকত না।

উত্তরে স্বাতিকে আমি লিখেছিলুমঃ রাম খেলাওনকে সঙ্গে নিয়ো।

স্বাতি এ চিঠির উত্তর দেয় নি।

একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয় নি। সেটা রাজস্থানের ব্যাপারে স্বাতির অরুচির কথা। রাজস্থানের গল্প অনেক পড়েছে, না বড়বাজারের ব্যবসার কথা তার মনে পড়েছে, তা বলে নি। আসল অরুচিটা যে ভ্রমণ-কাহিনীর উপর, তাতে সন্দেহ নেই।

সেদিন এই কথাটা গভীর ভাবে ভেবে দেখি নি। ভেবে দেখবার প্রয়োজন মনে করি নি। সেদিন আবহাওয়াটা ছিল তরল। মন্তব্যটা তাই পরিহাস বলেই গ্রহণ করেছিলুম। কিন্তু আজ রাজধানী থেকে প্রায় ন শো মাইল দূরে আমার উত্তরপাড়ার ঘরে বসে অন্য কথা মনে এল। মনে হল, স্বাতির এই মন্তব্যের পিছনে বুঝি একটা অপ্রিয় সত্য আছে। সেই সত্যটা সেদিন ধরা পড়ে নি।

রাজস্থানের কত গল্প পড়েছি শৈশবে। কত বীর কত

বীরাঙ্গনার কাহিনী। পড়তে পড়তে রোমাঞ্চ হত, বুক ফুলে উঠত গর্বে। রাজপুতকে সেদিন নিজের প্রতিবেশী মনে হত, রাজস্থান ভাবতুম বাঙলা দেশে। কিন্তু ঈশা খাঁর গল্প পড়ে সে ভুল ভেঙেছিল। বাঙালী পাঠান ঈশা খাঁ রাজপুত মানসিংকে হারিয়ে দিয়েছিলেন সম্মুখ সমরে। তবু রাজস্থানকে আমার বিদেশ মনে হয় নি।

এ সমস্ত ধারণা পালটে গেল কালোবাজার দেখবার পর। রাতারাতি সব গল্প ভুলে গেলুম। রাজপুত বলে যে একটা জাত ছিল রাজস্থানে, সে কথা আর মনে রইল না। তার বদলে একটা নতুন জাত চোখের সামনে সারাক্ষণ জেগে রইল। তাদের কারও হাতে তরোয়াল নেই, নেই ঢাল আর বল্লম। তার বদলে ওজনের দাঁড়ি পাল্লা আর গজের মাপকাঠি নিয়ে তারা বড়বাজারে জাঁকিয়ে বসেছে। লোকে বলে, এরাও রাজস্থানে ছিল সেই সব দিনে। আমি বলি, সেই সব রাজপুত আজ কোথায় গেল!

রাজস্থানের যে সব গল্প আজ বাঙলায় পড়ছি, তাতে গা ঘিন ঘিন করে। গল্পের জন্য নয়, গল্পের মানুষগুলোর জন্য। বাপ্পা রাও বেঁচে নেই, বেঁচে নেই সমর সিংহ ও কর্মদেবী। ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর গল্প মিথ্যা বলেছেন এ যুগের ঐতিহাসিক। হামির রাণা কুম্ভ রাণা সঙ্গ রাণা প্রতাপ ভীমসিংহ ও কৃষ্ণকুমারী—কেউই আজ বেঁচে নেই। তাঁরা কাদের রেখে গেলেন! রাজস্থানের রাজকাহিনীর উত্তরাধিকারী কি আজকের বাঙলা গল্পের নায়ক নায়িকা!

মনে হল, স্বাতি ঠিকই বলেছে। কাজ নেই রাজস্থানের কথা ভেবে। সোনার অতীত যার মুছে যাচ্ছে, তার বর্তমান না হয় নাই দেখলুম!

কিন্তু আমি এ কথা কেন ভাবছি! আমি তো তাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। এবারে আমার প্রয়োজন নেই তাদের কাছে। এবার রামখেলাওন আছে। আমার চেয়ে সে অনেক বেশি কাজের হবে।

তবু যেন কোথায় একটু খোঁচা রইল। একটু বেদনা। প্রয়োজনটাই কি সব! প্রয়োজন ছাড়া কি আর কিছুর প্রয়োজন নেই জীবনে!

কলকাতায় এখন অরাজকতা চলছে। পথ ঘাট নিরাপদ নয়, নিরাপদ নয় কর্মক্ষেত্র। একটা না আরেকটা গোলমাল লেগেই আছে। কেউ সমাজকে দায়ী করছে, কেউ রাজনীতিকে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কেউ পারছে না। কেউ কোন চেষ্টা করছে কিনা তাও জানা নেই।

গত বছর পূজোর ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে বেরোতে পারি নি। মনে মনে সে দুঃখ তাদের আছে। তারা বাউণ্ডুলে বন্ধু। অনেক দিন আগেই আমায় ত্যাগ করেছে। আমি নাকি বদলে গেছি। পরিবর্তনটা মনের দিক থেকেই হয়েছে সবটা। সাত পাঁচ ভেবে যারা বেরোয়, তারা কি বাউণ্ডুলে! রব শুনলুম, চল্ চল্। কোথায় চল্ তার ঠিক-ঠিকানা নেই, দরকারও নেই। এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর দেখা যাবে। এরাই তো বাউণ্ডুলে, এরাই জানে বিলাস। আমি নাকি হিসেব করতে শিখেছি, শিখেছি ভবিষ্যৎ ভাবতে। তাদের দলের খাতা থেকে আমার নাম কাটা গেছে।

মনোরঞ্জনের সঙ্গে সেদিন এই কথাই হচ্ছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে দুঃখ জানিয়ে বললুম: সেপ্টেম্বরের আজ সাতাশ তারিখ। শুক্রবার। কাল এক বেলা কাজ করেই পূজোর ছুটি হবে। ছুটিটা কি বাড়ি বসেই কাটবে!

এ সপ্তাহের সাপ্তাহিক ফল দেখেছ?

মনোরঞ্জন জানতে চাইল।

আমি এ সবে আর উৎসাহ পাই নে। বললুম: না।

কোন একটা কাগজে সে নিজে আজকাল সাপ্তাহিক ফল লেখে। নানা রকম বইপত্র পড়ে, নানা মতামত বিচার করে নির্ভুল হবার চেষ্টায়। বলল: তোমার ঠিকুজী আছে?

বোধ হয় আছে।

বোধ হয় বলছ কেন?

বললুম: এক কালে ছিল। আশা করছি সেটা খুঁজে পাব।

বালিতে মনোরঞ্জন নামল না। আমার সঙ্গে উত্তরপাড়াতেই আজ উজিয়ে এল। আমার সমস্যা সমাধানের চেয়ে অঙ্ক কৌতূহল তার বেশি দেখলুম। বাড়ি পৌঁছেই তাড়া দিল: ছকটা বার কর তো!

আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

প্রস্তাবটা মনোরঞ্জনের পছন্দ হল না, বলল: ছকটা দিয়ে চায়ের জন্যে যাও। আমার তাড়া আছে।

ছক আমার টেবিলে ছিল একটা ক্লিপে আঁটা। খুঁজে বার করতে সময় লাগল না। একখণ্ড কাগজ পেনসিল নিয়ে মনোরঞ্জন অঙ্ক কষতে বসে গেল।

হারানিধির দোকান থেকে ফিরে এসে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মনোরঞ্জন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। গণনার সরঞ্জাম তার ঝোলার ভিতর থাকে। এক শো বছরের পঞ্জিকা বার করে জন্ম সময়ে আমার গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ মিলিয়ে দেখছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই বলল: রাত সোয়া তিনটেয় কি তোমার জন্ম? ছকে দেখছি, রাত্রি কুড়ি পলাধিক তেইশ দণ্ডাতীত।

বললুম: শেষ রাতে বলেই তো শুনেছি।

মনোরঞ্জন বলল: ছকে তোমার নক্ষত্রের উল্লেখ নেই। লিখে রাখ পূর্বাষাঢ়া।

তার পাশে বসে আমি প্রশ্ন করলুম: তারপর?

চিন্তিত ভাবে মনোরঞ্জন উত্তর দিল: আর একটা খটকা লেগেছে। তোমার শনি সপ্তমে হওয়া উচিত, অষ্টমে নয়।

আমি আপত্তির সুরে বললুম: আমার কুষ্ঠি করেছেন—

যেই করুন। আমি মিলিয়ে নিচ্ছি। কিছু দিন আগে কি তুমি

খোঁড়া হয়েছিলে? এই ধর পাঁচ-সাত বছর আগে, মানে যখন তোমার শনির দশায় ছিল রাহুর অন্তর্দশা?

একটু স্মরণ করে বললুম: তা হয়েছিলুম বটে। বাস থেকে নামবার সময় পিছলে পড়ে পা ভেঙেছিল। প্রায় মাস দুই হাসপাতালে ছিলুম।

তখনও আমি চাকরি করি নে, পরিচয় হয় নি মনোরঞ্জনের সঙ্গে। আর খুঁড়িয়েও যখন চলি নে, তখন আশ্চর্য হবার কথা বইকি। বুঝতে পেরে মনোরঞ্জন বলল: আশ্চর্য হবার এতে কিছু নেই। সপ্তমে শনি থাকলে যে অবশ্য খোঁড়া হয়—এ খনার বচন।

গণনায় আর মনোরঞ্জনকে আমি বাধা দিলুম না। বাধা দিল হারানিধির দোকানের ছোকরা চা আর খাবার এনে। মনোরঞ্জন সব গুটিয়ে ঝোলায় ভরল। আর ছকখানি ফিরিয়ে দিল আমার হাতে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কী দেখলে?

মনোরঞ্জন হেসে বলল: জ্যোতিষে না তোমার বিশ্বাস নেই! এক খোঁড়া হবার কথাতেই মত বদলে গেল!

লজ্জা পেলেও সে ভাব প্রকাশ করলুম না।

খেতে খেতে মনোরঞ্জন বলল: উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখছি নে।

তারপরেই বলল: তোমার হাতটা দেখি!

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে আমি হাত বাড়ালুম। নিজের বাঁ হাত দিয়ে একটা চিহ্ন পরীক্ষা করে বলল: মিলে যাচ্ছে। সামনেই তোমার সমুদ্রভ্রমণ আছে।

বল কি!

আমি চমকে উঠলুম। খানিকটা চা ছল্‌কে উঠে মাটিতে পড়ল।

মনোরঞ্জন হাসল। বলল: গঙ্গাসাগর হলেও হবে।

মনোরঞ্জন চলে গেলে ভাবলুম যে, জগতে বিচিত্র কিছুই নয়। হয়তো সমুদ্রভ্রমণই আছে। গঙ্গাসাগরের সমুদ্র। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই তার গণনার ভুল ধরা পড়ল। মামার জরুরী তার পেলুম জয়পুর থেকে। লিখেছেন, পরিবারের বিপদ, এখুনি যেন চলে আসি।

কী বিপদ, কার বিপদ, মামা সে কথার উল্লেখ করেন নি। কী করে আমি তাঁদের উদ্ধার করব, তারও কোন ইঙ্গিত নেই। জয়পুরে কোথায় আছেন, বোধ হয় তাড়াতাড়িতে তাও লিখতে ভুলে গেছেন।

স্বাতিরা তা হলে ভ্রমণে বেরিয়েছে। রাজস্থান ভ্রমণ। তাদের সাহায্যে গেলে আমার মরুভ্রমণ হবে, সমুদ্রভ্রমণ নয়। মনোরঞ্জন থাকলে বলতে পারতুম, তার গণনায় ভুল হয়ে গেল। কাল নিশ্চয়ই বলব।

হাওড়া থেকে আজ আর কোন ট্রেন নেই। থাকলেও এখন গিয়ে ধরা যাবে না। টাকাও চাই। অফিসে কাল হয়তো মাইনে পাব। মাইনের দিন। কথায় কথায় হরতাল আর ধর্মঘট না থাকলে 'হয়তো' বলতুম না, বলতুম নিশ্চয়ই পাব। বাংলা দেশে এখন অরাজকতা, অস্পষ্ট তার ভবিষ্যৎ। আমাদের ভবিষ্যতের মতো।

২

পরদিন সকাল বেলাতেই ট্রেনের খোঁজ নিলুম। সকালের তুফান এক্সপ্রেসের পর বিকেল বেলায় একখানা স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে, যাবে ঠিক দিল্লী মেলের মতো, দিল্লী মেলের আগে আগে। এ গাড়িতে গেলেও জয়পুর পৌছব একই সময়। কাজেই মনস্থির করতে সময় লাগল না। এবারে আর খালি হাতে নয়। সুজনি জড়িয়ে একটা বালিশ আর ক্যানভাসের একটা ব্যাগ হাওড়া স্টেশনে জমা করে অফিস গেলুম।

পূজোর জন্য স্পেশাল ট্রেন ছাড়ছে গোটাকয়েক। আমার ট্রেন বিকেল চারটে পঞ্চাশ মিনিটে ছাড়বে আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় মৈত্র মশায়ের কাছে মূল্যবান উপদেশ পেয়েছিলুম। তাই অফিসের ছুটি হতেই সরাসরি স্টেশনে এলুম, বেলা তিনটের আগেই। কিন্তু ইয়ার্ডে গিয়ে জায়গা দখল করবার সাহস হল না। কোন্ গাড়িতে উঠতে কোথায় উঠে বসব, শেষে হয়তো পস্তাতে হবে।

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এল বেলা প্রায় সাড়ে চারটের সময়। সে কী যুযুৎসুর দৃশ্য। চলতি গাড়িতেই প্ল্যাটফর্মের অর্ধেক মেয়ে পুরুষ উঠে গেল। বছরের পর বছর আমরা লোকাল ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছি। বাদুড়ের মতো ঝুলে চলতে পারি, প্রাণের মায়া ছেড়ে চলতি গাড়ির হাতল ধরতে পারি। কিন্তু এই থ্রু ট্রেনে জায়গা দখলের কসরত করতে এখনও শিখি নি।

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগল এক ভদ্রলোককে দেখে। দু হাতে দুই হাতল ধরে বুক ফুলিয়ে তিনি এলেন। আমার পাশের একদল মহিলাকে দেখে হাত নেড়ে বললেন : চলে আসুন।

মহিলারা তৈরি হয়েই ছিলেন। বোঁচকা-বুঁচকি তাঁদের কাঁধে

কাঁকালে। দু সারিতে ভাগ হয়ে ভদ্রলোকের দিকে ছুটলেন। দু একজন নয়, আমি হিসেব না করেও বুঝলুম যে তাঁরা ত্রিশ-চল্লিশ জন হবেন। সকলের পিছনে আরও দুজন ভদ্রলোক দেখলুম।

নিজের জন্য জায়গা দেখার কথা আমি ভুলে গেলুম। আমিও তাঁদের পিছু নিলুম।

ভিতর থেকে সেই গাড়িটির দরজা বন্ধ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে কেউই দরজা খোলবার জন্য বললেন না। সেই ভদ্রলোকও হাতল ছেড়ে নিচে নামলেন না। সিনেমার হলে ঢোকবার জন্য সেকেণ্ড শোর দর্শকরা যেমন অপেক্ষা করে থাকেন, এই মহিলারাও দেখলুম, তেমনই শান্ত ভাবে অপেক্ষা করছেন। আমিও সারির পিছনে আছি।

আশেপাশের ভিড় একটু কমতেই হাতল-ধরা ভদ্রলোক বললেন : শিশির, খোলহে এবার।

ভিতরের ভদ্রলোক প্রথমে একটি জানলা খুলে প্রসন্ন মুখে বললেন : আছেন তো সবাই!

তারপর দরজা খুললেন।

এমন কুচকাওয়াজ আমি সৈন্যদেরও দেখি নি। মহিলারা সারিবদ্ধ ভাবে ভিতরে চলে গেলেন। পিছনের দুই ভদ্রলোক সমেত আমি অগ্রসর হতেই হাতলের সেই ভদ্রলোক তাঁর শক্ত হাতখানা বাড়িয়ে বললেন : আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

তাই তো, আমি কোথায় যাচ্ছি!

কিন্তু আমাকেও তো যেতে হবে। বললুম : আপনাদের সঙ্গে।

দ্বারকা সোমনাথ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভিতর থেকে শিশিরবাবুর হুঙ্কার শোনা গেল। বললেন : কী করছ বিমল, ভেতরে এসে বন্ধ কর দরজা।

বিমলবাবু তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনই ছিলেন। তা না হলে আমিও ঢুকে পড়তে পারতুম। এবারে পথ দেখিয়ে বললেন: অন্য গাড়ি দেখুন।

দেখতেই হবে। কিন্তু আমি ভাবলুম এই দলের কথা। সব বয়সের মহিলা আছেন এই দলে, বিধবা সধবা ও কুমারী। কিন্তু কাচ্চাবাচ্চা নেই। আর বলিহারি দিই এই চারজন পুরুষকে, যাঁরা এই ত্রিশ-চল্লিশটি মহিলাকে নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন।

দরজা তাঁদের বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই আমাকে অন্য গাড়ির চেষ্টায় এগোতে হল। সবচেয়ে করুণ দেখলুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থা। এক একখানা কামরা চারজনে দখল করে বসেছেন, পঞ্চম ব্যক্তির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রথম শ্রেণীর টিকিট হাতে রেল কর্মচারীদের মিনতি করছেন করুণ ভাবে—একটুখানি জায়গা চাই। ধানবাদ বা গোমো পর্যন্ত বসবার ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু তার বেশি যাওয়া চলবে না। অথচ ভদ্রলোককে যেতেই হবে।

পরের ট্রেন?

সে দিল্লী মেল। তাতে অবস্থা আরও খারাপ। বর্ধমান পর্যন্ত যাওয়াই কঠিন হবে।

তারপর?

তারপরও তাই।

কাল কোনও গাড়ি?

দশ দিন পর্যন্ত এই অবস্থা। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

মনে মনে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবলুম। গাড়িতে উঠবার আমার অবাধ স্বাধীনতা। আইন আমার প্রতিবন্ধক নয়, শক্তি থাকলেই আমি উঠতে পারব, চলতে পারব। তৃতীয় শ্রেণীর সমাজ আমাকে অস্বীকার করবে না। আমি যে-কোন গাড়িতে উঠে বসতে পারি, কিন্তু এই ভদ্রলোক পারেন না। তাঁর ওই প্রথম

শ্রেণীর টিকিটখানাই তাঁকে অস্পৃশ্য করেছে। আমাদের সমাজ থেকে তাঁকে আলাদা করেছে।

একজন তাঁর টিকিটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করল: আপনি টিকিট পেলেন কোথা থেকে?

ভয়ে ভয়ে ভদ্রলোক বললেন: রেল কোম্পানি দিয়েছে।

একজন হাসলেন, আর একজন বললেন: টিকিট তো রেল কোম্পানিই দেবে। কিন্তু কোথা থেকে পেলেন? কারও দেবার তো হুকুম নেই!

ভদ্রলোক এক ট্রাভেল এজেন্টের নাম করলেন, তারা রিটার্ন-টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ভদ্রলোক কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরবেন।

আমার মন টানছিল সেই দলের দিকে। ভাবছিলুম, ওরাই আমার সঙ্গী হবে ভাল। ভাল করে অনুরোধ করলে একটুখানি জায়গা কি আর পাব না! আমি সেই গাড়ির দিকেই আবার ফিরে গেলুম।

বিমলবাবু আমায় দেখতে পেয়েছিলেন, বললেন: জায়গা পেলেন না কোথাও?

হাতজোড় করে আমি বললুম: দলে আর একজনকে নিতে কি আপনাদের বেশি আপত্তি?

সত্যিই তো!

ভদ্রলোক দরজা খুলে আমায় তুলে নিলেন।

ওধার থেকে শিশির আসছিলেন ছুটে। কিন্তু মালপত্র ডিঙিয়ে আসতে তাঁর সময় লাগল। ততক্ষণে আমি নিজের জন্য একটুখানি স্থান করে নিয়েছি। চারি দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করেই বুঝতে পারলুম যে এই জনতার ভিতর মতান্তর আছে, কিন্তু সৌজন্য রক্ষায় কেউই কথা কইছেন না।

কোণার দিকে এক বৃদ্ধা বেশ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন : বাবা বিমল, যাত্রী আর বাড়িয়ো না, শেষে বেসামাল হয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে বিমল বললেন : ঘাড় থেকে দুজনকে নামালুম মাসিমা।

তাঁর রহস্যটুকু বুঝতে পারা গেল না। সকলেই তাকালেন তাঁর দিকে।

বিমল বললেন : ন জনের বদলে এবারে সাত জনের ভার বইতে হবে।

ইতিমধ্যে যাত্রীর সংখ্যা আমি গুনে ফেলেছি। মহিলার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ, পুরুষ চার। বিমল ঠিকই বলেছেন, প্রত্যেক পুরুষের উপর ন জন মহিলার ভার। আমি দলভুক্ত হলে দুজন কমবে। দায়িত্ব ভাগ হবে পাঁচজনের ভিতর।

একজন মহিলা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন। সেই সঙ্গে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মহিলা বিধবা, কিন্তু বৃদ্ধা নন। আমি তাঁর বয়স অনুমান করতে পারলুম না, কিন্তু সেই হাসির অর্থ অনুধাবন করতে চাইলুম। এই সুশ্রী মহিলার মুখে হাসিটি ভাল মানিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গিনীদের কাছে এই আচরণের সমর্থন তিনি পেলেন না। যাঁরা হাসবেন বলে ভাবছিলেন, তাঁরাও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গাড়ি কয়েক মিনিট দেরি করে ছাড়ল এবং পরক্ষণেই একটা পরিবর্তন দেখলুম ভিতরে। কেউ উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধের থলিটা ঝুলোলেন দেয়ালের হুকে, কেউ পুঁটলিটা তাঁর কোল থেকে নামালেন মেঝের উপর। কেউ 'আমার বাক্সটা!' কেউ বা 'এই আপনার পানের ডিবে', বলে নিজের জায়গাতেই নড়ে চড়ে বসলেন। বোঝা গেল, ভিড় হবার ভয়ে এতক্ষণ তাঁরা শক্ত হয়ে বসে ছিলেন। এবারে আরাম পেয়ে সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। সেই বিধবা মহিলাটি আর এক দফা হেসে উঠলেন।

এবারে আমি আর তাঁর মুখের দিকে চাইলুম না, তাকালুম আর সব মহিলাদের দিকে। যাঁদের বয়স কম, তাঁরা মুখ টিপে হাসলেন, আর বয়স্থারা আরও একটু কঠিন হলেন। চুপ করে থাকতে পারলেন না কোণার মাসিমা। গম্ভীর ভাবে বললেন: বাড়ির বাইরে বেরিয়েছ, সে কথা ভুলো না শান্তি।

পাশ থেকে বিমল বললেন: ভয় পাবেন না শান্তিদি, মাসিমা হয়তো সারা রাস্তা আপনাকে টুকবেন, হেরে গেলে চলবে না।

এমন করে বললেন যে মাসিমার কানে সে কথা গেল না।

এঁরা যে এক পরিবারের লোক নন তা বুঝতেই পাচ্ছি। মনে হচ্ছে এক পাড়ার। নাও হতে পারেন। সবাই যে সবাইকে চেনেন, তাও মনে হচ্ছে না। তবে পরিচিতও অনেক আছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা কইতে শুরু করেছেন।

আমি শান্তিদির কথা ভাবছিলুম। এমন করে তিনি হেসে উঠলেন কেন! প্রথম বার না হয় বিমলের রসিকতা শুনে হেসেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় বার! তার চেয়েও আশ্চর্য লাগল এই ভেবে যে, দলের কেউই তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। কারও কি কোন কৌতূহল নেই তাঁর সম্বন্ধে! আমি আর একবার শান্তিদির মুখের দিকে তাকালুম, আর তখুনি দৃষ্টি নামিয়ে নিলুম। ঘোমটার নিচে থেকে এক প্রবীণ মহিলা আমাকে লক্ষ্য করছেন। তাঁর চওড়া লাল পাড় শাড়ি, ভারি চেহারা, কপালে সিঁদুরের বড় টিপ তৃতীয় নেত্রের মতো জ্বল জ্বল করছে। আমি দেখতে পেলুম, তিনিও তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন একই সঙ্গে।

বিমল আমার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। বললেন: আপনি কত দূর যাবেন?

বললুম: আপাতত জয়পুর।

বাস্!

তারপর—

তারপর বলুন।

সাগ্রহে বিমল সোজা হয়ে বসলেন।

বললুম: দ্বারকা সোমনাথ।

তাই বলতে হয়। তা না বলে প্রথমেই যে একেবারে হতাশ করে দিয়েছিলেন।

আমি চুপ করে ছিলুম। বিমল বললেন: তীর্থ করতে বেরিয়েছেন, না দেশ দেখতে?

বললুম: প্রয়োজনে।

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললেন: বলেন কি! দ্বারকা সোমনাথে যাচ্ছেন প্রয়োজনে! আপনার কি কোন ব্যবসা আছে সেখানে?

আমি হেসে জবাব দিলুম: প্রয়োজন আমার নয়, আমার মামার। বেড়াতে বেরিয়ে জয়পুরে তাঁরা আটকা পড়েছেন। আমি তাঁদের সাহায্যের জন্য যাচ্ছি।

ইতিমধ্যে অনেকেই আমাদের কথাবার্তায় মনোযোগ দিয়েছেন। তাই লক্ষ্য করে আমি লজ্জা পেলুম।

কী রকমের বিপদ?

টেলিগ্রামে তার উল্লেখ নেই।

আর বোধ হয় প্রশ্ন করা চলে না। তাই বললেন: আমরা প্রথমে আগ্রা যাচ্ছি।

তা হলে তুফানে গেলেন না কেন?

ইচ্ছে করে কি এই গাড়ি ধরেছি! তুফানে চড়তে পারলুম না। মানুষের অসাধ্য সে গাড়িতে ঢোকা।

কিন্তু—

আমি কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক বললেন: ঠিক বলেছেন। গাড়িতে জায়গা দখল করবার কায়দা মশাই ঠেকে শিখলুম। যাদের জন্যে চড়তে পারলুম না, তারাই শিখিয়ে দিয়ে গেছে।

বলে ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন।

আপনারা কি তীর্থ করতে বেরিয়েছেন?

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন: আমরা সব কিছু করতে বেরিয়েছি। কেউ তীর্থ করবেন, কেউ দেশ দেখবেন, কেউ বেড়াবেন, কেউ বিশ্রাম নেবেন, কেউ আবার হাঁড়ি ঠেলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

এক ভদ্রলোকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন: কেউ আবার—

পুরু লেন্সের চশমা চোখে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক কাগজপত্র খুলে পাশের একটি কুমারী মেয়েকে অনেক কিছু বোঝাচ্ছিলেন। বুঝতে পারলুম যে, এঁরা ভ্রমণ করছেন শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে।

বিমল একটা কটাক্ষ করে বললেন: বুঝতে যে পারলেন না, তা বুঝতে পেরেছি।

কেন বুঝতে পারব না!

বিমল বললেন: মায়ার উদ্দেশ্য আপনি ঠিকই বুঝেছেন, কিন্তু সুনীলবাবুর উদ্দেশ্যটা ধরতে পারেন নি।

আমি কিছু বলবার আগেই আবার বললেন: খবরের কাগজে গোটা কয়েক প্রবন্ধ লিখবেন।

গলাটা নামিয়ে বললেন: দক্ষিণা কিছু আগাম নিয়ে বেরিয়েছেন।

তাই নাকি!

বিমল বললেন: সুনীলবাবু কাগজের ভাল রিপোর্টার।

এঁদের কারও সঙ্গেই আমার কোন পরিচয় নেই। তবু ভদ্রলোক মুখ তুলতেই আমি একটা নমস্কার করলুম। তিনি আমার কাছেই ছিলেন। কিন্তু কাগজ পেনসিলে হাত জোড়া, তাই মুখে বললেন: নমস্কার।

আমি তাঁর কোলের উপর একখানি মানচিত্র দেখলুম। ভারত-বর্ষের মানচিত্র। বাঁ হাতে সাদা খাতা একখানি। আর ডান হাতের পেনসিল দিয়ে মায়াকে কিছু বোঝাচ্ছেন।

বিমল এবারে আর ছুটি মহিলাকে দেখালেন। দেখলুম যে, তাঁরা বেশ সরবে আলাপ শুরু করেছেন। একজন বললেন: মনে মনে ঠাকুরঝি খুবই চটেছেন। তাঁকে তো আনলুমই না, তার ওপর হেঁসেলের দায় চাপিয়ে এলুম বিধবা মানুষের ওপর।

পাশের বউটি বয়সে ছোট। বললেন: আমাদের যে কী হবে, তা জানি নে দিদি। আমি তো ছাড়া পেয়েছি।

কী আবার হবে! সারা বছর গায়ে হাওয়া লাগায়, এবারে হাত পুড়িয়ে খাবে কয়েকটা দিন।

আমি বুঝতে পারলুম না, এঁরা একা বেরিয়েছেন কেন। স্বামীদের সঙ্গে আসতে বাধা কী ছিল!

ওধার থেকে শিশির বললেন: যত দায় সব আমার।

চতুর্থ ভদ্রলোক একখানা নোটবুকে বোধ হয় টাকা পয়সার হিসেব লিখছিলেন, বললেন: তোমার আবার দায় কিসের?

একটা ভেংচি কেটে শিশির বললেন: বসে বসে হিসেব লেখা যায় সুবলদা, কিন্তু জল খাওয়ানো যায় না। আসানসোলে যে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে, তা মনে আছে!

সুবলদা হেসে বললেন: তোমার হাতের জল তো বাইশ জন খাবেন না। অত ভাবনা কিসের!

আমি বিমলকে জিজ্ঞাসা করলুম: আপনারা কোথায় কোথায় নামবেন?

আমরা! যাবার পথে আগ্রার পরে পুষ্কর, তার পর সোজা দ্বারকা।

মায়া মানচিত্র দেখছিল মুখ নিচু করে। হঠাৎ মুখ তুলে বলে উঠল: আবুর নাম করলেন না বিমলদা?

তা হলে তো—

আমি মুখ তুলতেই শান্তিদির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, সেই গোল-টিপ-পরা মহিলাটি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন আমার উপর।

বিমল তাঁর কথাটি কোন রকমে শেষ করলেন, বললেন: চিতোরেও একবার যেতে হয়।

আর একবার আমি শান্তিদিকে দেখে নিলুম। মনে হল যে চিতোরে বোধ হয় তাঁরই ইচ্ছেয় যেতে হবে।

বিমল খুব মৃদু স্বরে বললেন: যে জায়গায় জহরব্রত করেছে সেকালের রাজপুত মেয়ে, সেই জায়গাটা দেখবেন—

শান্তিদির চোখের দিকে চেয়ে বিমল থেমে গেলেন।

আমি আর কিছু জানতে চাইলুম না। জানতে চাইলে কেউ হয়তো খিল খিল করে আবার হেসে উঠবেন।

৩

তিরিশ তারিখ রাত প্রায় সোয়া তিনটের সময় জয়পুর স্টেশনে এসে নামলুম। একান্ত ভাবে একা। সিরসির করে বাতাস বইছিল, একটু যেন শীতের আমেজ সেই বাতাসে। ইচ্ছে করে যে ধুতির কোঁচাটা খুলে পাঞ্জাবীর উপর জড়িয়ে নিই।

দিল্লী স্পেশাল সময় মতো চলতে পারে নি। বিকেল চারটের পরে পৌঁছেছিল টুণ্ডলা। সেখান থেকে আগ্রা ফোর্ট। তার পর জয়পুর। দু জায়গাতেই গাড়ি বদল।

আমার সঙ্গীরা আগ্রাতেই রয়ে গেলেন। কোথায় উঠবেন, এ নিয়ে ছিল মহা সমস্যা। তীর্থস্থানে ধর্মশালা আছে। আগ্রায় আছে কি না জানা নেই। সবাইকে স্টেশনে রেখে শিশির আর বিমল গেলেন সেই খোঁজ আনতে।

আমার অন্য সমস্যা ছিল। দিল্লী হয়েও জয়পুর যাওয়া যায়। তাতে সারা রাত ঘুমোতে পারা যায় গাড়িতে—ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। দূরত্বের তফাত খুব বেশি নয়, ভাড়ার তফাতও বোধ হয় সামান্য হবে। তারপরে নিজের টিকিটখানা দেখে নিশ্চিন্ত হলুম। তাতে আগ্রার উল্লেখ আছে।

আমাকে আমার গন্তব্য স্থান খুঁজে বার করতে যে বেগ পেতে হবে না, সে বিশ্বাস আমার ছিল। তাই কতকটা নিশ্চিন্ত মনে বাকি রাতটুকু ওয়েটিং রুমে কাটালুম।

ভোর বেলায় স্বাতির ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙল। ঠিক এমন করে যে দেখা হবে তা ভাবতে পারি নি। তাই ধড়মড় করে উঠে বসেই চমকে গেলুম। বললুম : তুমি!

খুব আশ্চর্য হচ্ছ তো!

আশ্চর্য হবারই যে কথা!

কেন ?

কোথায় আমি তোমাদের খুঁজে বার করব, তা নয়—

আমি তোমায় আবিষ্কার করলাম, এই তো! কেন, সেবারেও তো আমরাই তোমায় আবিষ্কার করেছিলাম।

এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করতে করতে বললুম : তা বটে।

তারপরেই মনে পড়ল তাদের টেলিগ্রামের কথা, জিজ্ঞাসা করলুম : কিন্তু বিপদ কিসের ? ভাল আছ তো সবাই ?

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না, বলল : সে কথা বাবার মুখেই শুনতে পাবে। কই, তোমার জিনিসপত্র কোথায় ?

আমি আমার বালিশটা জড়িয়ে নিচ্ছিলুম চাদর দিয়ে। ব্যাগটা মাথার কাছেই ছিল। সেটা হাতে নিয়ে স্বাতি বলল : চল।

ঘরের বাহিরে এসে প্রশ্ন করলুম : স্টেশনেই উঠেছ তো ?

কোন উত্তর না দিয়ে স্বাতি হাসল।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা স্টেশনের বাহিরে এলুম। নীল শার্ট পরা একটি বৃদ্ধ সেখানে ঘোরাঘুরি করছিল। বেঁটে মোটা থপথপে চেহারা। স্বাতিকে দেখেই একটা নমস্কার করল, বলল : গাড়ি চাই বাঈ সাব ?

বাঙলা দেশে এই 'বাঈ' শব্দটি সম্মানসূচক নয়, বাইনাচ ও বাইজীকে আমরা অন্য চোখে দেখি। রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রে 'বাই' বা 'বাঈ' মহিলার উপাধি, যেমন মীরা বাঈ আর লক্ষ্মী বাঈ। 'বাঈজী' না বলে 'বাঈ সাহেব' বলাই বোধ হয় রীতি।

আমার উত্তর প্রদেশের এক বন্ধুর কাছে একটি মজার গল্প শুনেছিলুম। গল্পটি ওস্তাদ আর ওস্তাদজী নিয়ে। এ দুটো শব্দের ভিতর যে সম্মানের প্রভেদ আছে আকাশপাতাল, এ গল্প শোনবার আগে আমি তা জানতুম না। ব্যাপারটি সত্যি না মিথ্যে তা ভাল করে না জেনে কারও পাতে পরিবেশন করা উচিত হবে না।

স্বাতি বলল : চাই। তবে এখন নয়।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল : বেলা আটটায় এস।

সকাল ছটা তখনও বাজে নি। আকাশ স্বচ্ছ হয়ে গেছে, কিন্তু রোদ ওঠে নি। আমার ওঠবার আগেই দিল্লী-আমেদাবাদ মেল বেরিয়ে গেছে। ওয়েটিং রুমে যে কলরব দেখেছি তা নতুন যাত্রীদের। বাহিরে বেরিয়েও দেখতে পাচ্ছি যে এই মোটর ও টাঙ্গাওয়ালারা সেই সব যাত্রীরই অপেক্ষা করছে। একটা স্টেশন-ওয়াগনের দরজা খুলে সেই বুড়োটি বলল : চলুন, আপনার দরজাতেই আমি অপেক্ষা করব।

স্বাতি হেসে বলল : একটু হাঁটব।

দরজা বন্ধ করেই লোকটা এগিয়ে এল। স্বাতির হাতের ব্যাগটা সংগ্রহ করে আমার বিছানায় হাত বাড়াল, বলল : আমায় দিন, আমি পৌঁছে দেব।

এর আচরণ দেখেই বুঝতে পাচ্ছিলুম যে ড্রাইভারটি এদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। স্বাতির পরবর্তী কাজে সে সন্দেহ সমর্থিত হল। আমার বিছানাটা কেড়ে নিয়ে লোকটার হাতে গছিয়ে দিল।

সোজা পথ ধরেই আমরা এগোচ্ছিলুম।

একটা মোড় পেরোবার পরে প্রশ্ন করলুম : কী করে জানলে যে আমি আজ আসব ?

এ কথার উত্তরে স্বাতি হাসল। সেই হাসি। সমস্ত অতীতটা মনে পড়ে যায় এই হাসিতে। আমি লজ্জা পেলুম, আর তাড়াতাড়ি যোগ করলুম : এই গাড়িতেই যে আসব, তাই বা জানলে কী করে ?

মনে হল যে, স্বাতি আমার লজ্জাটুকু বেশ উপভোগ করেছে। হেসেই উত্তর দিল : ভোর বেলায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ভাবলাম স্টেশনটা একবার ঘুরে যাই।

ততক্ষণে নিজেকে আমি সামলে নিয়েছি, বললুম: ভাবলে ওয়েটিং রুমটাও একবার দেখে যাই, আর ঘুমন্ত মানুষগুলোকেও।

সোজা সরল রাস্তা, বাঁধানো পরিচ্ছন্ন। স্বাতি সেই দিকেই কথার মোড় ফেরাল। বলল: কেমন দেখছ শহর?

ভারি সুন্দর।

স্বাতি একটা ধমক দিয়ে বলল: সুন্দরের কী দেখলে! এই রাস্তা আর এই ঘর বাড়ি, এ তো সব শহরেই আছে!

তবে কি খারাপ বলব?

খারাপই বা বলবে কেন! শহরটা আগে দেখ, তারপর আমার কথার জবাব দিয়ো।

তথাস্তু।

তখন কী বলবে, সেও আমি জানি।

তাই নাকি!

বলবে, ছবির মতো। কিন্তু তুমিই বল গোপালদা ছবির মতো বলার কোন মানে হয়! মুখ বলে পদ্মের মতো, চাঁদের মতো। কিন্তু শহর কখনও ছবির মতো হয়! ছবি কি কোন বিশেষ জিনিস! ছবি তো সব জিনিসেরই হয়।

ঠিক কথা।

আমি এই শহরকে বলব একটা রেক্টাঙ্গল্—আয়তক্ষেত্র, তার লম্বা দিকটা পূর্ব-পশ্চিমে।

স্বাতি আকাশের দিকে চাইল, বলল: না, সূর্য এখনও ওঠে নি। উঠবে এই দিকে।

বলে বাঁ দিকটা দেখাল। না দেখালেও বুঝতে পারতুম যে পূব দিক ওইটেই। আকাশ নিজেই সে পরিচয় দিচ্ছে।

স্বাতি বলল: স্টেশনের উলটো ধারটা হল উত্তর। সেদিকে শুনেছি একটা পোলো গ্রাউণ্ড ও আর একটা বল-বিয়ারিঙের কারখানা আছে। এবারে সামনেটা দেখ। এই রাস্তা সোজা দক্ষিণে

গেছে। তার পশ্চিমে এমনই সমান্তরাল রাস্তা আরও তিনটে আছে। এই চারটে রাস্তাকে পূর্ব-পশ্চিমে ছেদ করেছে দুটো চওড়া রাস্তা। চৌমাথাগুলোতে প্রশস্ত খোলা জায়গা। এরা বলে চোপর—ফার্স্ট চোপর, সেকেণ্ড চোপর। আর গেট আছে আটটা। রাস্তাগুলো যেখানে নগরের প্রাচীর ছুঁয়েছে, সেখানেই এক একটা পোল।

আমি তার বর্ণনা শুনে আশ্চর্য হচ্ছিলুম। এই কটা দিনে সে এত দেখে ফেলেছে! বললুম: কোথায় জানলে এ সব?

গর্বিত ভাবে স্বাতি বলল: দুর্গাশঙ্কর বাজপায়ের জয়পুর পড়। এ সবই পাবে।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললুম: তুমি নিশ্চয়ই পড় নি।

ঠিক তোমার মতো। না জেনে অনেক কিছু বলার অভ্যেস করে ফেলেছি।

হেসে বললুম: তারপর বল।

আমরা হাঁটছিলুম খুবই আস্তে আস্তে। স্বাতি আরও ধীরে চলতে শুরু করে বলল: এবারে যা তাঁর বইয়ে নেই তাই বলি। সামনে বড়ি পার্ক, তারপর চাঁদপোল গেট। গেট পেরিয়ে ফার্স্ট চোপর, তারপর সেকেণ্ড চোপর। এই জায়গাটা ভাল করে চিনলেই জয়পুর চেনা হল। ডান দিকে জহরি বাজারের ভেতর দিয়ে গিয়ে রামনিবাস গার্ডেন। তারই ভেতর জয়পুরের অ্যালবার্ট মিউজিয়ম, পেছনে মেডিকেল কলেজ আর মহারাণী কলেজ। বাঁ দিকে হাওয়া মহল আর সিটি প্যালেসের সামনে দিয়ে রামগড় ও অম্বর গেছে সুন্দর রাস্তা।

আশ্চর্য হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম: কে শেখাল এত!

সহাস্যে স্বাতি বলল: জয়পুর শহর কার তৈরি জান?

উত্তরে সে নিজেই দিল, বলল: সোয়াই জয়সিংহের। দ্বিতীয় জয়সিংহ ইনি। সোয়াই মানে বোঝ?

না।

সোয়া মানে এক আর সিকি। মোগল বাদশাহরা সম্মান করে এই উপাধি দিয়েছিলেন। আর সব রাজারা যদি এক হন, তা হলে অম্বরের রাজা হলেন সোয়া।

বললুম: আমি তো অন্য রকম শুনেছিলুম। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ নাকি বালক জয়সিংহকে বলেছিলেন সোয়া, ওইটুকু বয়সেই নাকি তিনি সোয়া মানুষ ছিলেন।

সে কথায় কান না দিয়ে স্বাতি বলল: ১৭২৮ সনে মোগলের পতনের পর এই জয়সিংহ অম্বর থেকে তাঁর রাজধানী নামালেন জয়পুরে। অম্বর ছোট পাহাড়ের ওপর, আর জয়পুর চারি দিকে পাহাড় ঘেরা এক সমতলে। দক্ষিণটা শুধু খোলা। কিন্তু শহর রক্ষার জন্যে পাহাড়ের ওপর অনেক দুর্গ আছে। রাস্তা থেকে নহর গড় তোমায় দেখিয়ে দেব।

আমি ভাবতে পারি নি যে স্বাতি এত কথা বলবে। তার গল্প শেষ হচ্ছে না। বলল: জয়সিংহ নাকি অনেক বিদেশী শহরের প্ল্যান এনে শেষ পর্যন্ত আমাদের শিল্পশাস্ত্র মতেই শহর পত্তন করেছিলেন।

এবারে আমি হাসলুম তার কথা শুনে। আর স্বাতি তাড়াতাড়ি বলল: আট আনা দিয়ে সরকারের বই কিনেছি।

তারপরেই আমার হাত টেনে দাঁড় করাল, বলল: কোথায় যাচ্ছ?

একখানা সাইকেল রিক্‌শা যাচ্ছিল পথ দিয়ে। সেখানা চলে যেতেই আমরা রাস্তা পার হলুম। ঢুকলুম একটা বিরাট ফটকের ভিতর। অনেকখানি জমির উপরে মস্ত বাড়ি। স্বাতি বলল: ফরাশ-খানা। আগে মহারাজার নিজস্ব ব্যাপার ছিল। ওই যে দূরে গেট দেখছ, তার আড়ালে রেলের লাইন আছে। রাজারা সেইখানে গিয়ে রেলের সেলুনে চাপতেন। রাত্রে এখানে মহিষীদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল।

বাঁ দিকের একখানা ঘর দেখিয়ে বলল : এই হল টুরিস্ট অফিস। আট আনার বই পাবে এখানে।

মনে হল, দূরে আমি মামাকে দেখতে পেলুম। পাইপ মুখে তিনি ঘাসের উপর পায়চারি করছেন। ঘুম থেকে এত তাড়াতাড়ি উঠেছেন! ব্যস্ত ভাবে আমি এগোতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু স্বাতি বলল : একটা কথা আছে তোমাকে বলবার। মাকে একটু সমঝে চোলো।

কেন সমঝে চলব, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলুম না। মামা আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই দেখি, তাঁর বুকের ভিতর আটকে গেছি। বাঁ হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন, আর মুখের পাইপটা সরিয়েছেন ডান হাত দিয়ে। বললেন : খুব কষ্ট দিলুম, তাই না?

তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে আমি বললুম : এ তো আমার ভাগ্য মামাবাবু!

মামা বললেন : ভাগ্য তোমার নয় গোপাল, ভাগ্য আমার। সমাজের চোখে তুমি আমার নকল ভাগনে। আমি ভাবি, গত জন্মে তুমি আমার ছেলে ছিলে।

আমার চোখের পাতা যেন ভিজে ঠেকল। আর মুখ ফিরিয়ে হাসি লুকল স্বাতি! আমি প্রতিবাদ করলুম না।

মামা বললেন : চল, ঘরে চল।

মামী স্নানের ঘরে ছিলেন। স্বাতি চায়ের হুকুম করে আমাদের কাছে এল। মামা তখন আমায় ডেকে আনবার কারণ বলছিলেন : স্টেশনের ব্যবস্থা দেখেছ তো গোপাল, গাড়ি থেকে নেমেই শুনলুম, থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে না সেখানে। ওই বুড়ো ড্রাইভারটা

এখানে না আনলে কী বিপদেই পড়তুম বল। তার ওপর গাড়ির ভেতরের ছিটকিনি! একটাও নাকি ভাল করে লাগে না। ভেবে দেখ কী সাংঘাতিক কথা।

স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল: সে কি বাবা, সব ছিটকিনিই তো লেগেছিল!

তাকে লাগা বলে! একটা ছিটকিনি তো বেশ দুর্বল দেখলুম। মনে হল, বাইরে থেকে কেউ খোলবার চেষ্টা করেছিল। তারপর এই যে শুনলুম, পশ্চিমের দিকে নাকি ব্যবস্থা আরও খারাপ, একটা দরজাও বন্ধ হয় না।

ঘন ঘন পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে মামা বললেন: তুমি সঙ্গে থাকলে একটা পুরো কম্পার্টমেণ্ট নেওয়া যাবে। বন্ধ ছন্দ করে কোন রকমে রাত কাটানো তেমন মুশকিল হবে না।

পরিবারের এই বিপদ! এরই জন্য কয়েকটা দিন তাঁরা বসে আছেন এই সার্কিট হাউসে! চা আসবার আগেই মামা আমায় সমস্ত ভার দিয়ে দিলেন। বললেন: এবারে আমি নিশ্চিন্ত হলুম গোপাল, পথের ভাবনা এখন থেকে তোমার হল।

৪

স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে সেই বুড়ো ড্রাইভার আটটার অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। তাই দেখে মামা স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন : আজ কোথায় যাবে ?

স্বাতি বলল : গোপালদা তো জয়পুরের কিছুই দেখে নি।

পাইপ ধরিয়ে মামা বললেন : তা হলে সোজা অম্বরেই চল।

গত দুদিন ধরে ওঁরা অনেক কিছু দেখেছেন। সাতাশ তারিখ সকাল বেলায় নেমেই আমাকে জরুরি তার পাঠিয়েছিলেন। আজ তিরিশ। আহ্নিক সেরে মামী কাপড় বদলাতে গেছেন। আমরা তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছি। পাইপটা ভাল করে ধরে উঠতেই মামা অট্টহাস্য করে উঠলেন। স্বাতি ও আমি দুজনেই এক সঙ্গে চমকে উঠলুম।

হাসি থামলে মামা বললেন : বুঝলে গোপাল, এবারে স্বাতি আমাদের গাইড। মাস কয়েক থেকে পড়াশুনা করে এমন তৈরি হয়েছে যে তোমাকেও হারিয়ে দেবে বলেছে।

স্বাতির দিকে ফিরে বললুম : আমি যে আসব, সে কথা তা হলে আগে থেকেই ঠিক ছিল বল।

হাসতে হাসতেই মামা বললেন : প্রায় ঠিকই ছিল, শুধু একটু ছলের অভাব।

তাঁর কথার ধরনে আমিও হাসলুম। কিন্তু স্বাতি ক্রুদ্ধ হল, বলল : তুমিই তো ভয় পেলে বাবা, তা না হলে—

ওই একই কথা। তোমরা ভয় পাও নি, ভয় আমি পেয়েছি তোমাদের জন্যে।

মামার পুরনো কথায় আমি ফিরে গেলুম, বললুম : আমাকে

হারিয়ে দেওয়া কি খুব কঠিন কাজ, না আমাকে হারালেই একটা বড় কাজ হল!

স্বাতি তখুনি উত্তর দিল : নিজেকে তুমি খুব বড় ভাব কিনা, বাবা তাই এ কথা বলছেন।

বেশিক্ষণ তর্ক করবার সুযোগ হল না। মামী তৈরি হয়ে এসেই বললেন : চল।

আমি আগেই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিলুম। তিনি শুধু আশীর্বাদ করেছিলেন, বসে গল্প করবার সময় তাঁর ছিল না।

পথে বেরিয়ে স্বাতি গাইডের কাজ শুরু করল। ড্রাইভারকে বলল : কোথাও দাঁড়াবে না, সোজা চল হাওয়া-মহল। সেখান থেকে আমের, ফেরার পথে সিটি প্যালেস ও যন্তর-মন্তর। খাবার আগে সময় থাকলে অ্যালবার্ট মিউজিয়ম।

আমাকে লক্ষ্য করে বলল : রাস্তা থেকেই দেখিয়ে দেব গেটর, জল মহল ও টাইগার হিল। সঙ্গনুর জৈন মন্দির আর রামগড়ের ওয়াটার ওয়ার্কস দেখবার সময় হবে না।

মামা বললেন : আমরা কি আজই আজমীর যাচ্ছি নাকি!

উত্তর দিতে স্বাতি আর দেরি করল না, বলল : আজ বিকেলের এক্সপ্রেসেই।

তারপরে কী ব্যবস্থা হবে?

স্বাতি তেমনই তৎপর ভাবে বলল : সে ভাবনা গোপালদার।

সোজা রাস্তা ধরে খানিকটা পথ এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিতেই হাওয়া মহল। সাহেবরা ছবির নিচে লেখে প্যালেস অব উইণ্ড্স্। ড্রাইভার দাঁড়াল। আমি নামলুম ড্রাইভারের পাশ থেকে। স্বাতিও নামল। কিন্তু মামা মামী নামলেন না। মামা বললেন : প্রথম বারেও আমরা নামি নি।

বাঁ দিকের ফুটপাথে আমরা নেমেছিলুম। স্বাতির নির্দেশ

মতো ডান দিকে এলুম। বলল : ভেতর তো ফাঁকা, দেখবার কিছুই নেই। দূরে থেকে বাইরেটা ভাল দেখা যাবে।

এমন অদ্ভুত বাড়ি আমি দেখি নি। ছোট ছেলেমেয়ে যেমন তাসের ঘর করে মনের আনন্দে, তেমনই একটা যেন ছেলেখেলার ব্যাপার। গোলাপী রঙের ন তলা বাড়ি, অসংখ্য জানালায় হাওয়া চলাচলের অদ্ভুত ব্যবস্থা। ছবির বইয়ে এই হাওয়া মহলের অনেক ছবি দেখেছি, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই বিরাট বাড়িখানাকে ছবির মতো সুন্দর মনে হল না। ফুটপাথের উপর চট টাঙিয়ে দোকান বসেছে। কিছুই তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। স্বাতি বলল : মরুভূমির দেশ তো, গ্রীষ্মকালে রাণীরা হাওয়া খেতেন এই হাওয়া-মহলের জানালায় বসে।

স্বাতির কাঁধে ক্যামেরা ছিল। বললুম : ছবি নিয়েছ তো ?

সে কথার উত্তর না দিয়েই স্বাতি মোটরে এসে উঠল।

পাশেই রামপ্রকাশ টকি। স্বাতি বলল : এখানকার অনেক সিনেমা হাউসের নাম রাজপুরুষদের নামে।

তারপরেই বলল : আর এই বাড়িগুলোর রঙ লক্ষ্য করেছ ? এই লাল রঙ ! রাজা আইন করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন কোন দৈবজ্ঞের পরামর্শে।

সিটি প্যালেসে না নেমে আমরা এগিয়ে গেলুম। ডান দিকে মোড় নিয়ে আবার বাঁ দিকে। এক সময় নগরের গেটও ছাড়িয়ে গেলুম।

এখানে অম্বরকে বলে আমের। স্টেশন থেকে সাত মাইল পথ। শেষটুকু পার্বত্য। ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে হয়। টাঙ্গাতেও ওঠে। ডান দিকে একটা রাস্তা দেখিয়ে স্বাতি বলেছিল : এই হল রামগড়ের রাস্তা। জয়পুর শহরের জল আসে রামগড় থেকে। শুধু এই ওয়াটার ওয়ার্কস দেখতে চব্বিশ মাইল যাবার মজুরি পোষাবে না।

পথে যেতে যেতে রাস্তার দক্ষিণে গেটর দেখাল স্বাতি। জয়পুর রাজাদের সমাধিস্থান। আরও খানিকটা এগিয়ে জলমহল। বিরাট এক জলাশয়ের ভিতর একটি মহল। এক সময় বোধ হয় গ্রীষ্মাবাস ছিল কোন রাজার, এখন পরিত্যক্ত।

অম্বরের প্রসঙ্গে স্বাতি মীনাদের গল্প শোনাল। একদা এই রাজ্যের নাম ছিল ধুন্দর রাজ্য, আর মীনারাই এই রাজ্যের আদিম অধিবাসী। তারপর অযোধ্যা থেকে এল সূর্যবংশীয় কুশবহরা। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুশের বংশধর বলে তাদের দাবি। স্বাতি বলল : এখনও এই মীনারা আছে অম্বরের দুর্গে। দু শো বছর যারা রাজত্ব করেছে এই অম্বরে, আজ তারা রাজা নয়, রাজার কাছ থেকে দুর্গ দেখাশোনার ভার পেয়েছে মাত্র। প্রায় সাড়ে চার শো পরিবার বারোখানা গ্রামে ছড়িয়ে আছে। সেই সব পরিবার থেকে পালা করে লোক দুর্গের কাজে আসে।

আমি বললুম : মীনারাজ রালুন সিংহের গল্প জান ?

মামা বললেন : অনেক দিন তোমার গল্প শুনি নি।

ভূমিকা না করে আমি গল্প শুরু করলুম। কুশবহরাজ সোর-সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রাজা হলেন। আর বিধবা রাণী তাঁর শিশুপুত্র দুলহ রাও বা ঢোলা রাওকে নিয়ে ছদ্মবেশে রাজপুরী ত্যাগ করলেন। চলতে চলতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় তিনি কাতর হলেন এবং ছেলেকে মাটিতে রেখে বুনো ফলের সন্ধান করতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন যে একটা বিরাট অজগর ঢোলা রাওয়ের মাথার উপর তার ফণা বিস্তার করেছে। ভয়ে রাণী চিৎকার করে উঠলেন। সেই পথে এক ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন। তিনিও ছুটে এসে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। বললেন, মা, তোমার ছেলে রাজচক্রবর্তী হবে। দুঃখ করে রাণী বললেন, ক্ষুধাতৃষ্ণার হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারলে তো রাজচক্রবর্তী! উত্তরে ব্রাহ্মণ তাঁকে খোগঙ্গ নগরের পথ দেখিয়ে দিলেন। জয়পুর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূর। সেখানে

রালুন সিংহ ছিলেন মীনাদের রাজা। বিধবা রাণী এক দাসীর সাহায্যে মীনারাজার দাসী নিযুক্ত হলেন।

ঢোলা রাওয়ের মা একদিন রাজার জন্যে রান্না করেছিলেন। সেই রান্না খেয়ে রাজার আনন্দ আর ধরে না। ডেকে আলাপ করলেন ঢোলা রাওয়ের মার সঙ্গে। কেমন যেন সন্দেহ হল তাঁর, সঠিক পরিচয় জানতে চাইলেন। বিধবা রাণী কিছু লুকোবার চেষ্টা করলেন না, অকপটে নিজের পরিচয় দিলেন রাজার কাছে। রাজা তাঁদের সাদরে আশ্রয় দিলেন, বললেন, আজ থেকে তুমি আমার ধর্ম বোন। সেই থেকে রাজার ভাগনে বলে লালিত হলেন ঢোলা রাও।

তাঁর চোদ্দ বছর বয়স হল, রাজা তাঁকে দিল্লীর দরবারে পাঠালেন। ঢোলা রাও দিল্লীতে ছিলেন পাঁচ বছর, বন্ধুতা করলেন অনেক রাজপুতের সঙ্গে, অনেক স্বপ্ন দেখলেন। এবং শেষে সেই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্যে তাঁর আশ্রয়দাতা রালুন সিংহকে হত্যা করলেন নৃশংস ভাবে। দেওয়ালীর দিন রাজা এক পুষ্করিণীতে অবগাহন স্নান করেন। অতর্কিতে আক্রমণ করে সানুচর রাজরক্তে ঋণ শোধ করলেন রাজপুত ঢোলা রাও। ধাদি নামে এক বন্ধু তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঢোলা রাও তাঁকেও হত্যা করলেন।

এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিয়েছিল মীনারা। ঢোলা রাওয়ের দুই বিয়ে। আজমীর রাজকন্যা তাঁর দ্বিতীয় রাণী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বেশি দিন সংসার করার সুযোগ পান নি ঢোলা রাও। বিবাহের পর জমুয়াহিমাতার পূজো দিয়ে যখন দেশে ফিরছিলেন, এগারো হাজার মীনা তাঁকে আক্রমণ করে যুদ্ধে হত্যা করে।

আমি বসেছিলুম ড্রাইভারের সঙ্গে, কিন্তু পাশ ফিরে এই গল্প বলছিলুম। মামার মুখে একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল দেখলুম। মনে হল যে বিশ্বাসঘাতক ঢোলা রাওয়ের শাস্তির কথা শুনে তিনি খুশী হয়েছেন।

বললুম: মীনাদের সঙ্গে কুশবহদের আরও অনেক যুদ্ধ হয়েছে। আজমীর রাজকন্যা মারুণী পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তাঁর পুত্র কক্কুল আবার ধুন্দর জয় করেন। কক্কুলের পুত্র মৈতুল রাও অম্বর অধিকার করেন শুশাবৎ মীনাদের হাত থেকে। নন্দলা মীনাদেরও তিনি জয় করেন।

এদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ হয় মৈতুল রাওয়ের নাতি কুন্তলের সময়। কুন্তল যখন চৌহান রাজার কন্যাকে বিয়ে করবার জন্য বর বেশে যাত্রা করছেন, তখন তাঁর মীনা প্রজারা বাধা দিল, বলল, তোমার পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা আমরা আজও ভুলি নি। তোমার নাগরা নিশানা আমাদের হাতে রেখে যাও। এই নিয়েই যুদ্ধ বাধল। কিন্তু হেরে গেল মীনারা।

বললুম: ধুন্দরের পরবর্তী রাজা রাও পূজন আমাদের পরিচিত। পৃথ্বীরাজের তিনি যোগ্য ভগিনীপতি। আলাউদ্দীনকে তিনি পরাজিত করেছেন এবং পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করেছেন মাহোবা জয়ে ও কনৌজরাজ জয়চাঁদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযানে। সেই যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁর শেষ কথা আজও অমর হয়ে আছে।

স্বাতির চোখে সেই কথা শোনবার আগ্রহ দেখে বললুম: বলেছিলেন, এক শো বছর মানুষের আয়ু। তার আদ্ধেক ক্ষয়ে যায় শৈশবেই, বাকী আদ্ধেক সে ঘুমিয়ে কাটায়। কিন্তু আমি শিখেছিলুম যুদ্ধ করতে, আমি বীরের ধর্ম পালন করে গেলুম।

গোঁ গোঁ করে আমাদের মোটরখানা পাহাড়ে উঠছিল। দু এক খানা টাঙ্গাও উঠছে টেনে টেনে। এক সময় দেওয়াল ঘেরা এক প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছনো গেল। আমরা নেমে পড়লুম। একটা ছোট দরজা দিয়ে বেরোতেই চোখের সামনে ধরা দিল সেই ইতিহাস-খ্যাত অম্বর। পাহাড়ের রাস্তা থেকেও আমরা দুর্গটি দেখেছি, আর এখন দেখছি অম্বরের মাটিতে দাঁড়িয়ে।

ঘাসের উপর কুটোকাটি শালপাতা ছিল ছড়িয়ে। স্বাতি বলল : পরশু তো জায়গাটা এমন নোংরা ছিল না।

আমাদের ড্রাইভার পেছনে আসছিল, বলল : কাল যে ষষ্ঠীর মেলা গেছে।

ষষ্ঠীর মেলা!

মামী যেন চমকে উঠলেন।

ড্রাইভার বলল : দেবীর পূজো হচ্ছে ওপরে।

তাই নাকি!

মামী এক নতুন উদ্যম পেলেন। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চললেন উপরে যাবার জন্য। পিছন থেকে মামা বললেন : আরে, একটু আস্তে আস্তে চল। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

স্বাতি ও আমি বাগানের বাঁধানো চত্বরের উপর দিয়ে মাওটা লেকের দিকে এগিয়ে গেলুম। কী অপূর্ব স্নিগ্ধ দৃশ্য! পরিষ্কার নীল জল টল টল করছে। একটা গাছ হেলে পড়েছে সেই জলের উপর। দু তিনটি ছেলে জল তোলপাড় করে স্নান করছে। এই মাওটা লেক থেকে পাহাড় আরও এক ধাপ উপরে উঠেছে। তার চূড়ায় অম্বরের প্রাসাদ দিগন্তকে আড়াল করেছে অনেকখানি।

আমাদেরও উঠতে হবে। আমরাও এগিয়ে গেলুম।

বাগানের দু ধারে দুখানা ঘরের ভিতর নানা রকমের পাথরের মূর্তি সাজানো ছিল। জয়পুরের নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করা এই মূর্তিগুলো। স্বাতি বলল : এরা কিছুতেই ছবি নিতে দিল না। বলল, সরকারের অনুমতি নিতে হবে। তুমিই বল গোপালদা, এ সব এদের জবরদস্তি নয়?

পাথরের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমি বললুম : ওরা খুশী হলে অনুমতির অপেক্ষা রাখবে না।

স্বাতি আমাকে খানিকটা দূরে একটা বাঁধানো রাস্তা দেখাল। বলল : ওই হচ্ছে মোটরের রাস্তা। সরকারের অনুমতি নিয়ে ওই রাস্তায় প্রাসাদের দরজা পর্যন্ত যাওয়া যায়।

আর একটা সরু রাস্তা দেখিয়ে বলল : এই হচ্ছে হাতির রাস্তা, পিলখানা থেকে লেকে যায় স্নানের জন্যে।

আমরা যশোরেশ্বরীর মন্দির দেখলুম। বাহিরে বিরাট ভারি রূপোর দরজা। তার কপাটের উপর দশমহাবিদ্যার ছবি খোদাই করা। পরিষ্কার অক্ষরে নাম লেখা আছে—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা। শ্বেত পাথরের মন্দির। বাঁ হাতে এক কক্ষের ভিতর হোম হচ্ছে। তারই সামনে একটুখানি প্রাঙ্গণ পেরিয়ে দেবী মূর্তি। মামা মামী মাটিতে বসেছেন পূজো দেখতে। আমাদের দেখতে পেয়ে মামা বললেন : ফেরার সময়ে আমাদের ডেকে নিয়ো।

• মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা আরও উপরে উঠলুম। প্রাসাদের প্রধান তোরণের নাম গণেশ পোল। সেখানে টিকিট কেটে ভিতরে গেলুম। দেখলুম দেওয়ানী আম আর শিশমহল। মুসলমান বাদশাহদের মতো রাজস্থানেরও প্রায় সকল রাজার শিশমহল আছে। একখানা কাচের ঘর। আশেপাশে ও উপরে এমন ভাবে অজস্র আয়না লাগানো যে একটা বাতি লক্ষ বাতি মনে হয়।

উপর তলায় মন্দির আর বার রাণীর বার মহল। মহারাজা মানসিংহের মহলও দেখলুম। ঘরের ভিতর হাতির দাঁতের কাজ, পাথরের কাজ, আর পাথরের উপর পেনসিলের আঁকা ছবি। সে ছবি আজও অম্লান আছে। মহারাজ মানসিংহের খাবার ঘরও দেখলুম। দেওয়ালের উপর সমস্ত তীর্থস্থানের ছবি আঁকা। ধার্মিক মহারাজা এই সব প্রণাম করে খেতে বসতেন!

স্বাতি বলল : এই প্রাসাদ কার তৈরি জান গোপালদা ?

বললুম : মানসিংহের।

স্বাতি মাথা নেড়ে বলল : হল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে মানসিংহ নির্মাণ শুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু পরের শতাব্দীতে সোয়াই জয়সিংহ এটা শেষ করেন।

আচ্ছা বল তো : স্বাতি আবার একটা প্রশ্ন করল : অম্বর নাম কোথা থেকে হল ?

বললুম : জানি নে।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল : হেরে গেলে তো! অম্বর নাম হয়েছে শিবের অম্বিকেশ্বর নাম থেকে। কেউ আবার বলেন, অযোধ্যার রাজা অম্বরীশের নাম থেকে হয়েছে।

আমি হেসে বললুম : আবার অম্বা দেবীর নাম থেকেও হয়েছে বলে অনেকে।

একটা জায়গা থেকে আমরা আরও উঁচুতে দেখলুম জয়গড়। একদা অম্বর রক্ষার জন্য এই দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। স্বাতি বলল : ফেরার পথে তোমায় একটা লাইট হাউস দেখাব। সেটা -এই অম্বর পাহাড়ে। সেকালে এই লাইট হাউসে আগুন জ্বেলে পথিককে পথ নির্দেশ করা হত।

অম্বর থেকে নেমে আসবার পথে মানসিংহের গল্প শোনাল স্বাতি। ভারতের এক অমর বীর সন্তানের কাহিনী। মানসিংহের পিতামহ বাহারমল ছিলেন প্রথম রাজপুত, যিনি মোগল বাদশাহের সঙ্গে মিত্রতা করেন। শুধু মিত্রতা নয়, বাবরের বশ্যতা স্বীকার করে কুলে কালি দেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবান দাস কন্যার বিবাহ দিলেন সেলিমের সঙ্গে। দিল্লীতে তাঁদের মান বাড়ল, কিন্তু রাজপুতেরা বলল যে কুশবহ বংশ কলঙ্কিত হল। মানসিংহ ভগবান দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। দিল্লীর দরবারে মানসিংহের আসন ছিল আকবরের পরেই। হঠাৎ স্বাতি বলল : ইতিহাসের কথা থাক। চলতি ইতিহাসে নেই, তেমন একটি গল্প বলি তোমাকে।

মানসিংহ যখন যশের শিখরে, তখন আকবর তাঁকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে লাগলেন। মানসিংহের বীরত্বের কথা, তাঁর উপকারের কথা, তাঁর প্রভুভক্তির কথা সমস্ত যেন ভুলে গেলেন। এক দুর্বল মুহূর্তে ঠিক করে বসলেন যে পৃথিবী থেকে মানসিংহকে সরিয়ে দিয়ে হবে। তাঁকে নিমন্ত্রণ করে সে ব্যবস্থাও করলেন। খাবার দু ভাগে ভাগ করা ছিল, তার এক ভাগে বিষ মেশানো।

কিন্তু খাবার সময় ভুলক্রমে নিজেই সেই বিষ খেয়ে মৃত্যু বরণ করলেন।

মামা চমকে উঠলেন, বললেন : ইতিহাসে এই কথা আছে!

স্বাতি বলল : স্কুলের ইতিহাসে পাই নি, পেয়েছি অন্য কোন বইয়ে।

আমি বললুম : স্কুলের ইতিহাসে আমি মানসিংহের অন্য পরিচয় পেয়েছি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম : মানসিংহ বাংলা দেশের শাসনকর্তা ছিলেন বার ভুঁইয়ার আমলে। বাঙালীদের কাছে সম্মুখ সমরে হেরে গিয়ে ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছিলেন অনেকবার।

কী রকম?

বলে মামা আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

বললুম : যশোহরের প্রতাপাদিত্যের কথা ভাবুন। প্রথমে মানসিংহ তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তারপরে গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে কচু রায়ের সাহায্যে তাঁকে বন্দী করেন। আজ অম্বরে আমরা যে যশোরেশ্বরী দেখলুম, এ বিগ্রহ প্রতাপাদিত্যের। দেবীর সঙ্গে মানসিংহ দশ ঘর বাঙালী ব্রাহ্মণও এনেছিলেন। এই বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই এখনও এখানে দেবীর পূজা করছেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন বিদ্যাধর। তিনি জয়সিংহের জ্যোতির্বিদ ও মন্ত্রী ছিলেন।

একটু থেকে বললুম : তারপর ঈশা খান। তাঁর অনুপস্থিতিতে

মানসিংহ তাঁর এগার সিন্ধুর দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু তিনি এসে পৌঁছলে মানসিংহের সৈন্যদল যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। মানসিংহ তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যবস্থা করেন এই শর্তে যে এক-জনের পরাজয় তাঁর সেনাদলের পরাজয় বলে গণ্য হবে। কিন্তু নিজে যুদ্ধে না নেমে তাঁর জামাতাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর ঈশা খানের হাতে সেই জামাতার মৃত্যু'র পরে মানসিংহ নিজে নেমেছিলেন।

স্বাতির দিকে ফিরে বললুম: মানসিংহের তলোয়ারের ওজন শুনেছ তো? পাক্কা সাড়ে পাঁচ সের। কিন্তু ঈশা খানের তলোয়ারের আঘাতে সেই তলোয়ার দু টুকরো হয়ে যায়। ঈশা খান তাঁর নিজের তলোয়ার দিয়েছিলেন মানসিংহকে, কিন্তু মানসিংহ তা নেন নি। ঈশা খান বিনা অস্ত্রেও যুদ্ধ করতে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু মানসিংহ মিত্রতা করেছিলেন ঈশা খানের সঙ্গে। ঐতিহাসিকেরা একে মানসিংহের মহত্ব বলেন, কিন্তু আমি বলি ভয়। মানসিংহ দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু ঈশা খানের সামনে দাঁড়াতে ভয় ছিল বলে তাঁর শক্তিশালী জামাতাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তলোয়ার ভাঙার পর বন্ধুতা করেছিলেন প্রাণের ভয়ে।

রাজপুত বীর মানসিংহ সম্বন্ধে এমন একটা অশ্রদ্ধার মন্তব্য শুনে স্বাতি বোধ হয় খুশী হল না। বলল: তুমি রাজপুতকে কাপুরুষ বলছ, না বাঙালীকে বীর!

বললুম: দুই।

স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল: ঈশা খান বাংলার লোক হতে পারেন, কিন্তু বাঙালী হিন্দু নন।

হেসে বললুম: দুর্গাদাসবাবু অন্য কথা লিখেছেন। ঈশা খানের বাবার নাম ছিল কালিদাস, হুসেন শাহর রাজত্ব কালে তিনি মুসলমান হন।

মামার মুখ দেখে মনে হল যে তিনি খুশী হয়েছেন এই গল্প শুনে। বললেন: গোপাল, আমার যেন মনে পড়েছে, প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ কেড়ে আনতে পারেন নি। সে বিগ্রহ বাঙলা দেশেই কোথাও আছে।

বললুম: আপনি সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর ও খুলনার ইতিহাসের কথা বলছেন। সেখানে তিনি সেই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, বলেছেন যে সেই বিখ্যাত বিগ্রহ আজও মলই পরগণার কপিলমুনি গ্রামে আছে।

সমর্থন পেয়ে মামা আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন, গর্বিত ভাবে তাকালেন মামীর দিকে।

বললুম: ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আমরা শিলা দেবীর নাম পাই। প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,

শিলা দেবী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাঁহারে অকৃপা করি॥

এই শিলা দেবীর কাহিনী পড়েছি একখানা প্রাচীন গ্রন্থে। এক শো বছর আগে যদুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয় এসেছিলেন জয়পুর ভ্রমণে পদব্রজে ও গরুর গাড়িতে। তিনি যে রোজনামচা লিখেছিলেন, বিশ্বকোষের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তা প্রকাশ করেছেন। সর্বাধিকারী মহাশয় লিখেছেন যে শিলা দেবী শিলারূপে ছিলেন মথুরাতে কংস রাজার রঙ্গস্থলে। দেবকীর সন্তানদের ওই শিলার উপর আছড়ে মারা হত। যোগমায়াকে যখন মারতে গেল, তখন শিলাস্পর্শেই দেবী অষ্টভুজা হয়ে অন্তরীক্ষে গেলেন। প্রতাপাদিত্য নাকি মথুরায় এসে ওই পাথরেই যশোরেশ্বরীর বিগ্রহ নির্মাণ করান। অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী দেবী। এই মূর্তি আজ মানসিংহের অম্বর প্রাসাদে। তিনি আরও বলেন যে সে সময়ে দেবীর সামনে নরবলি

হত। জয়সিংহ এই নরবলি বন্ধ করায় রুষ্ট হয়ে দেবী মুখ ফিরিয়ে আছেন।

স্বাতি অবাক হয়ে আমার গল্প শুনছিল। বললুমঃ আরও একটি মজার কাহিনী পড়েছি এই বইয়ে। গোবিন্দজীর মন্দিরে নাকি রাজকন্যার মূর্তি আছে পানের বাটা হাতে। এই রাজকন্যা জয়সিংহের কন্যা। মন্দিরের ভিতর তাঁর মূর্তি স্থাপনের এক অলৌকিক কাহিনী আছে। রাজকন্যার জন্ম লক্ষ্মীর অংশে। কাজেই তাঁর নারায়ণের প্রয়োজন। দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব হুকুম দিলেন বৃন্দাবনের সব মন্দির ভেঙে ফেলবার। জয়সিংহ তাড়াতাড়ি সমস্ত বিগ্রহ জয়পুরে নিয়ে এলেন এবং গোবিন্দজীর প্রতিষ্ঠা করলেন অন্দর মহলে। এ দিকে গোলমাল বাধল রাজকন্যাকে নিয়ে। তাঁর বয়স হল ষোল, কিন্তু বিবাহে সম্মতি নেই। জানা গেল, রাতে গোবিন্দজী থাকেন রাজকন্যার কাছে। সকালে তাঁর শয্যায় কখনও নূপুর কখনও বা অলঙ্কার খুঁজে পাওয়া যায়। এক দিন রাজা তাঁদের এক সঙ্গে নিদ্রিত দেখে নিজের গায়ের চাদরে তাঁদের ঢেকে দেন। সকালে এই চাদর দেখে রাজকন্যা লজ্জায় গোবিন্দজীকে বললেন, সবই যখন প্রকাশ হয়ে গেল তখন আর এ দেহ রাখা উচিত নয়। কেউ বলেন যে রাজাই কন্যাকে বলেছিলেন সাবধান হতে, আর রাজকন্যা গোবিন্দজীর কাছে কলঙ্কমোচনের আবেদন জানিয়েছিলেন। গোবিন্দজী তাঁকে শ্রীঅঙ্গে লিপ্ত করে উদ্ধার করেন।

মামীর দু চোখ উঠেছিল ছল ছল করে। স্বাতি কী বলতে যাচ্ছিল আমি জানি। কিন্তু মায়ের চোখের দিকে চেয়ে সে কথা সে আর বলতে পারল না।

৫

মোটর এসে সিটি প্যালেসের সামনে দাঁড়াল। প্যালেস তো নয়, যেন একটা ছোটখাটো শহর। বড় রাস্তা থেকে গেট দিয়ে ঢুকে দু ধারে কত অফিস কত লোকজন। পুরানো এক ভ্রমণ-কাহিনীতে পড়েছিলুম যে রাজপ্রাসাদের বাগানে যে গোবিন্দজীর মন্দির, তাঁর বাঙালী পূজারী। অত্যাচারী বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সময় বৃন্দাবন থেকে আনা হয়েছিল গোবিন্দজীর বিগ্রহ। সেই থেকেই এখানে বাঙালীর বাস। বড় একটি জলাশয়ের কথাও পড়েছিলুম, তার জলে অসংখ্য কুমীর। সেই কুমীরকে ডাঙায় দেখবার ব্যবস্থাও বড় চমকপ্রদ। দড়িতে এক খণ্ড মাংস বেঁধে জলে ফেলা হয়, তারপর কুমীর কাছে এলে টেনে টেনে সেই দড়ি তোলা হয় ডাঙার উপর, কুমীরও ডাঙায় ওঠে। আমি সেই সরোবর দেখবার জন্য যখন চারি দিকে তাকাচ্ছিলুম, মামা বললেন : গোপাল কি রাজবাড়ির ভেতরটা দেখবে ?

মামা মামী গাড়িতেই বসে ছিলেন। আমি রাজবাড়িতে ঢুকলে তাঁরা বোধ হয় নামবেন না। কী উত্তর দেব যখন ভাবছিলুম, তখন ড্রাইভার বলল : ওইখানে তিন টাকার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে হবে।

দেখবার কিছু আছে ?

উত্তর স্বাতি দিল : রাজবাড়ির একটা অংশই শুধু খোলা। তাতে রাজস্থানী ছবি, আর অস্ত্রশস্ত্র দেখবে। কিছু পুঁথিও আছে। আর দেখবে দেওয়ান-ই-খাস।

একটু থেমে বলল : উত্তরে দেওয়াল ঘেরা তাল কটোরা দীঘি, রাজামল কা তালাও আরও খানিকটা দূরে।

এ সবে আমার রুচি নেই। তার আরও একটা কারণ ছিল

এ সমস্তই এঁরা দেখে ফেলেছেন। আমার জন্যই যখন আবার দেখছেন, তখন যত সংক্ষেপে করা যায় ততই ভাল। বললুম: এখানকার মানমন্দির শুনেছি খুব ভাল। সেইটে আমার দেখবার ইচ্ছে।

গাড়িতে বসে বসেই মামা আঙুল দিয়ে একটা ঘেরা জায়গা দেখালেন, বললেন: ওই তোমার মানমন্দির। আমরা বসে আছি, তুমি দেখে এস।

স্বাতিও নামছিল না। বললুম: আমি একা যাব?

মামা বললেন: আমরা দেখে নিয়েছি, দ্বিতীয়বার দেখবার মতো উৎসাহ আর নেই।

স্বাতি বলব: তোমারও বেশি সময় লাগবে না। সানডায়ালটিই চমৎকার। ওটা দেখতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে।

এই মানমন্দির সম্বন্ধে আমি অন্য কথা শুনেছিলুম। মনে পড়ল এক ভদ্রলোকের কথা। তিনি আমায় বলেছিলেন যে কখনও জয়পুরে গেলে আমি অনেকটা সময় হাতে নিয়ে যেন এই জিনিসটা দেখি, দেখে আমার সাধ মিটবে না। বললুম: আমার একটু সময় লাগবে মামাবাবু, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: সময় লাগবে!

স্বাতি ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। বললুম: ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার এমন প্রমাণ আর কোনখানে নেই। পণ্ডিত জওহরলালও তাঁর বইয়ে জয়সিংহ ও তাঁর এই মানমন্দিরের কথা লিখেছেন।

মামা বললেন: আমিও নামব কি!

মামী বললেন: আমাকে নামতে বোলো না। এই খটখটে রোদ্দুরে মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে মাথা পোড়াতে আমি পারব না।

ততক্ষণে মামা তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। ভারি

দেহটা তুলে নামবার চেষ্টা করছিলেন। মামীকে কটাক্ষ করে বললেন ঃ বাড়িতে বসে থাকলে এ কষ্টটুকুও সইতে হত না।

তারপর মাটিতে পা দিয়েই বললেন ঃ চল গোপাল, তোমার পণ্ডিতজী কী বলেন দেখে আসি।

কতকটা বাধ্য হয়েই মামী নামলেন।

চলতে শুরু করে আমি বললুম ঃ প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষ-চর্চার কথা আজকের বিজ্ঞানী আর বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সোয়াই জয়সিংহকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর রাজত্বকাল তো বেশি পুরনো নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম চুয়াল্লিশ বছর। অম্বরের সিংহাসনে আর এক জয়সিংহ ছিলেন। তিনি মানসিংহের ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র। মির্জারাজা বলেই বেশি পরিচিত। দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন তিনি। যে শিবাজীর ভয়ে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ সদা শঙ্কিত থাকতেন। সেই শিবাজীকে তিনি বন্দী করে দিল্লীতে এনেছিলেন। কিন্তু সসম্মানে এনেছিলেন তাঁকে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বাদশাহকে তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেবেন না। কিন্তু যখন দেখলেন যে ঔরঙ্গজেব শিবাজীর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করছেন, তখন মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাঁর পলায়নের পথও করে দিলেন। আপন শক্তির গর্বে উদ্ধত ছিলেন এই জয়সিংহ, আর ঔরঙ্গজেব বোধ হয় তাঁর এই স্পর্ধার জন্যই বিষ দিয়ে তাঁকে হত্যা করেন।

মামা বললেন ঃ ছেলেবেলায় এক জয়সিংহের গল্প পড়েছিলুম। বড় কৌশলে তাঁর বিদ্রোহী ভাইকে তিনি বন্দী করেছিলেন। সে জয়সিংহ কে তা জানি নে।

সে গল্প আমার জানা ছিল। বললুম ঃ তিনি আমাদের জ্যোতিষী জয়সিংহ, আজ জয়পুরের সর্বত্র যাঁর কীর্তি আমরা দেখছি।

স্বাতি বলল ঃ গল্পটা বলবে গোপালদা!

দিল্লীর মতো এখানকার মানমন্দিরকেও লোকে যন্তর মন্তর বলে। সামনেই তার প্রাঙ্গণ দেখতে পাচ্ছি। তাই সংক্ষেপে সেই গল্প শোনালুম স্বাতিকে।

জয়সিংহের অভিষেকের সময় তাঁর সৎ ভাই বিজয়সিংহ খুব ছোট। বিমাতা তাঁর ছেলেকে নিজের বাপের বাড়িতে মানুষ করলেন। আর বড় করে বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করতে শেখালেন। বিজয়সিংহ তাঁর মায়ের পরামর্শে বাদশাহর উজীর নবাব কামরুদ্দীনকে ঘুষ দিয়ে বাদশাহর প্রিয়পাত্র হলেন। বললেন যে অম্বরের সিংহাসন পেলে পাঁচ ক্রোড় টাকা নজর দেবেন, আর পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে বাদশাহর সেবা করবেন। বাদশাহ তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। বড় ভাইয়ের কাছে বিজয়সিংহ প্রথমে বুসার অধিকার চেয়েছিলেন। জয়সিংহ তখুনি তা দেন। বিজয়সিংহ নিজে হয়তো খুশী হয়েছিলেন, কিন্তু মায়ের কথাতেই অম্বরের সিংহাসন দাবী করলেন।

দিল্লীর দরবারে ছিলেন জয়সিংহের পাগড়ি-বদল-ভাই খাদোয়ান খান। তিনি এই চক্রান্তের কথা জয়পুরের রাজদূত কৃপারামকে জানালেন। কৃপারাম পত্র পাঠালেন জয়সিংহের কাছে। ক্ষুব্ধ মর্মাহত জয়সিংহ তাঁর নাজিরকে সেই পত্র দেখালেন। নাজির তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, কৌশলে এর প্রতিকার করতে হবে।

জয়সিংহ তাঁর সর্দারদের ডেকে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সর্দাররা স্থির করলেন যে বিজয়সিংহের অভিষেক করবেন বুসায় ও দুই ভাইয়ের মিলনের ব্যবস্থাও করবেন।

জয়পুর থেকে ছ মাইল দূরে বিজয়সিংহ তাঁর শিবির ফেললেন আর জয়সিংহ চললেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এমন সময় নাজির খবর দিলেন যে রাজমাতা এই লালজীদের মিলন দেখতে চান। সর্দাররা বললেন, বেশ তো, তার ব্যবস্থা হোক।

রাজমাতার জন্য এক বিরাট মহাদোলা এল, আর তাঁর

সহচরীদের জন্য তিন হাজার শকট। জয়সিংহের সঙ্গে রাজমাতাও চললেন।

ছোট ভাইয়ের হাতে জয়সিংহ বুসার দানপত্র দিলেন, বললেন, যদি অম্বর চাও, তবে তাই নাও। আমি যাব বুসায়। বিজয়সিংহ মুগ্ধ হয়ে বললেন, আর আমার কিছু চাই নে।

এর পরে তাঁরা অন্তঃপুরের দিকে চললেন। জয়সিংহ তাঁর তলোয়ার খুলে খোজা প্রহরীর হাতে দিলেন। তাই দেখে বিজয়সিংহও দিলেন। কিন্তু রাজমাতা কোথায়! বিজয়সিংহ বন্দী হলেন ভট্টি সর্দার উগ্রসেনের হাতে।

স্বাতি বলল: সেই মহাদোলা আর শকটে চড়ে সৈন্য এসেছিল!

বললুম: রাজস্থানে এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে।

নাজিবের এই ছলনার কথা জয়সিংহ নিশ্চয়ই জানতেন!

এ কথার উত্তর দিলেন মামা, বললেন: না জানলে কৌশলে বিজয়সিংহকে নিরস্ত্র করবেন কেন!

স্বাতি ক্ষুব্ধ হল। তার মুখ দেখে মনে হল যে জয়সিংহের এই আচরণে সে আঘাত পেয়েছে। এমন সুন্দর শহরের প্রতিষ্ঠাতা, এমন অদ্ভুত যন্তর মন্তরের আবিষ্কারক, এমন গুণী জ্ঞানী মানুষ কেন সত্যাশ্রয়ী হবে না!

মামী বললেন: তারপর বিজয়সিংহের কী হল?

বললুম: ইতিহাসে তার আর কোন সন্ধান নেই।

মামা মন্তব্য করলেন: হতভাগ্য বিজয়সিংহ! মা নিজে ছেলের মৃত্যুর কারণ হলেন।

অনেকক্ষণ আগেই আমরা যন্তর মন্তরের প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেছি। আমাদের ড্রাইভার এবারে কথা কইল, বলল: ব্রাহ্মণ এসেছে হুজুর।

এখানকার গাইড হল ব্রাহ্মণ। এসেই আমাদের সান-ডায়ালের সামনে হাজির করলেন। সূর্য-ঘড়ি, ছায়া দেখে দিনের সময়

নিরূপণ। পাশাপাশি দুটো যন্ত্র পাথরের অর্ধ-বৃত্তাকারে, তার উপর সময়ের দাগ কাটা। ছায়া দেখে জয়পুরের স্থানীয় সময় নির্ভুল ভাবে বলা যায়। আমরাও মিলিয়ে নিলুম।

পাশের যন্ত্রটির নাম ক্রান্তিবৃত্ত যন্ত্র। সমস্ত যন্ত্রই পাথর কিংবা ইঁটের গাঁথুনির। ধাতুর ব্যবহারও কিছু আছে। যন্ত্রের গায়ে তার পরিচয় আছে লেখা, ইংরেজী ও হিন্দীতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ব্রাহ্মণ দেখালেন যে এই যন্ত্রে একটা নল পরিয়ে ঘোরাতে হয়, তা হলেই গ্রহনক্ষত্রাদির ক্রান্তি স্পৃষ্‌শরাদি জানা যায়।

স্পৃষ্‌শর মানে কী গোপালদা?

এ শব্দ আমি কখনও শুনি নি। কথাটি হিন্দীতে লেখা আছে দেখলুম। অভিধান না দেখে এর অর্থ উদ্ধার আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইংরেজীতে দেখলুম to find the declination and distance from the ecliptic and equinox of the sun and stars। ব্রাহ্মণকে বললুম: ভাল করে বুঝিয়ে বল।

সে কথার উত্তর না দিয়ে ব্রাহ্মণ এগিয়ে গেল আর একটা যন্ত্রের দিকে।

আমি বললুম: declination মানে বিষুব লম্ব, ecliptic মানে ক্রান্তিবৃত্ত, আর equinox মানে বিষুব। স্পৃষ্‌শর মানে তোমায় কলকাতায় ফিরে বলব।

মামা হাসলেন আমার কথা শুনে। কিন্তু আমি আমার কথা রাখতে পেরেছিলুম। শ্রদ্ধেয় শ্রীমুকুন্দপদ রায় কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে আমাকে জানিয়েছিলেন যে এই শব্দটির মানে হওয়া উচিত জল বিষুব। এই যন্ত্রে জল বিষুব ও ক্রান্তি বৃত্ত থেকে সূর্য ও জ্যোতিষ্কগণের কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। অযাচিত অনুগ্রহের জন্য দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

এই যন্তর মন্তরে যন্ত্রের অভাব নেই। যন্ত্ররাজ, সম্রাট যন্ত্র,

রাশিবলয় যন্ত্র, রামযন্ত্র, জয়প্রকাশ যন্ত্র, আরও কত যন্ত্র। কোনটা কয়েকতলা বাড়ির সমান উঁচু, আবার কোনটা কুয়োর মতো গভীর। একটা যন্ত্র বাঁধানো টেনিস কোর্টের মতো দেখতে। লক্ষ্য করে দেখা গেল যে সমস্ত যন্ত্র একবার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে ১৯০১ সনে। শ্রীগোকুলচন্দ্র ভবন এই দুরূহ কাজ করেছেন।

এই যন্ত্রগুলি সবই জয়সিংহের আবিষ্কার?

ঠিক তাই। তিনি নিজে নকশা দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। আর যন্ত্রগুলো যে নির্ভুল হয়েছে তারও পরীক্ষা করেছিলেন নানা রকম।

মামা বললেন: কী রকম?

ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে বললুম: বিদেশ থেকে জ্যোতির্বিদ তিনি এনেছিলেন। ম্যানুয়েল নামে এক পর্তুগীজ পাদরী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। রাজা তাঁর মুখে পর্তুগালের গল্প শুনলেন, শুনলেন সে দেশের জ্যোতিষশাস্ত্রে উন্নতির গল্প। জয়সিংহ আর দেরি করলেন না, নিজের কয়েকজন পণ্ডিতকে পাঠালেন পর্তুগালের রাজা ইমানুয়েলের কাছে। এঁদের সঙ্গে ভারতে এলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ সেভিয়ার ডি সিলভা। সঙ্গে আনলেন ডি-লা-হায়ারের জ্যোতিরঙ্ক। সেই সমস্ত ফরমুলা আর টেবল নিয়ে জয়সিংহ নিজে গণনা করলেন দিনের পর দিন। তারপর হতাশ হয়ে সবই ফিরিয়ে দিলেন। পাদরী সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ আপনার কাজে লাগল না? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা বললেন, না। তারপরে বুঝিয়ে দিলেন সেগুলির দুর্বলতার কথা। কাগজে-কলমে খুবই ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমান পরিদর্শনের সঙ্গে অনেক প্রভেদ দেখা যাচ্ছে। চাঁদের স্থিতি নির্দেশে আধ অক্ষাংশ ও চন্দ্র সূর্যের গ্রহণে প্রায় পনের পল মানে চার মিনিটের প্রভেদ। এই প্রভেদ যে যন্ত্রের নিকৃষ্ট ব্যাসের জন্য হচ্ছে, তাও বলে দিয়েছিলেন।

স্বাতির আশ্চর্য লাগছিল এই গল্প শুনতে। বললুম: এইখানেই

ইতি নয়। জ্যোতির্বিদ টুলুক বেগের খ্যাতি ছিল, তুর্কিস্থানে, তাঁরও অনেক যন্ত্রপাতি ছিল। জয়সিংহ সে সবেরও ভুল বার করে সবাইকে বিস্মিত করেছিলেন।

মামা বললেন: কিন্তু সে যুগে আমাদের দেশে তো জ্যোতিষের ব্যাপক চর্চা ছিল না। জয়সিংহ কোথায় এ সব শিখলেন?

বললুম: সত্যি কথা লোকে আজকাল বিশ্বাস করবে না।

কেন?

সত্যি কথাটা সত্যিই একটু গল্পের মতো। আপনারও হয়তো বিশ্বাস হবে না।

এবারে কোন প্রশ্ন না করে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললুম: বিদ্যাধর নামে এক বাঙালীর কাছে শিখেছিলেন।

বল কি!

বললুম: বিদ্যাধর তাঁর মন্ত্রী ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ। মুহম্মদ শাহ দিল্লীর বাদশাহ হবার পরে জয়সিংহ রাজনীতি ছেড়ে জ্যোতিষ চর্চা শুরু করেন। তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'জিজ মুহম্মদ শাহী'তে তিনি লিখেছেন যে অক্লান্তভাবে সাত বছর জ্যোতিষ চর্চা করেন। মুহম্মদ শাহর অনুরোধে পঞ্জিকা সংস্কারও করেছিলেন। আর প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র অনুসারে জয়পুর শহরের প্ল্যানও তৈরি করেছিলেন। এই সব কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বিদ্যাধর পণ্ডিত।

স্বাতি কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল: তোমার বাঙালী প্রীতি একটু বেশি গোপালদা।

আমি নিজে যে বাঙালী! বাঙালীর গৌরবেই আমার গর্ব।

তারপরেই বললুম: বিদেশীর কাছে আমি ভারতবাসী। ভারতের বাইরে গেলে হিন্দুস্থানী বলে গর্ববোধ করব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম করব। জয়সিংহের সভার জগন্নাথ পণ্ডিত। রাজার অনুরোধে তিনি সম্রাট সিদ্ধান্ত ও রেখাগণিত নামে ইউক্লিড

ও নেপিয়ার রচিত গণিতের সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। জয়সিংহ শুধু জ্যোতির্বিদ নন, ঐতিহাসিকও ছিলেন। তাঁরই যত্নে জয়সিংহ কল্পদ্রুম নামে একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু মামা তখনও যে যন্ত্রমন্ত্রের কথা ভাবছিলেন তা বুঝতে পারি নি, বুঝতে পারলুম তাঁর প্রশ্ন শুনে। বললেন: জয়সিংহ শুনেছি এমন যন্ত্রমন্ত্র অনেকগুলো স্থাপন করেছিলেন।

টপ করে স্বাতি বলল: পাঁচটা।

তার পরেই হাতে গোনবার চেষ্টা করল পাঁচটি শহরের নাম: জয়পুর দিল্লী বেনারস মথুরা আর—

স্বাতি ভাবতে লাগল।

বললুম: উজ্জয়িনী। কিন্তু জয়পুরেরটিই শ্রেষ্ঠ।

জয়সিংহের আর একটি কথা আমার মনে পড়ল। তিনি তাঁর 'জিজ মুহম্মদ শাহী'তে লিখেছিলেন ঈশ্বরের অনন্তশক্তির তত্ত্ব না জেনেই হিপার্কাস নির্বোধ চাষীর মতো বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, টলেমি শুধু বাদুড়ের মতো সত্যরূপ সূর্যের সমীপে যেতে পারেন নি, ইউক্লিডের সূত্র অনন্তের অসম্পূর্ণ কল্পনা। জমসেদ দসি ও নাসের তুসিও পণ্ডশ্রম করেছেন। আমার মনে হয়েছে যে বৃদ্ধ বয়সে অতিরিক্ত বেশি আফিং না খেলে জয়সিংহের শ্রম আরও সার্থকতা-মণ্ডিত হত। জ্যোতিষ ছেড়ে তখন তিনি সমাজ সংস্কারে মন দিয়েছিলেন। কন্যার বিবাহে যৌতুক দিতে বাপকে নিঃস্ব হতে হত বলে দেশে শিশুকন্যা হত্যা প্রচলিত ছিল। তেমনি শ্রাদ্ধও ছিল ব্যয়বহুল। জয়সিংহ এই প্রথা আইন করে বন্ধ করেছিলেন।

মোটরের কাছে পৌঁছে মামা পকেটে হাত দিলেন। একখানা এক টাকার নোট বার করে তাকালেন নিজের চারদিকে।

মামী বললেন: ব্রাহ্মণ তো অনেকক্ষণ আগেই সরে পড়েছে।

তাই নাকি!

দরজা খুলে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। বলল: পালিয়েছে।

কেন পালিয়েছে ?

ড্রাইভার গম্ভীরভাবে বলল : যাবার সময় বলে গেছে, বাঙ্গালী বাবু জ্যোতিষ জান্‌তা হ্যায়।

মামা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল : এইবারে জাদুঘর যাব, না হোটেল ?

ঘড়ি দেখে মামা বললেন : তাই তো, বেলা যে প্রায় বারোটা বাজে !

স্বাতি তাড়াতাড়ি বলল : হোটেলে ঢুকলে জাদুঘর আর দেখা হবে না।

মামা বললেন : তা বটে। কত সময় লাগবে মনে কর ?

আমি বললুম : জাদুঘর দেখার একটা সুবিধে আছে। ভাল করে দেখতে এত সময় লাগে যে কারও হাতেই সে সময় থাকে না। কাজেই যতটুকু সময় হাতে থাকে, তাতেই দেখে নেওয়া যায়।

মামা আমার কথাটা ঠিক বুঝলেন কিনা জানি না। আমি তাই যোগ করলুম : একটা জাদুঘর কয়েক দিন ধরে দেখলে ভেতরের জিনিস সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। তার জন্যে একজন গাইডেরও দরকার।

স্বাতি বলল : তুমি কি পুরাতত্ত্বের বই লিখবে ?

বই না লিখলে কি ভাল করে জানতে নেই ! আমাদের দোষ তো এইখানে। লেখকদের আমরা অন্য জাতের ভাবি। লেখকরা তো নিজেদের জন্যে লেখেন না, লেখেন আমাদের জন্যেই। আমরা বইয়ের বদলে চোখে দেখে শিখলে আপত্তি কেন হবে ?

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না। বলল : এই যা, তোমাকে দুটো দোকান দেখাতে ভুলে গেলুম। আমাদের মোটর যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তার ডান হাতেই লম্বা বাড়িটার ভেতর পাশাপাশি

দুখানা ঘর। সেদিন আমরা খবর পেয়েছিলাম যে স্কুল কলেজের দুঃস্থ মেয়েরা একটা দোকান চালাচ্ছে।

সত্যি কথা!

স্বাতি বলল: ড্রাইভারও আমাদের তাই বলেছিল।

কিন্তু যে লোকটি কোন উত্তর না পেয়ে বলল: সোজা আমরা জাদুঘরেই যাই তা হলে।

স্বাতি বলল: একটু ঘুরে যাও না! মতিডুংরি ল কলেজ মেডিকেল কলেজ নতুন জয়পুর দেখিয়ে রামবাগে চল।

নতুন জয়পুর আবার কি?

আমার দেওয়া নাম। এই যে পথঘাট ঘরবাড়ি দেখছ, এই হল সত্যি জয়পুর, জয়সিংহের জয়পুর। জমজমাট অথচ সরল ও পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকটি বাড়ি এখানে লাল রঙের, কোনটাকে বেয়াড়া মনে হবে না, মনে হবে না যে এক একটা বাড়ি এক একজনে তৈরি করেছে বিভিন্ন সময়ে।

মামা বললেন: স্বাতি ঠিকই বলেছে। প্রথম বারে আমার মনে হয়েছিল যে রাজা জয়সিংহই এই সমস্ত বাড়ি তৈরি করে প্রজাদের কাছে ভাড়া দিয়ে গেছেন। এ দেশে এমন শহর যে আর একটা নেই, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি।

কিন্তু নতুন জয়পুর কী?

স্বাতি হেসে বলল: জয়সিংহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে জয়পুরের লাল রঙ। এখন হাল ফ্যাসানের বাড়ি উঠছে নানা রঙের। তবে বাঁচোয়া এই যে পুরনো জয়পুরে স্থানাভাব বলে আশেপাশে বিশেষ ভাবে পশ্চিমে এই শহর বাড়ছে। পাহাড়-ঘেরা শহর, পাহাড়ের আড়ালে যাবার দরকার এখনও হয় নি, বোধ হয় হবেও না।

ড্রাইভার খুব জোরে মোটর চালিয়ে মতিডুংরির দিকে চলেছিল। বেশ কাঁপছিল গাড়িখানা। আমি ড্রাইভারের পাশে বসে

ছিলুম। বললুম : মোটর না কিনে স্টেশন ওয়াগন কেন কিনলে?

বুড়ো ড্রাইভার বলল : কিনি নি হুজুর, রাজার কাছে বকশিশ পেয়েছি।

সেকি!

আমরা আশ্চর্য হলুম।

বুড়ো বলল : চাকরি করতুম রাজার দরবারে। ছোট বড় কত মোটর কত স্টেশন ওয়াগন। আমি চালাতুম এই গাড়িখানা। রাজার রাজ্য যেদিন গেল, আমার চাকরিও গেল। বকশিশ পেলুম এই গাড়িখানা। এখন ট্যাক্সি চালিয়ে পেট চালাচ্ছি।

মতিডুংরি আমরা দূর থেকে দেখলুম গাড়িতে বসে বসেই। আর কীই বা আছে দেখবার! জয়পুর শহরটাই তো পাহাড়ে ঘেরা, তার উপর কত দুর্গ। পুরাকালে নগর রক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা না করে উপায় ছিল না। শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য সারাক্ষণ প্রহরা থাকত। এ সবের এখন দরকার নেই। দুর্গকে দপ্তর করা হচ্ছে, করা হচ্ছে বাসস্থান শৈলাবাস।

জয়পুরের বর্তমান রাজা মানসিংহ। তাঁর তৃতীয়া মহিষী বাঙালী। কুচবিহারের স্বর্গত মহারাজার দ্বিতীয় কন্যা। মা গুজরাতী, বরোদার রাজকন্যা। ড্রাইভার বলল, মহারাজার বিবাহের সময় সেও বরযাত্রী দলের সঙ্গে কুচবিহার গিয়েছিল।

তৃতীয় রাণী!

স্বাতি আশ্চর্য হল খুব।

ড্রাইভার বলল : বংশের প্রথা অনুসারে প্রথম রাণী এসেছেন যোধপুররাজের অন্তঃপুর থেকে। রাজার ভগিনী তিনি। বয়সে মহারাজার বড়। যথাসময়ে যোধপুর রাজকন্যাকেও তিনি ঘরে আনলেন।

এ সমস্ত খবর আমার জানা নেই। সত্য মিথ্যা যাচাই

করে নেবারও সুযোগ পাই নি। রুচিও নেই এই সব পারিবারিক সংবাদ সংগ্রহের।

ড্রাইভার বলল, বাঙালী রাণী গায়ত্রী দেবীর নামে অনেক সংস্থা আছে এই শহরে। ফেরার পথে দেখিয়ে দিয়েছিল সেই সব।

স্বাতি বলল: পেছনের দরজা দিয়ে রামনিবাস বাগানে চল।

পাশ ফিরে দেখলুম যে স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে আছে গর্বিত ভঙ্গিতে। তার গর্বের কারণ বুঝতে পারি। এই শহরের যে সে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে, তার প্রমাণ ছিল তার কথার ভিতর।

মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে আমরা বাগানের পিছনের ফটকে পৌঁছলুম।

বিরাট প্রশস্ত উদ্যান। ছায়াচ্ছন্ন স্থানও আছে, কিন্তু বাঙলার শ্যামলিমা নেই। একটু রুক্ষ, একটু তীব্র। হয়তো এ সময়ের জন্য। বারোটা তখন বেজে গেছে। ড্রাইভার এসে দক্ষিণ দিকের একটা বড় গাছের নিচে মোটর থামাল। বাঁ হাতে অ্যালবার্ট মিউজিয়মের অপূর্ব অট্টালিকা।

খানিকটা এগিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। সামনের সিঁড়ি থেকে একটা চওড়া রাস্তা সোজা চলে গেছে। যত দূর দৃষ্টি যায়, সে রাস্তার আর শেষ নেই। মনে হল যেন একেবারে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। স্বাতি বলল: এই রাস্তার নাম সোয়াই মানসিং হাইওয়ে।

বারান্দার উপর উঠেই এক সারি মূর্তি চোখে পড়ল। পাথরের উপর খোদাই করা মূর্তি, দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া আছে। সবই মেয়ের মূর্তি, নানা ভঙ্গির মূর্তি। কেউ নাচছে, কেউ বাজাচ্ছে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিগুলির নিচে পরিচয়পত্রে লেখা আছে যে এসব অম্বরের এক পুরনো মন্দিরের

ভগ্নাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। ভারি ভাল লাগল এই মূর্তিগুলি। স্বাতিকে ডেকে বললুম: ছবি নিয়েছ তো?

স্বাতি হেসে বলল: নিয়েছি, কিন্তু বিপদের কথা তোমায় বলি নি।

বিপদ! ছবি তোলায় আবার বিপদ কী!

স্বাতি আঙুল দিয়ে দুটো লোক দেখাল। বলল: ওদেরই একজন গণ্ডগোল বাধিয়েছিল। প্রথমে সামনে থেকে একটা ছবি নিলাম। তারপরে পাশে দাঁড়িয়ে কাছ থেকে একটা ছবি নিচ্ছিলাম। খাকি পোশাকের একজন লোক এসে কাছে দাঁড়াল। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল ছবি তোলা। তারপর ক্লিক শব্দ শুনেই বললে, দিন দু টাকা। কিসের টাকা, আমি জানতে চাইলাম। লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল, বললে, ছবি তোলার আইন নেই এখানে। বাবা শুনতে পেয়েছিলেন বলে বেঁচে গেলাম। ধমক দিয়ে বললেন, আইন নেই বলে টাকা দেব তোমায়! আহ্লাদ পেয়েছ!

জানতে পারলুম যে ক্যামেরা জমা দিতে হয় প্রবেশের সময়। দর্শনী নেই। ছোট ঘোরানো দরজা দিয়ে ভিতরে যাবার পথ, অন্য দিকে বেরবার। সিঁড়ি দিয়ে আমরা দোতলায় উঠলুম।

প্রথম দর্শনেই মনে হল যে একে জাদুঘর বললে ভুল হবে। এ যেন এক রাজপরিবারের পারিবারিক সংগ্রহশালা। সেখানে রাজার আচকান ও পাগড়ি থেকে রাণীর ঘাগরা ও ওড়না পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। সিল্ক টিস্যু ও ব্রোকেডের ছড়াছড়ি। কত রকমের পুতুল! আমার সব চেয়ে ভাল লাগল দু জোড়া প্রমাণ মেয়ে-পুরুষ! একদিকে কৃষক দম্পতি, অন্য দিকে শেঠ-শেঠানী। খাঁটি রাজস্থানী পোশাকে দর্শকের মনোরঞ্জন করছে। মনে হচ্ছিল যে জয়পুরের রাস্তায় বুঝি ইতিমধ্যেই আমরা এদের দেখে এসেছি।

নিচের তলাতেও অনেক জিনিস দেখলুম। পিতল ও ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র, নানা দেশের চীনে মাটির বাসন, অস্ত্রশস্ত্র, গালিচা কার্পেট আরও কত কি! তামাক-খাবার হুঁকো গড়গড়া ফরসি আলবোলা দেখেছিলুম। এখানে নতুন নতুন আরও জিনিস দেখলুম, সে সবের কী নাম তা জানি নে।

একটি মমিও দেখলুম। মিশরের মমি তার ঢাকনা খোলা। চিত্র-বিচিত্র মানুষটি যে এক দিন জীবিত ছিল, ভাবতে ভয়ই করে। মনে পড়ে মিশরের নানা গল্পের কথা। ভৌতিক গল্প। শান্তি ভঙ্গ করলে মমিরা কেমন রেগে যায়, তার অনেক কাহিনী পড়েছি বিলিতি বইয়ে। এমন করে আমরা দেখছি জানলে এও রাগ করবে না তো!

হাতে সময় নেই, একটা বেজে গেছে। মামী তাড়া দিয়ে বললেন: তোমাদের কি ক্ষিধে নেই, না খাবার নিয়ে কেউ বসে থাকবে!

মামা বললেন: এ কারও বাড়ি নয় যে ধুয়ে সাফ করে রাখবে। সন্ধ্যে বেলা ফিরলেও দেখবে, খাবার ঢাকা আছে।

এ শুধু তর্কের কথা। ক্ষিধে সবারই পেয়েছিল। আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

স্বাতির ক্যামেরা ছিল অন্য দিকের গেটে। আমাদের গাড়িও সেই দিকে ছিল। সামনের বারান্দা দিয়ে ঘুরে যাবার সময় ড্রাইভার আমাদের বাধা দিল। বলল: সেদিন এটা দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম।

বলে বারান্দার দেওয়ালে ছবি দেখাল। একখানা দুখানা নয়, অনেক ছবি। ছাদের নিচে চারধার ঘিরে ছবি। জয়পুরের সমস্ত রাজার বড় বড় ছবি। অবাক হয়ে আমরা সেই সব দেখতে লাগলুম।

হিসেব করে দেখলুম যে এই অ্যালবার্ট হলে চোদ্দজন রাজার

ছবি আছে। প্রথম ছবি মহারাজ পৃথ্বীরাজের, ১৫০৩-এ তিনি রাজা হয়েছিলেন। আর শেষ ছবি দ্বিতীয় মাধো সিংহের, ১৯২২-এ তিনি মারা গেছেন। চোদ্দখানি ছবিতেই হলের দেওয়াল গেছে ভরে। ড্রাইভার বলল: মহারাজ মানসিংহ জয়পুরের শেষ রাজা। তাঁর একখানি ছবি রাখলেই রাজবংশ সম্পূর্ণ হবে।

বলে একখানি ছবির জায়গা দেখাল। ঠিক একখানি ছবিরই জায়গা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যে শিল্পীরা হিসেব করে এই জায়গা রেখেছে।

মামীর সঙ্গে স্বাতি তখন রাজাদের চেহারা নিয়ে আলাপ শুরু করেছে। মান সিংহকে বড়ই বুড়ো দেখাচ্ছে। মোটা জবুথবু চেহারা। সাড়ে পাঁচ সের ওজনের তলোয়ার নিয়ে আসাম উড়িষ্যা থেকে কাবুলের বিদ্রোহ পর্যন্ত কী করে দমন করলেন ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। সোয়াই ঈশ্বরী সিংহ ও প্রথম মাধো সিংহ কী মোটা রে বাবা! চেহারা সুন্দর সোয়াই প্রতাপ সিংহের। জগৎ সিংহ আর রাম সিংহের দাড়ি দেখে মুসলমান বলেই ভ্রম হচ্ছে। খাঁটি রাজপুত চেহারা দ্বিতীয় মাধো সিংহের।

আমার দৃষ্টি তখন অন্য দিকে গেছে। একজন গ্রামের লোক তার স্ত্রীকে এই ছবিগুলি দেখাচ্ছে। রাজাদের পরিচয় ইংরেজীতে লেখা, রাজত্বকালও লেখা ইংরেজীতে। কিন্তু লোকটি মুখে মুখে রাজাদের পরিচয় দিচ্ছে। পড়তে যে পারে না, তা জানতে পারলুম একটা প্রশ্নে। ভাতসিংহের নামটা মনে করতে না পেরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

তাকে উত্তর দিয়ে আমি স্বাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। বললুম: কৃষক দম্পতির পুতুল দেখেছ ভেতরে। এবারে মিলিয়ে নাও তো।

পুরুষটি দেখলুম আধ ময়লা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরেছে হাঁটুর নিচ অবধি। গায়ে ফতুয়া, কিন্তু বুকের উপরটা চাপকানের মতো।

তাতে রঙিন পটি, আর বোতামের বদলে গিঁট বাঁধা। মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে সাদা কাপড় পাকিয়ে, পায়ে পরেছে খড়ম। ডান হাতে এক গাছা লাঠি নিতে ভোলে নি।

তার স্ত্রীকেও আমি লক্ষ্য করলুম। হাঁটুর নিচ অবধি ঘাগরা পরেছে ছিটের, গায়ে ফুলহাতা ব্লাউস। একখানা লাল রঙের ওড়না ডান কাঁধ থেকে মাথার উপর দিয়ে পিছনে ফেলেছে। তার একটা ধার টেনে এনে বাঁ দিকের কোমরে গোঁজা।

স্বাতি বলল্: গয়না দেখছ গোপালদা?

গহনা সত্যিই দেখবার মতো। হাতে নানা রঙের চুড়ি বালা, কপালে টিকলি, গলায় গোটা মুক্তোর মালা। নকলই নিশ্চয়। হাতের তুই বুড়ো আঙুলে তুটো রূপোর আংটি। তার পায়ের দিকেও আমি দেখলুম, জরির নাগরা পরেছে পায়ে।

স্বাতি আর একটা জিনিস দেখাল। বাঁ হাতে একখানি ছোট পাখা। তাই দিয়ে মাঝে মাঝে হাওয়া খাচ্ছে।

মামা মামী এগিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ইচ্ছে হল যে বউটির কণ্ঠস্বর শুনি। শুনতে পেলুম, কিন্তু কী বলল বুঝতে পারলুম না। বুড়ো ড্রাইভার আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বললুম: কী বললে শুনতে পেয়েছ?

হাসতে হাসতে বুড়ো বলল: এত ছবি আছে রাজাদের, রাণীদের ছবি নেই কেন?

স্বাতি বলল: সত্যিই তো!

বুড়ো বলল: রাণীদের ছবি কি বাইরে রাখা যায়!

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কেন যায় না গোপালদা!

কেন যায় না তা আমিও জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে অন্তঃপুরবাসিনীরা এদেশে অসূর্যম্পশ্যা। নারীকে দেবীর মতো সম্মান করে ক্ষত্রিয় রাজপুত। শিষ্টাচারের সামান্য অভাব ঘটলে রক্তপাত হয়েছে পাশবিক। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। স্বাতির

প্রশ্নের উত্তর আমি সংক্ষেপে দিলুম: কোন রাজপুতকে তা জিজ্ঞেস কোরো।

আমি জানি যে স্বাতিকে আমি ফাঁকি দিলুম। রাজপুত নারী তার স্বামীকে আজ এই প্রশ্নই করছে। কিন্তু মামার তাড়াতে পুরুষের উত্তরটা আর শোনা হল না।

৭

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস ধরা গেল। জয়পুর থেকে আজমীর পঁচাশি মাইল রাস্তা, রেলে সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। ছটায় গাড়ি ছেড়ে সাড়ে নটায় পৌঁছবে। গাড়িতে তাই প্রচুর ভিড়। আজমীরে যে গাড়ি খালি হয়ে যাবে, তা বোঝা যাচ্ছে যাত্রীদের উদ্বেগের অভাব লক্ষ্য করে।

গাড়িতে যখন মালপত্র গুছিয়ে তুলছিলুম, মামা আমার উপর কড়া নজর রেখেছিলেন। গাড়ি থেকে নামতেই চেঁচিয়ে উঠলেন, বললেন : কোথায় যাচ্ছ ?

বললুম : পাশের গাড়িতে।

মামা রাগ করে বললেন :। পাশের গাড়িতে কেন! আমি তো তোমায় এই গাড়িরই টিকিট কিনতে বলেছিলুম !

আমি তাঁকে শান্ত করবার জন্যে বললুম : রাতের গাড়ি হলে এক সঙ্গেই যেতুম।

বলেই সরে গেলুম তাঁর সামনে থেকে। তাঁর আদেশকে এড়িয়ে যাবার বাসনা আছে, কিন্তু অমান্য করবার সাহস ফেলেছি হারিয়ে। তাঁর স্নেহের আস্বাদ পেয়েছি, পেয়েছি তাঁর দুর্বলতার পরিচয়। সামনে থেকে সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কী লাভ এতে ! অনেক দিন আগেই এই লাভের কথা জানতে পেরেছি। তৃতীয় শ্রেণীতে যারা চলে তাদের মধ্যে আমার মতো মানুষই বেশি। আরামে পা ছড়িয়ে পাইপ মুখে তারা চলে না, সঙ্গিনীর কোলে খোলা সিনেমা কাগজের ছবি দেখে না উঁকি দিয়ে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগারের পয়সা যে রোজ কোম্পানিকে দিচ্ছে, সে সম্বন্ধে এ গাড়ির যাত্রীরা সারাক্ষণ

সচেতন। জানলা দিয়ে বাহিরের দৃশ্য যতটা দেখা যায়, সঙ্গীর কাছে যতটুকু জানা যায়, তার জন্যেও ষোল আনা লোভ। যা দেখেছি শুধু তাই নয়, যা দেখি নি তারও গল্প বলতে হবে দেশে ফিরে। তা না হলে গাঁটের কড়ি উসুল হবে কেন! আমারও এই জানবার লোভ। তৃতীয় শ্রেণীর ভিড়ের ভিতর বসে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা যায়। একজন না জানলে আর একজন বলে। সকলে আকুল হয় বলবার জন্যে। এই একাত্মবোধ আমার ভাল লাগে। জানবার বাসনা হয় চরিতার্থ। এ কি কম লাভ!

দক্ষিণ ভারতের কথা মনে পড়ল। সেই ভ্রমণের সময় ভাগ্য আমাকে সাহায্য করেছে প্রতি পদে। অন্ধ্রের শ্রীনিবাসলু ও রাজলু, তামিলনাড়ুর ভেঙ্কটাইয়ার ড্যানিয়েল ও সুব্রহ্মণ্য, কেরালার পিল্লাই আর নাম্বুদ্রি, কুর্গের মেয়ে তাপ্তি—এঁরা সবাই তাঁদের মূল্যবান সঙ্গ দিয়েছেন, আমার জ্ঞানের ঝুলি ভরে দিয়েছেন অকৃপণ হাতে। এই সঙ্গেই মনে পড়ল কালীঘাটের হালদার ও মৈত্র মহাশয়ের কথা। তাঁরাও আমার অনেকগুলি মুহূর্তকে রঙিন করে তুলেছেন নানা কথায়। এবারের যাত্রায় কি তেমন সঙ্গী আমি পাব না?

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলো দেখে দেখে এগোতে লাগলুম। সামনে নয়, পিছনে। কোন গাড়ীই পছন্দ হচ্ছিল না। ছোট লাইনে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, প্রায় আধ ঘণ্টা। তাই রক্ষে। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরলুম। এক ভদ্রলোক যে আমায় লক্ষ্য করছিলেন, তা বুঝতে পারলুম তাঁর কথা শুনে। বললেন: কাউকে খুঁজছেন আপনি?

প্রথমটায় চমকে উঠেছিলুম। তার পরেই হেসে বললুম: ঠিক ধরেছেন। আমি আপনাকেই খুঁজছি।

একটা কোণায় একটুখানি জায়গা পেয়েছিলেন ভদ্রলোক। হেসে বললেন: উঠে আসুন।

বুঝতে পারলুম যে ভদ্রলোক আমার রহস্যটা ধরতে পেরেছেন। দরজা দিয়ে উঠে কাছে আসতেই আরও একটুখানি গুটিয়ে আমায় বসতে বললেন। বসবার জায়গা যে নেই তা দেখতেই পাচ্ছিলুম। কিন্তু তবু বসতে পারলুম। পাশের ভদ্রলোকটি বিরক্ত মুখে আর একটু জায়গা ছেড়ে দিলেন।

যিনি আমায় ডেকে জায়গা দিলেন, তিনি একটু হাসলেন এই ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে। আমি বসতেই বললেন: একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন তো!

কী করে ধরলেন?

সেটা কি কঠিন কাজ!

তা নয়। তবু এত জনের ভেতর একজনকে লক্ষ্য করা কঠিন কাজ বই কি!

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন: বাঙলা দেশ থেকে বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

ঠিক তাই।

কবে এসেছিলেন জয়পুর?

আজ সকালেই।

একদিনেই সব দেখা হয়ে গেল!

আমি লজ্জিত হয়ে বললুম: তা কি হয়! তবু সব দেখা হল বলে মনকে সান্ত্বনা দিতে হচ্ছে। সময়ের অভাবটাই এখন সব চেয়ে বড় অভাব।

আমার যুক্তি ভদ্রলোক মেনে নিলেন, বললেন: তা ঠিক। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের দাম যাচ্ছে বেড়ে। অন্যের বেলায় এই সত্যটা আমরা ভুলে যাই।

একটু থেমেই নিজের পরিচয় দিলেন, বললেন: পরিচয়ের পর্বটা এইবারে সেরে নেওয়া যাক, পরে লজ্জা পেতে হবে।

তাড়াতাড়ি আমি নিজের পরিচয়টা দিয়ে দিলুম। ভদ্রলোক

বললেন : লোকে আমায় লাল বলে, কুঞ্জ্ বিহারী লাল। বাড়ি আলোয়ারে, আজমীরে কর্মক্ষেত্র।

ভদ্রলোক হিন্দীতে কথা কইছিলেন। নাম বললেন কুঞ্জ্ বিহারী, কুঞ্জ্ বিহারী নয়। পেশা দালালি। কিসের দালালি তা বললেন না।

তারপরেই ভদ্রলোক আবার তাঁরা পুরনো কথায় ফিরে গেলেন, বললেন : দিল্লী হয়ে আসছেন, না, আগ্রা হয়ে ?

বললুম : আগ্রার পথে।

ভরতপুর তা হলে দেখেছেন ?

ভরতপুর পেরিয়েছি মাঝরাতে, আর মামার বিপদের তার পেয়ে আসছি। কাজেই মাঝপথে নেমে পড়ার প্রশ্নই জাগে না। কোন কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা না করে বললুম : না।

কিন্তু ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন, বললেন : সেকি ভরতপুর দেখেন নি ! ভরতপুরের বিখ্যাত দুর্গ না দেখেই জয়পুরে চলে এলেন !

এর জবাব আমি আগেই দিয়েছি। তাই আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে বললেন : লর্ড ওয়েলেসলির সময় ভরতপুর যুদ্ধের কথা মনে নেই ? লর্ড লেক ব্যর্থ হয়েছিলেন এই দুর্গ জয়ে। আর আপনাদের জেনারেল কালু ঘোষ কী করে যুদ্ধ জয় করলেন সেকথা শোনেন নি ?

বললুম : শুনিনি তো।

সেকি ! একজন বাঙালী কেরাণী বাবুর অমন বিক্রমের কথা আপনারা শোনেন নি !

সত্যিই শুনিনি।

প্রচুর উৎসাহে ভদ্রলোক বললেন : লর্ড লেক এই দুর্গ বারবার আক্রমণ করে ভরতপুরের জাঠদের কাছে পরাজিত বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। বাকি ছিল দুজন পল্টন, তারা এসে কালু ঘোষকে বলল, কেরাণীবাবু, প্রাণে বাঁচতে হলে, জেনারেলের পোষাক পরে তুমি এগিয়ে এস। কালু ঘোষ তাই করলেন। জিতেও

গেলেন যুদ্ধে। কিন্তু তারপরে বিচার হল তার। বিচারে প্রথমে শাস্তি হয়েছিল, পরে অবশ্য পুরস্কার পান তিরিশ হাজার টাকা, আর জেনারেল উপাধি।

সত্যি!

ভদ্রলোক হেসে বললেন: অনেকে অবশ্য বলেন যে জেনারেল উপাধিটা তাঁর দলের লোকের দেওয়া।

তারপর?

ভদ্রলোক দুঃখিত ভাবে বললেন: আমহার্স্টের আমলে এই দুর্গের পতন হয়েছিল। ইংরেজ প্রভু স্বর্গত ভরতপুররাজের নাবালক পুত্রকে বসিয়েছিলেন সিংহাসনে। কিন্তু দুর্জনশাল নামে রাজার এক আত্মীয় নাবালককে সরিয়ে নিজে সিংহাসনে বসেছিলেন। লর্ড কম্বারমিয়ার এসে খুব সহজে দুর্গ জয় করেছিলেন।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন: এই দুর্গ নির্মাণের ইতিহাস জানেন তো?

ইতিহাসের তথ্য আরও শুনতে হবে ভেবে ভয় পাচ্ছিলুম। কিন্তু লাল সাহেব বললেন: ভরতপুর হল জাঠদের দেশ, গজনীর সুলতান মামুদকে আক্রমণ করেছিল। তৈমুরলঙ্গকেও আক্রমণ করে খুব ক্ষতি স্বীকার করেছিল। মোগল বাদশাহরা কোনরকমে তাদের দাবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেই চুড়ামন জাঠ বাদশাহর অর্থ লুঠ করে এই দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনিই ভরতপুরের প্রধান রাজা।

এর পরে ভদ্রলোক অন্য কথা বললেন: ভরতপুরের দুর্গদ্বার যদি ভাল করে না দেখেন তো বুঁদির সঙ্গে ভুল করে ফেলবেন। অন্ততঃ ছবিতে তো করবেনই।

কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক বললেন: দরজার দু ধারে দুটো হাতির ছবি আছে, বিরাট হাতি, তার ওপর লোকজন। এমনি হাতি আছে বুঁদির

কেল্লার দরজার পাশেও। তফাতও আছে, কিন্তু শুধু হাতির কথা মনে রাখলে ভুল করতেই হবে।

বুঁদির নামে আমার বুঁদির কেল্লার কথা মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতার কথা। জিজ্ঞাসা করলুম: বুঁদিতে কী দেখবার আছে?

রাজস্থানের সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদ হল বুঁদিতে। এ আমার কথা নয়, টড সাহেব এই মন্তব্য করেছিলেন। এ প্রাসাদ তো একজনের তৈরি নয়, পাহাড়ের গায়ে রাজারা নিজেদের নামে এক একটা মহল তৈরি করে এত বড় করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে দেখে মনে হয় একজনেরই তৈরি একই সময়ে। এর পরে আমি আলোয়ারের কথা জানতে চাইলুম, বললুম: আপনার দেশ আলোয়ারে কী দেখবার আছে?

ভদ্রলোক বললেন: জয়পুরের পর আলোয়ারে আর কী দেখবেন! দুর্গ দেখুন। ত্রিকোণের মতো পাহাড়ের ওপর আলোয়ারের দুর্গ। পেছনে পর্বতশ্রেণী আর নিচে একটি জলাশয়। আর রাজপ্রাসাদের ভেতরে যদি যান, একটি ছোটখাটো জাদুঘর দেখবেন। অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ বেশ ভাল। আর লাইব্রেরিটি দেখতে ভুলবেন না। সংস্কৃত আর ফার্সি বইএর এমন সংগ্রহ এদিকে আর নেই।

তা হলে দেখছি এ দুটো শহর ডিঙিয়ে এসে খারাপ কিছু হয় নি। তাই নয়?

খারাপ হয়েছে বলার ধৃষ্টতা আমার নেই।

কেন?

ভ্রমণ একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্থান নির্বাচনে ভ্রমণকারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার।

সব সময় আমরা যে এ কথা মেনে চলি না, সেই কথা আমার মনে পড়ল। এই তো আজ দুপুরের আহারের পর মামাবাবুর

রাজস্থান ভ্রমণের প্রোগ্রামটাই গেল বদলে। আমার জন্যই তো বদলাল। আমার প্রস্তাবে আর স্বাতির আগ্রহে। অনেক দিন আগে যখন চিতোর দেখেছিলেন মামা মামী, সে সময় জলের কষ্ট তাঁদের পীড়া দিয়েছিল। চিতোর দেখার আনন্দ ছাপিয়ে সেই জলের কষ্ট আজও বড় হয়ে আছে। অনেক চেষ্টা করে মামী আর একটা কথা মনে করলেন, সে ধুলো। স্বাতি স্বীকার করল যে সে খুবই ছোট ছিল। তখনকার কথা মনে না থাকলে দোষ নেই। বলেছিলুম: মামাবাবু, জল আর ধুলো নিয়ে তো চিতোর নয়, চিতোর আপনি ভুলে গেছেন।

মামার চটে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তা উঠলেন না। বললেন: স্মৃতিশক্তির গর্ব আমার কোন দিন নেই।

মামীর দৃষ্টি বাঁচিয়ে স্বাতি আমার দিকে চাইল। বলল: চিতোরে কোন তীর্থ নেই গোপালদা?

বললুম: নেই কে বললে! পীঠস্থান না হলে কি তীর্থস্থান হয় না!

মামী আমার মুখের দিকে চাইলেন। বললুম: চিতোরে কালিকাদেবীর বিখ্যাত মন্দির। একই ঘরে কালী ও দুর্গা। শুধু রাজস্থান নয়, আশপাশের জায়গা থেকেও লোকে মানত করে আসে, ছোট ছেলের মাথা মুড়োয়।

মামা আশ্চর্য হলেন, বললেন: এ সব কথা কোথায় শুনলে?

লোকের মুখে। আপনাদের কাছে আমি গল্প বলি, কিন্তু অন্যের কাছে গল্প শুনি।

তারপর ঘটনাটা খুলে বললুম। আগ্রা থেকে এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক চিতোরে যাচ্ছিলেন ছেলেকে নিয়ে। ছেলের একমাথা লম্বা চুল। তাঁর মুখেই এই কালিকাদেবীর মন্দিরের গল্প শুনেছিলুম।

স্বাতি বলল: তবে তো আমাদেরও যাওয়া দরকার।

মামী আপত্তি করলেন না, কিন্তু মামা যেন একটু বিপদে

পড়লেন। তাড়াতাড়ি আমি বললুম : যেতে যে হবেই এমন কথা আমি বলছি না। ভারতবর্ষে এমন মন্দির তো ঢের আছে।

কিন্তু চিতোর যে একটা।

বলেই স্বাতি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। মামাকেও বড় উদ্বিগ্ন দেখলুম। আমার মনে হল যে এ সমস্তর পিছনে একটা ঘটনা আছে। সেটা আমার সামনে বলা যায় না। আমি তাই আলোচনাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলুম, বললুম : দিল্লীতে সবাই কেমন আছেন ?

স্বাতি বুঝি চমকে উঠল। আমি যে এমন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, মনে হল এ কথা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। মামী তাঁর মুখ ফেরালেন। আর মামা তাঁর পাইপ সরালেন মুখ থেকে, বললেন : দিল্লীর কথাই ভাবছি।

স্বাতির মুখে আমি এক রকমের ব্যাকুলতা দেখলুম।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : রাণা আসছে।

তাই নাকি !

আমি খুব আগ্রহ প্রকাশ করলুম মামার কথায়। কিন্তু তাঁকে খুশী হতে দেখলুম না। বললেন : হ্যাঁ। ছুটি পেলে আমাদের সঙ্গেই আসত। অনেক চেষ্টাও করেছিল।

আমি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়েও থেমে গেলুম।

মামা বললেন : দোসরা গান্ধীজীর জন্মদিন, তার পর দিন বিজয়া। দু তারিখ বিকেল বেলায় ও আবু আসবে। দুদিন থাকবে আমাদের সঙ্গে।

পাইপটা মুখে লাগিয়ে মামা তাঁর পকেট থেকে ওয়ালেট বার করলেন। একখানা কাগজ এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি হাত বাড়িয়ে তা নিলুম। ভ্রমণের ইটিনেরারি। দেখলুম, দোসরা দিল্লী মেলে তাঁরা আজমীর ছাড়বেন। আবু পাহাড়ে থাকবেন

চৌঠা বিকেল পর্যন্ত। বুঝতে পারলুম যে রাণার সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে দিল্লীতেই। পূজোর সময় ছুটি না পেয়ে পরে পেয়েছে। মামা বললেন : ওর জন্যেই আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি। আবু পাহাড় পেরিয়ে সৌরাষ্ট্র যাবার সময় ওর নেই।

সে কথা বুঝতেই পেরেছি। রাণা সঙ্গে থাকলে আমার ডাক পড়ত না। ইংরেজ আমলের ঝানু আই. সি এস. মিস্টার ব্যানার্জির একমাত্র পুত্র। নিজেও পদস্থ অফিসার। স্বাতির সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধটা নিশ্চয়ই এত দিনে পাকা হয়ে গেছে। সে সঙ্গে থাকলে মামা মামীর আনন্দ সম্পূর্ণ হত। আর স্বাতির। সে কথা এখনও ঠিক বুঝি নে। সময় মতো স্বাতিকেই একদিন জিজ্ঞাসা করব।

মামী বললেন : বড় চাকরির এই সবই অসুবিধে।

মামা কিছু বললেন না, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখলুম যে স্বাতির কান দুটো লাল হয়ে উঠল। ছাই ফেলতে আমি যে ভাঙা কুলো, সে কথা বুঝতে দিতে সে চায় না। তাতে বড় অসৌজন্য, ডেকে এনে অপমান করার অধিকার কারও নেই। কিন্তু আমি উত্তর দিলুম : বেশি বড় চাকরি কিনা!

স্বাতি এবারে স্পষ্ট ভাবে প্রতিবাদ জানালে, কিন্তু বড় ভদ্র ভাবে। বলল : চিতোর আর উদয়পুর দেখা কি সম্ভব নয় গোপালদা?

না।

না কেন?

ও দিকে একবার ঢুকলে আবু পৌঁছাতে নিশ্চয় দেরি হয়ে যাবে।

তা হোক না!

মামী বাধা দিয়ে বললেন : তার মানে?

মামার দিকে চেয়ে দেখলুম, তিনি ঘন ঘন ধোঁয়া নিচ্ছেন। স্বাতি বিচলিত হল না, বলল : আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি মা।

হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু আমার চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে মামা বললেন : আবু পৌঁছতে কদিন দেরি হবে হিসেব করতে পার ?

চিতোর আর উদয়পুর দেখবার শখ আমারও ছিল। বললুম : দিন দুই। আজমীরে একটা দিন বাদ দিলে—

মামা বললেন : আজমীরে এক দিনই যথেষ্ট।

মামী সন্তুষ্ট হলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিতোর ও উদয়পুর দেখাই সাব্যস্ত হয়ে গেল। টাইম টেবিল মিলিয়ে বললুম : কাল রাতের গাড়িতে আজমীর ছাড়তে হবে। পর দিন সন্ধ্যাবেলায় উদয়পুর। আবু পৌঁছব চৌঠা সকালে।

মামা বললেন : বিপদ বাধবে রিজার্ভেসন নিয়ে।

তাড়াতাড়ি স্বাতি বলল : সে দেখা যাবে।

ভাবতে ভাবতে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। লাল সাহেব একটা ঠেলা দিয়ে বললেন : ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি !

না তো !

বলে আমি চমকে জেগে উঠলুম।

আজমীরে কোথায় উঠবেন ?

তা এখনও ঠিক করি নি।

আমার বাড়ীতেই উঠুন না।

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম : তা হবার নয়। আমার আত্মীয়রা সঙ্গে আছেন।

আপনি একা নন ?

তারপরেই বললেন : সত্যিই তো। মালপত্র বুঝি তাঁদের সঙ্গেই আছে !

আমি সমর্থন জানালুম।

লাল সাহেব বললেন : স্টেশনের কাছে বাঙালীদের ভাল ধর্মশালা আছে। তারই পাশে বাঙালী মিঠাইওয়ালা।

বলেই ভদ্রলোক হাসলেন।

হাসলেন যে!

বাঙালীরা তাঁকে বড় ভালবাসেন। তাঁর খাতায় তারিফ লিখে যান বড় বড় লোকে।

আমার মনে পড়ল এক লেখক বন্ধুর কথা। আজমীরে তিনি কর্মভোগ নামে এক রকম মিষ্টি খেয়েছিলেন. সে কী রকম জানতে চাইলে হেসে বলেছিলেন, আজমীরে গেলে খেয়ে দেখবেন।

লাল সাহেব আমায় ধর্মশালার পথ বাতলে দিলেন। স্টেশনের সামনে দিয়ে বড় রাস্তা। ডান দিকে খানিকটা হেঁটেই একটা মোড়। কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই ধর্মশালার দরজা দেখিয়ে দেবে।

আমি আর লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আজমীরের সব কথাই জেনে নিলুম। আজমীরের কথা, পুষ্করের কথা, তারাগড়, দরগা সাহেব, আনা সাগরের কথা। আজমীর কি ছোট জায়গা, না দেখবার জিনিস এখানে কিছু কম! জয়পুরে দেখা সব ফুরিয়ে যায়, ফুরোয় রাজস্থানের আর সমস্ত শহরে। কিন্তু আজমীরে ফুরোয় না। আজমীর তো আজকের শহর নয়! একদা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞ করেছিলেন। রামচন্দ্র পিণ্ডদান করেছিলেন বনবাসকালে। আর যুধিষ্ঠির এসেছিলেন তীর্থমানসে। এ কালের আর্যরা খ্রীষ্টের জন্মের সাত-আট শো বছর আগে এখানে আসেন। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে এখানে। আর আধুনিক মানচিত্রে আজমীর দেখা দিল অষ্টম শতাব্দীতে হর্ষের সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পর। আরও কত নাম আছে এই জায়গার সঙ্গে জড়িয়ে। সম্রাট বিগ্রহরাজ, চৌহানরাজ অজয়পাল, আর মন্দারের নরহররাও। অমর হয়ে আছেন ইসলামের মৈনউদ্দীন চিস্তি, আর আর্য সম্প্রদায়ের দয়ানন্দ সরস্বতী। নানা ধর্মের এমন অপূর্ব সমন্বয়ের স্থান সারা ভারতে দ্বিতীয় মিলবে না।

ভদ্রলোক বললেন: আজমীরের ভবিষ্যৎ কী হবে, এ নিয়ে

সেদিনও আমরা চেঁচামেচি করলুম। সেদিন মানে বছর কয়েক আগে। পাকিস্তানে যাবার পর রাজস্থানের যে কটা রাজ্য রইল, তাদের ভেতর প্রাকৃতিক কত প্রভেদ। বোম্বাই বাঙলার মতো মাটি নেই এদেশে। যা আছে, তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যে জায়গার উন্নতি ভাল হয় নি, যে জায়গাকে অবহেলা করা হয়েছে আর যে জায়গার উন্নতি করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে এখন রাজস্থানের তিনটি বিরাট রাজ্য—যোধপুর বিকানীর এবং জয়সলমের। মাটি নয়, বালির রাজ্য, ভূগোলে যার নাম পড়েছেন থর মরুভূমি। এই তিন রাজ্যের রাজারা রাজস্ব পেতেন সামান্যই। যা পেতেন, তা রেলের আয় আর কিছু মাল চালানের শুল্ক। দেশ স্বাধীন হবার পর সে আয়ও শেষ হয়ে গেছে। রেলের আয় যায় রেলের ঘরে, আর এক রাজ্যে শুল্ক আদায় বন্ধ। এই বিরাট দরিদ্র দেশটা রাজস্থানের ঘাড়ে চেপে, কী অবস্থা হয়েছে বুঝতেই পাচ্ছেন।

আমি হেসে বললুম: এইজন্যেই দরিদ্রের ভার কেউ নিতে চায় না।

ভদ্রলোক বললেন: না না, আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছি, আমরা না নিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো তার ভার নিত!

বললুম: আমিও সেই কথাই বলছি। তিনটে ভাইয়ের অবস্থা যদি তিন রকম হয়, আপত্তি আগে ওঠে ধনী ভাইয়ের কাছ থেকে। তারপর ধনী ও মধ্যবিত্ত দু ভাইয়ের কাছে লাথি খেয়ে যখন দরিদ্র ভাই জোটে নির্যাতিতের দলে, তখন সরকার লাগে তার পেছনে। কথা না বলে থাকতে পার থাক, কথা কইলেই গলা টিপব।

লাল সাহেব একটু বিব্রত ভাবে আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমি বললুম: এখনও আমরা নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়েই মেতে আছি, নিজেদের স্বার্থ ও সংকীর্ণতা নিয়ে। দেশকে অগ্রসর হতে তাই প্রতি পদে বাধা পেতে হচ্ছে। আর বাধার সৃষ্টি আমাদের নেতারাই করছেন শুধু ক্ষমতার লোভে।

ভদ্রলোক বললেন : এ আপনার রাগের কথা।

আমি হেসে বললুম : ভয় পাবেন না। এ আমার কথাই নয়। আগ্রার প্ল্যাটফর্মে এক ভদ্রলোকের কথা। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর সঙ্গীদের এই গল্প বলছিলেন।

ভদ্রলোক আশ্বস্ত হলেন। বললেন : আমরা খুব চেষ্টা করেছিলুম রাজস্থানকে তিনটে ভাগ করবার' পূর্ব রাজস্থান, দক্ষিণ রাজস্থান আর পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ। তার ভেতর শেষেরটা যেত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

উত্তরে আমি বললুম : বাঙলা দেশে আমরা কী চাই জানেন? আমরা জমি চাই। ভাল মন্দ তার বিচার পরে করব, আপাতত জমি পেলেই খুশী। আপনাদের এই সীমান্ত-প্রদেশ বাঙলার কাছে হলে আমরা হয়তো ওই জমির জন্যেই কাড়াকাড়ি করতুম।

বলেন কি!

বললুম : তারপর জমি পেলেই শুরু করতুম চেঁচামেচি। এটা চাই, সেটা চাই। একটা বাঁধ, দুটো কারখানা, তিনটে—

লাল সাহেব হেসে ফেললেন।

আমি হেসে ফেললুম আর একজনকে দেখে। ট্রেন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। কতক্ষণ থেকে তা খেয়াল করি নি। ট্রেনের ঘণ্টা শুনে যে তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ির দিকে ছুটল, আমি তার শাড়ির আঁচল দেখতে পেলুম। ও রঙ আমার চেনা, ও রঙে নেশা আছে মনে হল। পরের স্টেশনে আমি ওই রঙের সন্ধান করব।

৮

আমি জানি যে অনেকক্ষণ আমাকে দেখতে না পেয়ে মামা নিজে ব্যস্ত হয়েছিলেন। দুর্ভাবনা আমার জন্য নয়, দুর্ভাবনা তাঁর নিজের। স্বাতি এই সুযোগটুকু ছেড়ে দেয় নি। আমি কি করছি দেখে গেল। আমার অজ্ঞাতেই হয়তো দেখে যেতে চেয়েছিল। ভেবেছে সফল হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে দেখে ফেলেছি।

পরের স্টেশনে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। কিশনগড় বড় স্টেশন। লাল সাহেব বললেন: এইখেনেই খেয়ে নেবেন।

বললুম: ডাইনিং কারে খাবার কথা বলে রেখেছি। কিশনগড়েই দেবে বলেছে।

ভদ্রলোক বললেন: ভাল করেছেন। তা না হলে আজমীরে খুব দেরি হয়ে যেত।

আপনি খাবেন না ?

উত্তরে তিনি একটুখানি হাসলেন।

হাসলেন যে ?

উপায় নেই। গাড়িতে আমায় উপবাস করতেই হবে।

এ গোঁড়ামির কথা। এ যুগেও লোকে এমন গোঁড়া আছেন! বিশেষ করে দালাল মানুষ! বিস্ময় জাগে।

কিশনগড় স্টেশনটা ছোট নয়। গাড়িও দাঁড়ায় অনেকক্ষণ। আমি মামা মামীর গাড়িতে গিয়ে খেয়ে এলুম। বসবার জায়গা নেই সেখানে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে হল। মামা বললেন: রোজই কি এ দিকে এমনই ভিড় ?

কাকে এ প্রশ্ন করলেন, তিনিই জানেন। বাঙলা বুঝবে, এমন লোক আমি একাই আছি। কিন্তু প্রতি দিনের খবর আমি

কোথা থেকে রাখব। আজ অবশ্য একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারকে দেখছি বদলি হয়ে যাচ্ছেন। আর একটি পরিবার তাঁদের দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কিছু খাবারও এনেছেন। খানিকক্ষণ তাঁদের কথোপকথন শুনে বুঝতে পারলুম যে এঁরা রেলের কর্মচারী। বাঁদিকুই থেকে আজমীর যাচ্ছেন বদলি হয়ে। ইঞ্জিনের ড্রাইভার হওয়াই সম্ভব। নিজের গাড়িতে ফিরে আসবার আগে এই খবরটুকু মামাবাবুকে দিয়ে এলুম।

মামা বললেন: এ খবর দিয়ে আমি কী করব?

করবার কিছুই নেই। আজমীরের রিটায়ারিং রুমে এঁরা ভিড় করবেন না, এইটুকুই আনন্দের খবর।

কিশনগড় সম্বন্ধে যে আরও খবর ছিল, তা পরে জানলুম লাল সাহেবের কাছে। আগে এই গল্পটি শুনলে কাজে লাগাতে পারতুম। কিশনগড় হল চঞ্চলকুমারীর দেশ।

চঞ্চলকুমারীর গল্প জানেন?

রাজসিংহের চঞ্চলকুমারীর কথা বলছেন?

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন: ঠিক ধরেছেন। কিন্তু চঞ্চলকুমারী হল আপনাদের দেওয়া নাম।

তাঁর কথাটি আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। ভদ্রলোক বুঝিয়ে বললেন: বাঙালী এক বন্ধুর মুখে শুনেছি, রূপনগরের রাজকন্যার নাম ছিল চঞ্চলকুমারী। তিনি নাকি বাঙলা বইয়ে পড়েছেন। বাঙলা উপন্যাসে। টড সাহেব এই রাজকন্যার নাম বলেছেন প্রভাবতী, আর আমরা বলি চারুমতী বাঈ।

ব্যাপারটা আরও যেন জটিল হয়ে গেল। বললুম: একটু বুঝিয়ে বলুন।

লাল সাহেব হেসে বললেন: তবে গোড়া থেকেই বলি। কিশনগড় বা কৃষ্ণগড় থেকে রূপনগর বেশি দূর হবে না। খুব জোর

মাইল বারো। ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লীর বাদশাহ, তখন গোটা রাজস্থানটাই তাঁর অধীন হয়েছে। বড় বড় রাজা মহারাজারা যেন তাঁর পদানত জায়গীরদার। তেমনই একজন সামান্য রাজা হলেন রূপনগরের বিক্রম সোলাঙ্কি। মারবারের রাঠোর বংশের এক বংশধর। প্রভাবতী তাঁরই বড় মেয়ে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এ মেয়ের নামের এমন বিভ্রাট কেন হল বলতে পারেন?

লাল সাহেব একটু ভেবে বললেন: বোধ হয় নামটা কারও জানা নেই।

তারপরেই বললেন: উপন্যাসের কথা আলাদা, নাম ঠিক লেখবার দায়িত্ব নেই লেখকের। আর টড সাহেব শুনে লিখেছেন, কাজেই তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না।

আপনি তা হলে শেষের নামটাই ঠিক মনে করেন?

কেন করি, তাও বলছি। বীর বিনোদ নামে কোন বইয়ের নাম নিশ্চয়ই শোনেন নি!

নিজের অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার করে নিলুম।

ভদ্রলোক বললেন: ঠিকই। তাতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। আমাদের কাছে এ একখানি অমূল্য বই। কিন্তু আপনাদের কাছে নয়। ডিঙ্গল ভাষা কজনে বোঝে! উর্দু মেশানো মারওয়াড়ী হিন্দী তা।

একটু থেমে বললেন: ইতিহাসে আপনার যদি অনুরাগ থাকে, তবে কলকাতায় ফিরে আপনাদের এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে একবার খোঁজ নেবেন। মস্ত বই, প্রচুর তথ্য। এ বই না পড়লে রাজস্থানের ইতিহাস পড়া আপনার অসম্পূর্ণ থাকবে।

পকেটে আমার নোটবই থাকে না। নোট বইয়ে কিছু টুকে নেবার অভ্যাসও নেই, চেষ্টা করলেও ভুলে যাই। তবে মনটাকে প্লেটের মতো করে নিয়েছি। যা দেখি বা শুনি, অলক্ষিতে তা লেখা

হয়ে যায়। স্পষ্টতা মুছে গেলেও অস্পষ্ট ভাবে সব কিছুই জেগে থাকে। ভাবলুম, বীর বিনোদের নামও আমার মনে থাকবে। কলকাতায় ফিরে পড়ে দেখবার চেষ্টা করব।

লাল সাহেব বললেন: আরও একটু সামঞ্জস্যের অভাব আছে। বীর বিনোদে আছে, রূপনগরের রাজা তখন স্বর্গত রাজসিংহের পুত্র মানসিংহ। ইনি কিন্তু জয়পুরের রাজা নন। চারুমতী বাঈ মানসিংহের ভগিনী। মহারাজা রাজসিংহ বড় ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি শ্রীনাথজীর পরম ভক্ত ও বল্লভ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। সমুনগরে দারা ও ঔরঙ্গজেবের যে লড়াই হয়, সেই যুদ্ধে।

একটু থেমে বললেন: তাঁর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর রুধিরাক্ত হীরার কণ্ঠি এক ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দেন এবং অনুরোধ করেন যে ব্রাহ্মণ যেন মথুরায় গিয়ে শ্রীনাথজীর জন্যে সেই কণ্ঠি গোসাঁইদের হাতে সমর্পণ করেন। গোসাঁইরা সেই অলঙ্কার পেয়ে দেখলেন যে তাতে রক্তের দাগ। তাই সেটি পরিষ্কার করবার জন্য স্যাকরাকে দিলেন। পর দিন সকালে সবিস্ময়ে সবাই দেখলেন যে শ্রীনাথজীর কণ্ঠে সেই রক্তমাখা কণ্ঠি। ভক্তের ভগবান অলক্ষিতে স্যাকরার গৃহে গিয়ে সেই কণ্ঠি পরে এসেছেন।

ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি জানেন বোধ হয়, এই শ্রীনাথজী এখন উদয়পুরের নিকট নাথদ্বারে?

এ আমার জানবার কথা নয়। শুনেছিলুম, এক সময় ঔরঙ্গজেব বাদশার উপদ্রবে মথুরা ও বৃন্দাবনের অনেক বিগ্রহ পুরোহিতেরা রাজস্থানে সরিয়ে এনেছিলেন। জয়পুরে এমন অনেক বিগ্রহ আছে।

লাল সাহেবকে আমি তাঁর গল্পের সূত্র ধরিয়ে দিলুম। বললুম: আপনি চঞ্চলকুমারীর কথা বলছিলেন।

ভদ্রলোক লজ্জিত হলেন না, বললেন: ও গল্প আর কতটুকু!

আরম্ভ করলেই শেষ হয়ে যাবে। তাইতেই এই ভূমিকার বহর। আপনার কি ভাল লাগছে না?

লজ্জা আমিই পেলুম, বললুম: ভাল না লাগার কথা বলছি না। চঞ্চলকুমারীর গল্প শোনবার জন্যে কৌতূহল বেশি হচ্ছে।

ও নামের মাহাত্ম্য। অমন নাম শুনলে এই বুড়ো বয়সেও আমি উৎসাহ পাই।

বলে হাসতে লাগলেন।

আমি কথা বললেই ভদ্রলোক আবার উত্তর দেবেন, গল্প শুরু করবেন না। তাই নীরব থেকে তাঁকেই বলবার সুযোগ দিলুম। লাল সাহেব কিছু বুঝতে পেরে বললেন: রূপনগরওয়ালীকে চঞ্চল-কুমারী বলি, কী বলেন?

বেশ তো।

ঔরঙ্গজেব তখন বুড়ো হয়েছেন। ছেলেরা চারি দিকে রাজ্য শাসন করছে। বড় ছেলে সুলতান মুয়াজ্জম তখন মহারাষ্ট্রে শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আকবর আজাম ও কামবক্সও চারি দিকে নানা কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ ঔরঙ্গজেব খবর পেলেন যে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী তাঁর রূপলাবণ্যে মনোহরণ করতে পারেন যে কোন পুরুষের। বাদশাহর মনে হল যে এমন রত্ন তাঁর নিজের হারেমেই শোভা পাবে। তাই বিলম্ব না করে দু হাজার অশ্বারোহী পাঠালেন রূপনগরে, তাঁর ভাবী বেগমকে আনবার জন্য। বিক্রম সোলাঙ্কি চোখে অন্ধকার দেখলেন। না বলার দুঃসাহস তাঁর নেই, কিন্তু হ্যাঁ বলবেন কোন্ প্রাণে? বৈষ্ণব রাজা রাজসিংহ তাঁর পূর্বপুরুষ, এত শীঘ্র সে কথা তিনি কেমন করে ভুলবেন! কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস। শেষ পর্যন্ত যবনের দোলায় চঞ্চলকুমারীকে তুলে দিতে হল রাজাকে।

সত্যি!

এইবারে চঞ্চলকুমারীর বুদ্ধি দেখুন। তিনি গোপনে তাঁদের

পুরোহিতকে পাঠিয়েছিলেন মেবারের রাণা রাজসিংহের কাছে। রাজসিংহকে তরুণ ভাববেন না। সুপুরুষও না। তাঁর দুই পুত্র ভীমসিংহ ও জয়সিংহ তখন তরুণ যুবক। কিন্তু চঞ্চলকুমারী বুড়ো রাণার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। লিখলেন যে তাঁর ধর্মরক্ষা করলে সানন্দে দাসী হবেন, অন্যথায় বিষপান করে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

তারপর ?

বাপ্পার বংশধর রাজসিংহ মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত করে উদ্ধার করে আনলেন চঞ্চলকুমারীকে।

লাল সাহেবের চোখে আমি অদ্ভুত আনন্দ দেখলুম। মনে হল যে সেই দিনের কথা স্মরণ করে আজও তাঁর বুক গর্বে ভরে উঠছে। হিন্দুর সে যে গৌরবেরই কথা। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে হিন্দুদের লাঞ্ছনার তো সীমা ছিল না। মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হত, বিসর্জন দিতে হত ধর্ম ও আত্মসম্মান। নইলে প্রাণটা দাও। রাজসিংহের এই প্রতিবাদ সেদিন সমস্ত ভারতের প্রতিবাদ রূপে দেখা দিয়েছিল। সে ইতিহাসের কথা। সে সব এখানে অবান্তর।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ভদ্রলোক হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন : আজমীর পৌঁছতে আর দেরি নেই।

তারপরেই বেঞ্চির নিচে উঁকি দিয়ে নিজের বাক্স বিছানাটা একবার দেখে নিলেন। সোজা হয়ে আরও কিছু দেখলেন। তা আমিও দেখতে পেলুম। ভদ্রলোক নিজের কনুই দুটো কোমরের উপর চেপে কিছু অনুভব করবার চেষ্টা করলেন। আমি জানি যে গাড়ির ভিতর এতগুলো মানুষের সামনে তিনি হাত দিয়ে তাঁর কোমরের গেঁজেটা দেখবার সাহস পাচ্ছেন না। মনে মনে আমি হাসলুম।

আশ্বস্ত হয়ে তিনি বললেন : আজমীরে কোথায় উঠবেন জানতে পারলে কাল আপনাদের সাহায্য করতে পারতুম।

বলতে কোনই বাধা নেই। কিন্তু নিশ্চয়তা নেই বলেই আগে বলি নি। এবারে আর এড়াবার চেষ্টা করলুম না, বললুম: স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে জায়গা যদি পাওয়া যায় তো বাইরে আমরা যাব না।

ভদ্রলোক খুব খুশী হলেন না। বললেন: অনর্থক অনেকগুলো পয়সা নষ্ট হবে। আমি যত দূর জানি, একখানা ঘরের ভাড়া দশ বারো টাকার কম নয়। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হলেই দুদিনের ভাড়া লাগবে। তার চেয়ে বিনি পয়সার ওয়েটিং রুমই তো ভাল। একটা রাতের জন্যে এমন শৌখিনতা কি আমাদের সাজে! কী বলেন?

তা বটে!

সমর্থন পেয়ে ভদ্রলোক বললেন: জানেন, আমার এক আত্মীয় কলকাতায় কাজ করে। কিছু দিন আগে সে একবার দেশে এসেছিল। দেখলুম, সেও বড় বেহিসেবী হয়ে গেছে। শুনে আশ্চর্য হবেন, কলকাতা থেকে সে দেশে এল সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ে। বললে, থার্ড ক্লাসে বড় ভিড়, তার ওপর—

লজ্জায় ভদ্রলোক যেন মরে যাচ্ছিলেন, বললেন: তার ওপর নাকি প্রেস্টিজের কথা। থার্ড ক্লাসে চড়লে লোকে কী বলবে!

এর পরেই ভদ্রলোক যেন ক্ষেপে উঠলেন। বললেন: মহাত্মাজী কত দিন মারা গেছেন বলুন তো? এর মধ্যেই দেশটা উচ্ছন্নে যাবে!

ঠিক কথাই তো।

ভদ্রলোক বললেন: আমাদের বাপ-দাদা বলতেন যে একটা পয়সা ঠিক মতো খাটালে একটা মানুষের জীবনেই লাখ টাকা হয়। আর আজকালকার ছেলে ছোকরারা পয়সা তো দূরের কথা টাকাকেই ভক্তি করতে চায় না।

আমি মেনে নিয়ে বললুম: একেবারে খাঁটি কথা।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন: আজ আমার একটা ভুল ধারণা ভাঙল।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই বললেন: আমরা জানতুম যে বাঙালীরা বড় বেহিসেবী। আমাদের দেশের লোকেরা তাদের ঠকিয়ে খাচ্ছে।

এখন কী মনে হচ্ছে?

এখন বুঝতে পাচ্ছি যে বাঙালীরা বোঝে সবই, কিন্তু বোকা সেজে থাকে।

হেসে বললুম: কেন এমন ভাবছেন বলবেন!

আপনাকে দেখেই তা ভাবছি। বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে আমার কথা ষোল আনার ওপর আরও দু আনা বুঝেছেন, যা আমার সেই বেকুফ আত্মীয়টা বোঝে না। বুঝলে কি হতভাগা সেকেণ্ড ক্লাসে আসে বাঙলা থেকে রাজওয়াড়া?

গাড়ির গতি ঝিমিয়ে আসছিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে দু-একটা আলো দেখেই ভদ্রলোক আলাপের বিষয় পালটালেন। বললেন: কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন?

কলকাতার কাছে উত্তোরপাড়ায়।

উত্তরপাড়া। জায়গাটা বলুন তো।

আমার ঠিকানা বললুম। ভদ্রলোক চট করে তাঁর নোটবুক বার করে আমার ঠিকানাটা লিখে নিলেন। বললেন: আমার আত্মীয়টিকে বলব আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

কোন উদ্দেশ্য নেই তো! কিছুটা চিন্তিত হলুম।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় কিছু অনুমান করলেন। বললেন: ভয় পেলেন নাকি?

হাসবার চেষ্টা করে উত্তর দিলুম: ভয় কিসের!

কিন্তু তাঁর এই প্রশ্নেই যেন ভয়টা আমার বেড়ে গেল। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন দালাল বলে। কিসের দালালি করেন, তা বলেন নি। কেন জানি না, এই মুহূর্তে তাঁকে পাকা দালাল বলেই আমার মনে হল।

ট্রেন এসে আজমীর স্টেশনে দাঁড়াল। বিদায় নেবার সময় বলে গেলেনঃ নামটা আমার মনে থাকবে তো। কুঞ্জ্‌বিহারী লাল। নোটবুক থাকলে লিখে রাখুন।

হেসে বললেনঃ কার্ড আমি রাখি নে।

আমিও নোটবুক রাখি নে।

তাঁর উত্তর দিতে আমার একটুও দেরি হল না।

৯

লাল সাহেবের উপদেশের কথা মামাকে বললেই ধমক খাব। তাই সরাসরি সবাইকে রিটায়ারিং রুমে নিয়ে এলুম। চারখানা ঘর। তার দুখানা খালি পাওয়া গেল। মামা যে খুশী হয়েছেন তা বোঝা গেল তাঁর পাইপ ধরানো দেখে। একখানা আরাম চৌকিতে বসে খালি পাইপটা টেবিলে দুবার ঠুকে বললেন: গোপালকে ঠিক এই জন্যেই আনা।

মামী তখন বাথ রুমের ব্যবস্থা দেখে ফিরছিলেন, মামার কথা শুনে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। মামা বললেন: এই রাত দুপুরে কোথায় গিয়ে উঠতুম বল!

এ তোমার রাত দুপুর হল!

মামী উত্তর দিয়েছিলেন নিস্পৃহ ভাবে। কিন্তু স্বাতি সবাইকে চমকে দিল, বলল: রামখেলাওন?

সত্যিই তো! রামখেলাওন আসে নি। গাড়ি থেকে ও কি নামে নি!

মামা সোজা হয়ে বসলেন, বললেন: হতভাগা জ্বালালে দেখছি। এমন লোক না আনলেই নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

আমি কিছু না বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। পিছনে মামীর গলা শুনতে পেলুম: ঘরে বসে গালমন্দ করলেই কি লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে!

অনেক কষ্টে অনেক সিঁড়ি ভেঙে মামা উপরে উঠেছেন, নিচে নামবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। স্বাতি বলল: আমি যাচ্ছি বাবা।

আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলুম। গম্ভীর ভাবে মামা স্বাতিকে বললেন: তুমি যাবে!

মামীও বাধা দিলেন না। বোধহয় সময় পেলেন না। ততক্ষণে

স্বাতি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আহমেদাবাদগামী ট্রেন তখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। আর বেশিক্ষণ হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নিচে নেমে এলুম।

পাশে পাশে চলতে চলতে স্বাতি বলল: তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

সত্যি নাকি!

স্বাতি বলল: ভেবেছিলুম, কাল সকাল বেলাতেই বলব। কিন্তু—

লজ্জা?

স্বাতি রাগের ভান করে বলল: অনেক দিন তো তোমার সঙ্গে কাটিয়েছি। সে বালাই আর নেই।

উত্তর শুনে আমি হাসলুম। আর স্বাতি বলল: রামখেলাওনকে পাওয়া যাবে। সে নিশ্চয়ই তার অ্যাটেণ্ডেণ্টের কামরায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছে।

তার পর?

তার খাওয়া হয় নি। তাকে একটা রিফ্রেশমেণ্ট রুমে বসিয়ে দিয়ে আমরা একটু ঘুরে আসব।

কোথায়?

এই ধর স্টেশনের বাইরেটায়।

আমি সম্মতি দিলুম।

রামখেলাওনকে খুঁজে বার করতে আমাদের একটুও সময় লাগল না। লোকটা সত্যিই ঘুমচ্ছিল। ডেকে তুলতেই অপ্রস্তুত ভাবে ঝোলাঝুলি হাতে নেমে এল। স্বাতি বলল: চল কিছু খাও আগে। তার পর তোমায় নিয়ে যাব।

খাবার জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আবার বলল: সাবধান, কোথাও যেয়ো না যেন। খেয়ে দেয়ে ঠিক এইখানে বসে থাকবে।

খাবার পয়সা আমি দিলুম রামখেলাওনের হাতে। তারপর স্বাতিকে বললুম: এবারে কোথায় যাবে?

বাইরেই চল।

আমরা ওয়েটিং রুমগুলোও একবার দেখে নিলুম। পুরুষদেরটা ভরে গেছে। বেঞ্চগুলো খালি নেই। লোকে মাটিতেও বিছানা বিছিয়ে শুয়েছে। মহিলাদেরও সেই একই অবস্থা। তবে মনে হল যে খানিকটা প্রভেদ আছে। বেশি মহিলা নেই, কিন্তু বাড়তি বিছানা আছে। দরজার সামনে দু একজন পুরুষমানুষ ব্যস্ত ভাবে পায়চারি করছেন। আমার কৌতূহল জাগল খানিকটা। একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম: ভেতরে জায়গা হবে একটু?

ভদ্রলোক বড় বিব্রত বোধ করলেন। স্বাতিকে একবার দেখে বললেন: এ তো মহিলাদের ওয়েটিং রুম।

তারপরেই বললেন: তা আসুন না, এক সঙ্গেই থাকা যাবে। সাড়ে দশটায় আর একখানা গাড়ি আসছে। তাতে বোধ হয় পর্দানসীন কেউ নামবেন না।

বললুম: আপনারাই থাকুন। আমরা ওপরে চেষ্টা করে দেখি।

যাবার সময় মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম যে ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত না হলেও আশ্বস্ত হয়েছেন অনেকটা।

গেটের টিকিট কালেক্টর তার হাত বাড়িয়েছিল। বললুম: টিকিট ওপরে আছে। রিটায়ারিং রুমে।

স্টেশনের বাইরেটা বেশ বাঁধানো। প্রশস্ত জায়গা। সেটুকু পেরিয়ে বড় রাস্তা রেল লাইনের সমান্তরাল গেছে। জয়পুরের মতো আড়া-আড়ি নয়। যাত্রীরা চলে গেছে। কোলাহল হচ্ছে না প্ল্যাটফর্মের মতো। বাতাসও অল্প অল্প বইছে। পরিবেশটি ভালই লাগল। বললুম: এবারে বল।

স্বাতি লজ্জা পেল কি না দেখতে পেলুম না। বলল: বেহায়া ভাবছ না তো!

তা কেন ভাবব!

তোমায় তো জোর করেই টেনে আনলাম।

তুমি ভয় পাও না বলেই এমন জোর কর। আমার সাহস নেই।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল: আমাকে তুমি ভয় পাও নাকি!

তারপরেই গম্ভীর হয়ে বলল: তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করছ গোপালদা। আমাদের যে কোন সম্বন্ধ নেই, সে কথাটা তোমার সারাক্ষণ মনে রাখা উচিত।

আমিও খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললুম: কে বলে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই?

এরই মধ্যে ভুলে গেলে! সেবারে বাবা তোমাকে বলেন নি যে তোমার মা তাঁর পাতানো বোন!

তা বলেছিলেন বটে।

তবেই দেখ। তুমি আমার সত্যি দাদা হলে কি আজ আমাদের এত ভাবনা হত!

বলেই সে খিলখিল করে হেসে উঠল। অবাধ উদ্দাম হাসি।

প্রশ্ন করলুম: এ সব কার কথা, মামীমার?

তাইতেই তো কাল সকালে তোমায় বলেছিলাম, মাকে একটু সমঝে চোলো।

রাস্তায় পৌঁছবার আগে ডান দিকে খানকয়েক বাস দেখতে পেলুম, আর রাস্তার বাঁ দিকে একটা টাঙ্গার সারি। দোকানপাট কিছু বন্ধ হয়েছে, কিছু হয় নি। বললুম: বেশি এগিয়ে কাজ নেই, ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

রামখেলাওনকে খুঁজে ফিরতে হবে তো, দেরি হলেও দোষ হবে না।

তবু আমরা বেশি দূর গেলুম না।

স্বাতি বলছিল: মা জানতেন না যে কাল সকালবেলায় আমি তোমায় নিতে এসেছিলাম জয়পুর স্টেশনে।

মামাবাবু তো নিজের চোখেই সব দেখেছিলেন।

বাবাকে ভয় কি! বাবাই তো তোমায় ডেকে আনলেন। কিন্তু মার একটুও মত ছিল না।

কেন বল তো?

গম্ভীর হয়ে স্বাতি বলল: মা আমাকে খুব ভাল মেয়ে বলে জানেন। তোমার মতো খারাপ ছেলের সঙ্গে মেলামেশা তিনি মোটেই ভাল চোখে দেখেন না।

তাই নাকি!

স্বাতি খানিকটা সহজ হয়ে বলল: তোমার বৈরাগ্য দেখে আমরা আশ্চর্য হয়েছি। দিল্লীতে অমন পাকা অভিনয় করে গেলে, তারপর আর কোন সাড়াশব্দ নেই! আমরা ভাবলাম—

কথাটা স্বাতি শেষ করল না। খানিকটা থেমে বলল: আচ্ছা গোপালদা, তোমার মনকে কি কিছুই স্পর্শ করে না?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম: তোমরা কী ভাবলে তা বলবে না?

পরে বলব।

এখনি বল না।

আজ সে কথা ভাল লাগবে না। যেদিন ভাল লাগবে সেদিন আমি নিজেই বলব।

জানি না, কেন আমার আজই সে কথা জানবার বাসনা হল। বললুম: মামীমা নিশ্চয়ই বলেছিলেন যে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছি।

স্বাতি উত্তেজিত ভাবে বলল: আমরা ঠিকই বুঝেছি। তুমি যা ভেবেছ তা মিথ্যে, ও তোমার ভয়।

বাঁচলুম তবে।

কেন বল তো?

ব্যানার্জি পরিবারের কবল থেকে তা হলে নিষ্কৃতি পেয়েছি।

মিত্রাদিকে তুমি ভয় পাও!

তোমাকে পাই নে!

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না, বলল: চল, এবারে ফিরতে হবে।

ফেরার পথে আমি বললুম: চাওলার খবর কী?

স্বাতি বুঝি ক্ষেপে উঠল, বলল: আমার সম্বন্ধে তোমার কোন কৌতূহল নেই?

তুমি তো আমার পাশেই আছ।

তারপর?

তারপরেও থাকবে।

স্বাতি চমকে আমার দিকে চাইল। তার দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখলুম ঘনিয়ে উঠেছে। হেসে বললুম: আমার কোন দুর্ভাবনা নেই।

কেন নেই গোপালদা?

স্বাতি প্রশ্ন করল ছেলেমানুষের মতো।

তাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করলুম: ঝানু আই. সি. এস. বলে মিস্টার ব্যানার্জির প্রতিষ্ঠা আছে। গোপালের ওপর তাঁর লোভ নয়, স্বাতির ওপরেও নয়। তাঁর লোভ অর্ধেক রাজত্বের ওপর। গোপাল তাকে হতাশ করেছে। কাজেই রাজকন্যা তার আর জুটবে না।

ভয়ে ভয়ে স্বাতি বলল: কিন্তু রাণাবাবু যে আবু পাহাড়ে আসছে।

চালাক হলে আসবে না।

স্বাতি আমার কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারল না, বলল: আর একটু খুলে বল গোপালদা।

বিয়েটা তো রাণা করবে না, মিস্টার ব্যানার্জি তার বিয়ে দেবেন। ওই ভদ্রলোকটির কিছুমাত্র সম্মতি থাকলে গোপালের বদলে রাণা তোমাদের সঙ্গী হত।

কিন্তু—

স্বাতি আরও কিছু জানতে চাইছিল। বললুম: স্বাধীন ভারতে

আজ যোগ্যতার অভাব হয়েছে খুব, কিন্তু অর্থের অভাব নেই। সেই অর্থ বণ্টনের বৈষম্য দেখেই দেশের হ্যাংলাগুলো চেঁচামেচি করছে।

কিন্তু তার সঙ্গে—

তার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বৈ কি। মিস্টার ব্যানার্জি সেই অর্থের কিছু খবর রাখেন। অন্ততঃ এটুকু জানেন যে স্বাতির বাবার সিন্দুকে যা আছে, তাতে গোপালের ভাগ্য ফিরতে পারে, কিন্তু রাণার জন্যে তা লোভনীয় নয়।

রাণাবাবু এ কথা বোঝে না!

বললুম তো, রাণা বোকা।

স্বাতি আর কথা কইল না।

এক সময় আমি বললুম: মিত্রা কী বলে?

স্বাতির জবাবে আর উত্তাপ নেই। বলল: সে তো কোন দিনই কিছু বলে না।

চাওলা?

মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে।

তার বিয়ের খবর কিছু শুনলে?

দিল্লী ফিরে হয়তো শুনতে পাব। বলছে, মিত্রাদি শিগগিরই রাজী হবে।

স্বাতি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল: মিস্টার চাওলা বলছিল যে রাণাবাবুও নাকি তারই মতো ভাবছে।

তাতে হাসবার কী হল?

হাসবার কথা নয়! রাণাবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে তো ঠিকই হয়ে আছে। এতে আবার ভাবাভাবি কী!

গম্ভীর হয়ে আমি বললুম: সত্যিই তো!

খেয়ে দেয়ে রামখেলাওন আমাদের অপেক্ষাতেই ছিল। বুঝতে

পারলুম যে বেশ দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলুম।

মামা বাহিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এত বেশি যে বকবার কথা ভুলেই গেলেন। শুধু ধমকে দিলেন রামখেলাওনকে।

মামা ও আমার জায়গা হয়েছিল এ ধারের ঘরটায়। আমি এ ধারেই এলুম। কিন্তু পাশের ঘর থেকে মামীর কথা আমার কানে এল। স্বাতিকে বোধ হয় বকছিলেন। কিন্তু স্বাতি কোন উত্তর দিল না।

১০

সকাল বেলায় মামী কিছুই খেলেন না। মামা খেলেন শুধু দু পেয়ালা চা। বললেন : চা জলের সামিল। চা খেয়ে ধর্ম কাজে গুরুর অনুমতি আছে।

মামী বললেন : মনে যদি খট্‌কা না থাকবে তো এই অনুমতির কথাটা কেন মনে আসে!

মামা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর বললেন ; তোমার জন্যেই বলি। গুরুবাক্যে তোমার বিশ্বাসের অভাব দেখেই এই কথা মনে আসে।

শরীর খারাপের অজুহাতে আমি আজ কিছু খেলুম না। স্বাতি যে বিশ্বাস করে নি আমাকে, তা বুঝতে পাচ্ছিলুম তার চোখ দেখে। কিন্তু কিছু বলবার অবকাশ পেল না। গাড়ির ব্যবস্থা করতে আমি বেরিয়ে গেলুম। সকাল সকাল আমাদের পুষ্কর তীর্থ সারতে হবে। গোটা আজমীর শহরটাও দেখতে হবে এক দিনেই। রাতের গাড়িতে আমরা চিতোর যাব। তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি ঠিক করে এলুম। বাসের বদলে গাড়ি ঠিক করেছি দেখে মামা খুশী হলেন।

আজমীর স্টেশন থেকে পুষ্করের দূরত্ব মাত্র সাত মাইল। পাকা বাঁধানো রাস্তা শহরের ভিতর দিয়ে নাগপাহাড় ডিঙিয়ে পুষ্কর পৌঁছেছে। শুধু মোটর নয়, টাঙ্গাও চলে। তবে সময় আধ ঘণ্টার বদলে লাগে ঘণ্টা দেড়েক। পায়ে চলার আর একটি পথ লক্ষ্য করবার মতো। পাহাড় বেয়ে সরাসরি উপরে উঠে এসেছে। বড় রাস্তাকে অতিক্রম করেছে কয়েকবার। যেখানে খাড়া বেশি, সেখানে বাঁধানো সিঁড়ি। বহু যাত্রী পদব্রজে চলেছে। সকালের

স্নিগ্ধ রোদে তাদের ক্লান্তি দেখলুম না, দেখলুম পথ চলার আনন্দ।

শহর পেরতেই মামা বললেন: গোপাল কী ভাবছ?

আমি ঠিক এই কথাই ভাবছিলুম। মামা এখনও আমাকে পুরাণ আর ইতিহাসের গল্প কেন শোনাতে বলছেন না, তাই ভেবে আশ্চর্যও হচ্ছিলুম। আমার লজ্জা করে, বিব্রত বোধ করি। আমি জানি যে আমার এই লজ্জা দেখে স্বাতি আনন্দ পায়। এ যুগটা বড় হালকা। হালকা চিন্তার, হালকা কথার, হালকা আচরণের। ভারি কথা লোকে শুনতে চায় না। ভারি কথার মানুষকে লোকে ভুল বোঝে, অহংকারী ভেবে বর্জন করে সঙ্গ। নাক সিঁটকে বলে, বিদ্যার বড়াই দেখ। নিঃসন্দেহে আমি আজকাল এই সত্য অনুভব করি। চেষ্টা করি চুপ করে থাকবার। কিন্তু মামা থাকতে দেন না। লক্ষ্য করে দেখেছি যে এক রকমের অদ্ভুত স্নেহ আছে আমার জন্যে। খানিকটা শ্রদ্ধাও আছে। নতুন কিছু বলতে পারলে গর্বও বোধ করেন। তাই তাঁকে বিমুখ করতে পারি নে। লজ্জাটা কাটিয়ে উঠে যা জানি সবই বলি। কিন্তু মামার প্রশ্ন শুনে স্বাতি সকৌতুকে বলল: শুরু কর গোপালদা।

পিছন ফিরে আমি মামীকে উত্তর দিলুম। বললুম: জানেন মামীমা, পুষ্কর যে পীঠস্থান খুব কম লোকেই এ কথা জানে। সতীর মণিবন্ধ পড়েছিল পুষ্করের গায়ত্রী পাহাড়ে।

মামী তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ালেন অনেকক্ষণ। তারপর মামাকে বললেন: সেবারের কথা তোমার মনে পড়ে কি? গায়ত্রী পাহাড় তো দেখি নি, উঠেছিলুম সাবিত্রী পাহাড়ে।

মামাও আশ্চর্য হয়েছিলেন। বললেন: কই, এ কথা তো কেউ আমাদের বলে নি।

বললুম: দেবী ভাগবতে এই গায়ত্রী পাহাড়ের উল্লেখ আছে।

পুষ্করের দক্ষিণে এই পাহাড়, তার ওপর দেবী পুরুহোতার মন্দির। শাস্ত্রীয় নাম দেবী গায়ত্রী, ভৈরব সর্বানন্দ।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: তুমি নতুন খবর দিলে। পুষ্করে পৌঁছে আমি পাণ্ডাদের কাছে খোঁজ নেব।

সত্যিই মামা খোঁজ নিয়েছিলেন তাঁর পুরনো পাণ্ডার কাছে। তারা বললে যে ভাঙা মন্দির একটা আছে কিন্তু পূজারী নেই। পাথরের উপর এক সময় হরগৌরীর মূর্তি ক্ষোদিত ছিল। এখন তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। লোকে চামুণ্ডার মন্দির বলে, কেউ বলে পুরুতা দেবীর। পুরুতা নিশ্চয়ই পুরুহোতা, দেবীর হাজার আট নামের এক নাম। মামী আহত হলেন পীঠস্থানের অমর্যাদা দেখে। বললেন: এত বড় তীর্থে আজ পীঠস্থানের এই অবস্থা!

মামী মিসেস গোস্বামী না হয়ে রাণী অহল্যাবাঈ হলে পুরুতা দেবীর ভাগ্য আজ ফিরে যেত।

গাড়িতে আর কোন কথা কইব না ভেবেছিলুম। কিন্তু মামী বললেন: পুষ্কর এত বড় তীর্থ কেন হল?

আদি তীর্থ যে!

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন: আদি তীর্থ মানে?

আমি পদ্মপুরাণের গল্প তাঁকে শোনালুম। বললুম: সৃষ্টিমানসে ব্রহ্মা পৃথিবীতে যজ্ঞ করবেন। গভীর মনোযোগে ভাবছিলেন ভাল একটা জায়গার কথা। তাঁর হাতে একটি পদ্ম ছিল, সেই পদ্মটি হঠাৎ মাটিতে পড়ল। ব্রহ্মা নেমে দেখলেন যে তাঁর পদ্ম তিন জায়গায় মাটি স্পর্শ করেছে, আর সেখান থেকে জল উঠে জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা এ স্থানের পুষ্কর নাম দিলেন। জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ পুষ্কর। এদের ব্যবধান মাত্র তিন ক্রোশ এবং সরস্বতী নদীর পাঁচটি শাখা এই সব পুষ্করের পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

স্বাতি বলল: পুষ্কর মানে কী গোপাল দা?

বললুম : তার অনেক মানে। পদ্মকেও পুষ্কর বলে, জলও পুষ্কর। আবার পুষ্করের অন্য নাম রূপতীর্থ। ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন জ্যেষ্ঠ পুষ্করের তীরে। সেখানে তাঁর একটি মন্দির আছে। এক সময় নাকি ভারতের নানা স্থানে একশো আটটি মন্দির ছিল সৃষ্টিকর্তার। এখন শুধু একটি মন্দির আছে পুষ্করে। অন্যান্য মন্দির কোথায় ছিল, তা এখন জানাও যায় না।

স্বাতি বলল : ভারি আশ্চর্য তো! কেন এমন হল বলতে পার?

শিবপুরাণে এ নিয়ে একটি গল্প আছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প। বোধ হয় মিথ্যা ভাষণের জন্য ব্রহ্মার এই অবস্থা! গল্পটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

মামা বললেন : আমার যেন মনে পড়ছে, এখানকার পাণ্ডারা আমাদের অন্য কথা বলেছে। সাবিত্রীর অভিশাপে ব্রহ্মার পুজো নিষিদ্ধ হয়েছে। গায়ত্রী নামে এক গোপকন্যাকে বিবাহ করে ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন। এই অপরাধে ব্রহ্মাণী অভিশাপ দেন যে এই পুষ্কর ব্যতীত অন্য কোন স্থানে তাঁর পূজার্চনা হবে না। ব্রহ্মাণী নাকি সমবেত সমস্ত দেবতাকেই অভিসম্পাত করেন।

আমি মেনে নিয়ে বললুম : পুষ্কর মাহাত্ম্যে হয়তো তাই আছে।

মামা আমাকে থামতে দিলেন না, বললেন : তারপর?

বললুম : পদ্মপুরাণের আর এক জায়গায় পুষ্করের উল্লেখ আছে। এখানকার নাগপাহাড় বা যজ্ঞপর্বতের ওপর বিষ্ণু বামন রূপে বলিরাজার পরীক্ষা করেছিলেন। রামায়ণের তিন জায়গায় আমি পুষ্করের কথা পড়েছি। এক জায়গায় আছে যে বিশ্বামিত্র এখানে তপস্যা করেন। ঠিক তার পরেই আছে যে স্বর্গের অপ্সরা মেনকা এই হ্রদের জলে স্নান করেছিলেন।

হঠাৎ আমার সর্দা সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল। বললুম : দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দার নাম আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে? যিনি সর্দা আইন তৈরি করে বাল্য-বিবাহ রোধ করেছেন?

হঠাৎ এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছি, মামা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তবু বললেন: তিনি তো অমর হয়ে রইলেন।

বললুম: জানেন বোধ হয় যে তিনি এই আজমীরের মানুষ এবং আজমীরের ওপর তাঁর একখানি চমৎকার বই আছে।

এ কথা মামা জানতেন না, তাই কোন উত্তর দিলেন না। আমি বললুম: তাঁর বইয়ের এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে একদা এই নাগপাহাড়ে ছিল ঋষি কণ্বের আশ্রম। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে কালিদাসের বর্ণনার কোন তফাত খুঁজে পাওয়া যায় না।

একটু থেমে বললুম: সর্দা সাহেব অনেক প্রমাণ দেখিয়েছেন। সে সব আজ আমার মনে নেই। কিন্তু আমি এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। এ সমস্ত জায়গা চোখে না দেখেও বিশ্বাস করেছি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বললুম: বিশ্বামিত্র ও মেনকার উল্লেখ আছে রামায়ণে। শকুন্তলা তাঁদের পরিত্যক্ত কন্যা। ঋষি কণ্ব এই কন্যাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। কাজেই তাঁর আশ্রমও নিশ্চয় কাছেই ছিল।

এ সমস্তই বিশ্বাসের কথা। কেউ না মানলে জোর করে তাকে মানানো যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল যে স্বাতিও এ কথা সহজ ভাবে বিশ্বাস করেছে। বলল: বলছিলে, রামায়ণের আর এক জায়গায় এই পুষ্করের কথা পড়েছ।

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললুম: সেইটিই বড় কথা। পুষ্কর মাহাত্ম্যের কথা। বনবাসের সময় রামচন্দ্র এই পুষ্করে এসে পিতা দশরথকে পিণ্ডদান করেন। দশরথ নাকি সশরীরে সামনে এসে রামচন্দ্রের হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করেছিলেন।

আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই এই কথা আমার মনে হয়েছিল। বুকের ভিতর অদ্ভুত এক রকমের বেদনা বোধ করেছিলুম।

অনেকক্ষণ ছটফট করেছি বিছানায়। জেগে জেগে কেন আমি রামচন্দ্রকে দেখলুম! কেন দেখলুম রাজা দশরথকে! মৃতের আত্মাও কি শরীর গ্রহণ করেন পিণ্ড নিতে! এই ভেবেই অস্থিরতা এল যে এ সবে তো আমার বিশ্বাস ছিল না। আজ পুষ্করে যাবার নামে এ সব কথা কেন মনে আসছে!

হঠাৎ আমার মা বাবার কথা মনে এল। তাঁরাই কি আজ আমায় এই আদি তীর্থের মাহাত্ম্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন! আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললুম। তারপরেই আমার অস্থির মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। শরীর খারাপের অজুহাতে মুখে কিছুই দিলুম না। তার বদলে কাপড় গামছা সঙ্গে নিলুম। পুষ্করের জলেই আজ স্নান করব।

স্বাতি আমায় অন্যমনস্ক হতে দেখেছিল। বলল: এবারে মহাভারতের কথা বল।

ঠিক মনে পড়ছে না, মহাভারতের এক জায়গাতেই বোধ হয় পুষ্করের নাম দেখেছি। রাজা যুধিষ্ঠির বেরিয়েছেন তীর্থভ্রমণে। সিন্ধুদেশ থেকে ফেরার পথে তিনি পুষ্করে এসেছিলেন।

তারপর?

তারপর আর মনে নেই। বোধ হয় নেইও কিছু।

আমার আর একখানি বইয়ের কথা মনে পড়ল। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের লেখা আমার ভ্রমণ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তিনি অনেকগুলি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছিলেন, তারই সংগ্রহ। এতে উপাদান এত বেশি আছে যে তা মনে রাখি এমন স্মৃতিশক্তি আমার নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে বইখানি শেষ করে আমার মনে হয়েছিল যে জানবার শেষ কথা আমার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু বলতে গিয়ে আজ আমার ভুল ভেঙে গেল। দেখলুম যে মনে আছে সামান্যই। তাও বড় অস্পষ্ট। হাতের কাছে সে বই একখানা থাকলে হয়তো কাজে লাগাতে পারতুম।

মামা বললেন : গোপাল থামলে কেন ?

কী বলব ভাবছি।

উত্তর দিতে মামার দেরি হল না। বললেন : মহাভারতের পরের কথা বল।

তা হলে বৌদ্ধ ও জৈনদের কথা বলতে হয়। পুষ্কর বৌদ্ধদেরও বড় তীর্থ ছিল। সাঁচির শিলালিপিতে এ কথার প্রমাণ আছে। এ নাকি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘটনা। এরও দু শো বছর আগে যে এ স্থানে সমৃদ্ধ শহর ছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভারতের প্রাচীনতম কার্ষাপণ মুদ্রা পাওয়া গেছে পুষ্করের মাটির নিচে। একটা দুটো নয়, একটা বিশেষ সময়েরও নয়। পুষ্করের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল। মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে সেই ইতিহাস আমরা রচনা করেছি।

মামা বললেন : বৌদ্ধ ও জৈন কি একই সঙ্গে ছিলেন ?

বোধ হয়, না। জৈনরা এসেছিল বৌদ্ধদের অনেক পরে। বৌদ্ধ সংস্কৃতি কেন লোপ পেল জানা যায় না। বোধ হয় ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে যে ভাবে লোপ পেয়েছে, পুষ্করেও ঠিক তাই হয়েছিল। জৈনদের বিষয়েও কিছু জানা যায় না। একটি গল্প শুধু চলে আসছে।

স্বাতি উৎসাহ পেল গল্পের নামে। তাই দেখে বললুম : জৈন রাজা পদ্মসেন ও হিন্দু যোগীর গল্প। বৌদ্ধদের পরে রাজা পদ্মসেন পুষ্করে যে নতুন শহর তৈরি করেন, সেখানে এক লক্ষ বাড়ি ছিল। শহরে কোন দারিদ্র এলে প্রত্যেক গৃহস্বামী তাকে এক টাকা করে দান করত। সেই টাকা নিয়ে দরিদ্ররা ব্যবসা শুরু করত। একবার এক হিন্দু যোগী এসে এই শহরে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য কোন গৃহস্থের কাছে হিন্দু বলে ভিক্ষা পেত না। বেচারা বন থেকে কাঠ কেটে শহরে তা বিক্রি করে কোন রকমে দিনপাত করত। দীর্ঘ বারো বৎসর পরে গুরু এ কথা জানতে পারেন।

সেদিন কাঠ কাটতে গিয়ে তাঁর শিষ্য আহত হয়েছিল। এই ঘটনার ফল হল সাংঘাতিক। যোগীর অভিশাপে ঝড় ও বন্যায় অমন সমৃদ্ধ শহর সহসা ধ্বংস হয়ে গেল।

একটানা অনেকক্ষণ আমরা উপরে উঠেছি। এবারে আমরা নিচে নামছি। পুষ্কর বুঝি মালভূমির উপর। তার তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে এই পাহাড়গুলির নাম জেনে নিলুম। হ্রদের পূর্ব দিকে নাগপাহাড় আরাবল্লী পর্বত মালার অংশ। পুষ্করের জল আসে এই পাহাড় থেকে। একদা এখানে অগস্ত্য মুনির আশ্রম ছিল, গুহা ছিল ভর্তৃহরি ও বামদেবজীর পঞ্চকুণ্ডের কাছে জমদগ্নিকুণ্ড।

উত্তরের পাহাড়ের নাম পাপমোচনী। আরও দুটি পাহাড় আছে, নাম সাবিত্রী ও গায়ত্রী। সাবিত্রী পাহাড়ের নামে আমার আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। ত্রিচিনপল্লীতে রক টেম্পলের নিচে দাঁড়িয়ে মামা ভাবছিলেন উপরে উঠবার কথা। শ পাঁচেক সিঁড়ি ভেঙে দু শো তিয়াত্তর ফুট উপরে গণেশের মন্দির পৌঁছতে হবে। স্বাতি সেদিন সাবিত্রী পাহাড়ের উল্লেখ করেছিল। বলেছিল, তর তর করে উঠে গেলাম সাবিত্রী পাহাড়ে, আর এটুকু পারব না এখানে! মামা হেসে এ কথার উত্তর দিয়েছিলেন, তখন বয়সটাও কম ছিল মা, হালকা শরীরের সুবিধে কত।

আজ আবার পাহাড়ে চড়ার পরীক্ষা দিতে হবে।

মামা কিন্তু ইতিহাসের কথা ভুলতে পারছিলেন না। বললেন: জৈনদের পর কারা এল? সুফি সম্প্রদায়, না আর্য সমাজ? এখানে এঁরাও আছেন শুনেছি।

তাঁরা বোধ হয় আজমীরে আছেন। জৈনদের পরে পুষ্কর অনেক দিন অনাদৃত পড়ে ছিল। মারবাড়ের রাজা নরহরি রাও অলৌকিক ভাবে পুষ্করের সন্ধান পান। তিনি নবম শতাব্দীর রাজা। এই পার্বত্য দেশে মৃগয়ায় এসে অঞ্জলি ভরে পুষ্করের

জল পান করেন। তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে তাঁর হাতের শ্বেত কুষ্ঠের দাগগুলি মিলিয়ে গেছে। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। রাজা খোঁজ করে যখন জানলেন যে এই হচ্ছে আদি তীর্থ পুষ্কর, তখন অভিভূত হলেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পুষ্করের আমূল সংস্কার করে দিলেন।

কুষ্ঠ কি সত্যিই সারে গোপালদা ?

শুনেছি, পুষ্করের জলে যক্ষ্মাও সারে।

এ কথাও স্বাতির বিশ্বাস হল না, বলল : তুমি এ সব বিশ্বাস কর ?

গঙ্গা স্নানে সকলের সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়, আর পুষ্কর স্নানে কয়েক জনের কুষ্ঠ সারবে না ?

এ কোন যুক্তির কথা নয়।

যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব লক্ষ্মী সরস্বতীর মতো। দ্বন্দ্ব কেন থাকবে ! তবু তা আছে !

আমার মন্তব্য মামা বোধ হয় উপভোগ করলেন, বললেন : বলেছ ঠিক। লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বন্দ্ব থাকা তো উচিত নয়, অথচ কর্মক্ষেত্রে ব্যাপারটা দেখ। বড়বাজারের ঘরে ঘরে লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মী বাঙলা দেশ থেকে এই রাজস্থানে আসছে চালান হয়ে। আর বাঙালী সরস্বতীকে দেখ। বড়বাজারের গদিতে বসে খাতা লিখছে চশমা চোখে।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি পিছন ফিরে দেখলুম, মামী গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। কোন কথাই বললেন না। কাল রাতে স্বাতির কাছে মামীর মনের পরিচয় খানিকটা পেয়েছি। জেনেছি তাঁর ভাবনা দুর্ভাবনার কথা। আমার সামনে স্বাতি হালকা আচরণ করবে, এ বুঝি তাঁর অভিপ্রেত নয়। অথচ মেয়েটা বুঝেও বোঝে না, বড় হয়েও যেন ছেলেমানুষি তার যাচ্ছে না। মামী হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন। রাণা আসবে আবু

পাহাড়ে আর কয়েকটা দিন পরেই। তার সামনে এমন আচরণ খুবই গর্হিত হবে। স্বাতিকে সে কথা বুঝতে দেবার প্রয়োজন আছে। তাই বোধ হয় আরও খানিকটা কঠিন হলেন।

পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা লোকালয়ের ভিতর এসেছি। এক সময় মোটর এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল। এইখানে আমাদের নামতে হবে।

১১

গাড়ি থেকে নেমেই স্বাতি বলল : আর তোমার তত্ত্বকথা শুনব না গোপালদা। এবারে নিজের চোখে কিছু দেখব।

আমি জানি আমার আলোচনা তার ভাল লাগে নি। ভাল লাগতে পারে না। সে তার বয়সের ধর্ম। জীবনে যত দিন গতি থাকে, তত দিন পিছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছা হয় না। উটমুখো মন সামনে চলে বেসামাল হয়ে। তারপর ভাঁটা পড়ে। ভয় লাগে। থেমে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতীতটা দেখতে ইচ্ছা হয়। বিস্মৃত অতীত। ইতিহাস। পুরাণ। দর্শন। বাহিরের দৃষ্টি ভিতরে এসে সংহত হয়। তাই মামা মামীর যা ভাল লাগে, স্বাতির তা ভাল লাগে না। মামা যা আগ্রহ করে শুনতে চান, স্বাতি তাতে হাঁপিয়ে ওঠে। পাঠকের বেলাতেও তাই। একজনের যা ভাল লাগে, আর একজনের তা লাগে না। সকলের ভাল লাগবে, এমন লেখা আজ কজনে লিখতে পারেন! যিনি পারেন, তিনিই সত্যকার লেখক। তাঁর কীর্তি যুগোত্তীর্ণ হবে। তিনি অমর হবেন। স্বাতির কথায় আমি তাই বিচলিত হলুম না। তার কাছে অন্য কিছুর প্রত্যাশা করা আমার উচিত নয়। বললুম : কিছু কেন, সবই দেখ।

স্বাতি তার কাঁধ থেকে ঝোলানো ক্যামেরা দেখিয়ে বলল : তোমাকেও দেখাব।

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম : দেখিয়ো।

ততক্ষণে মামা মামীও নেমে পড়েছেন। পাণ্ডার দলও জড়ো হয়ে গেছে। হিন্দী ও ভাঙা বাঙলায় অনর্গল প্রশ্ন করে যাচ্ছে, বাড়ি কোথায়, কোন্ জেলায়, আগে কোনও আত্মীয় এসেছে কিনা, পাণ্ডার কী নাম, ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন। এদের সবার উত্তর দিতে

গেলে পাগল হতে হবে। মামা প্রথমেই এমন একটা তাড়া দিলেন যে গোটাকয়েক লোক ছিটকে পিছিয়ে গেল। স্বাতি হাসল তাদের কাণ্ড দেখে।

যারা বয়সে প্রবীণ তারা পেছলো না। তারা এই তাড়ার অর্থ বোঝে। কিছু না করলেই বরং বিপদ ছিল। যেমন বিপদ আমাকে নিয়ে। আমি নিঃশব্দে পথ চলছি। আমায় নিয়ে পাণ্ডারা কী করবে, ঠিক ভেবে পাচ্ছে না। মামা আর একবার তাড়া দিলেন। আরও কিছু ছোকরা খসে পড়ল। কিন্তু একজন বুড়োও বিচলিত হল না। মামী বললেন: অত বকাবকি কেন! গোপালের মতো চুপ করে চল না।

এক বৃদ্ধ বললেন: আমরা সবাই চলে যাব মা। আপনার নিজের পাণ্ডার নাম বলে দিন।

বিরক্ত ভাবে মামা বললেন: পাণ্ডার নাম আমার মনে নেই।

তবে আপনার নিজের নামটাই বলুন দয়া করে।

পাণ্ডা তীর্থগুরু। পাণ্ডা না হলে মামার ক্রিয়াকর্ম সম্পূর্ণ হবে না। ঝামেলাও অনেক। তাই নিজের নামটা বলে দিলেন।

ভিড়ের ভিতর থেকে এক নাবালক এগিয়ে এল। বলল: আপনার বাবার নাম কি অমুক?

আশ্চর্য হয়ে মামা তার মুখের দিকে তাকালেন।

ছেলেটি বলল: আর আপনার ঠাকুরদার নাম কি অমুক?

মামা এবারে আরও বিস্মিত হলেন: আমার ঠাকুরদার নাম যে আমি ভুলে গেছি।

কিন্তু আমরা ভুলি নি।

বলে ছেলেটি মামার কাছ ঘেঁষে এল। আর নিমেষের মধ্যে সমস্ত পাণ্ডা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার মনে পড়ল যে পুষ্করের পাণ্ডার সম্বন্ধে কোথায় যেন

আমি পড়েছিলুম যে তাদের ভদ্রতা ও সৌজন্য মর্মস্পর্শী। সেই সঙ্গেই লেখক আজমীরের দরগা সাহেবের ফকিরদের কথা লিখেছেন। বলেছেন যে তাদের অহংকার ও অভদ্র চীৎকার তাঁকে পীড়া দিয়েছে। খানিকক্ষণ ভাবতেই লেখকের নাম মনে পড়ল। তিনি একজন সাহেব, নাম কর্নেল ব্রাফ্‌টন। সেই নাবালককে মামা বললেন ঃ তুমি এত খবর কোথায় পেলে ?

ছেলেটি হাসল। বলল : আমার ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনেছি। আপনারা তিনজন এখানে এসেছিলেন। এই বাবু আপনার সঙ্গে ছিলেন না।

তারপর ?

ইনি তখন আমার বয়সী ছিলেন।

বলে স্বাতির দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

স্বাতি সন্তুষ্ট হল না এই কথা শুনে। কিন্তু ছেলেটা থামল না, বলল : তখন এমন শাড়ি পরতেন না।

আমার হেসে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু মামীর ভয়ে বিরত হলুম। শুধু কটাক্ষে একবার স্বাতিকে দেখেই হাঁটতে লাগলুম।

বাজারের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি। দু ধারে ছোটখাটো দোকান। পথ ধুলোয় ভরা। মামা বললেন : পথঘাট সব ভুলে গেছি।

ছেলেটা বলল : আমরা তো এখন ব্রহ্মা ঘাটের দিকে যাচ্ছি। সেখানে স্নান তর্পণ করে ব্রহ্মার দর্শন হবে।

মামা ভয় পেয়ে বললেন : তুমিই ক্রিয়াকর্ম করাবে নাকি !

তৎপর ভাবে ব্রাহ্মণ তনয় বলল : তার জন্যে ভাববেন না। আমার বাবা আসছেন।

এই সংবাদ পেয়ে মামা বোধ হয় আরও আশ্চর্য হলেন।

ছেলেটি বলল: আমার ঠাকুরদা তো বেঁচে নেই, বাবাই ক্রিয়াকর্ম করাবেন।

তিনি কী করে খবর পেলেন?

ছেলেটি হেসে বলল: অন্য ব্রাহ্মণেরা খবর দিয়ে দেবে।

আমি ভাবলুম, এই সব কারণেই কি ব্রাফ্টন সাহেব এদের ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন!

রাস্তা থেকে বাঁ দিকে চেয়ে দু একবার আমরা পুষ্করের জল দেখতে পেয়েছিলুম। সেই সব গলি পুষ্করে গিয়ে ঠেকেছে। একবার আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে গলির ভিতরেই ঢুকে পড়লুম। একটুখানি হেঁটেই পৌঁছলুম পুষ্করের ঘাটে। দিগন্ত বিস্তৃত না হলেও কী বিরাট নির্মল জলাশয়! চারি দিকে ঘাট ও অট্টালিকা। এক দিকে উঁচু পাহাড়ের উপর একটি সাদা মন্দির দেখে কল্পনা করে নিলুম যে সাবিত্রী মন্দির ওই হবে। ঘাটের পাশে একটুখানি বাঁধানো জায়গা আছে। উপরে ছাদ। কিন্তু মেঝেটা বড় নোংরা। আমি আলসের উপর উঠে বসলুম। কিন্তু স্বাতি বসল না।

একজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে আসছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই ছেলেটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হল। বলল: বাবা।

পরক্ষণেই পরিচয় করিয়ে দিল। পাণ্ডা ছেলেকে বকলেন, বললেন: এখানে নিয়ে এলি কেন! বাড়িতে আনলে একটু বিশ্রাম করতে পারতেন।

বাধা দিয়ে মামা বললেন: বিশ্রাম থাক্‌। হাতে আমাদের সময় খুব কম।

বলে মামা টাকা বার করে দিলেন পকেট থেকে। আর পাণ্ডা ছেলেকে হুকুম করলেন জিনিসপত্র যোগাড় করবার। ছেলেটি কী একটা প্রশ্ন করেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

ধাপের উপর খালি গায়ে ভিজে কাপড়ে বসে একজন যুবক

পিণ্ডদান করছিল। দু ধাপ উপরে বসে এক বৃদ্ধ মন্ত্র পড়াচ্ছিলেন তাঁর অশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ সত্যই পীড়াদায়ক। স্থানে স্থানে গ্রাম্য ভাষাই ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু পিণ্ডদানকারী যুবক পরম শ্রদ্ধাভরে সেই সব শুদ্ধ অশুদ্ধ গ্রাম্য কথা সজোরে উচ্চারণ করে যাচ্ছে। তীর্থক্ষেত্রের এই নিয়ম। এখানে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা নয়, পরীক্ষা ভক্তির। যে যুগে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হতেন তীর্থগুরু, সে যুগ অনেক দিন গত হয়েছে। আজ তাঁদের অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বংশধরেরা পাণ্ডাবৃত্তিকে জীবিকা বলে গ্রহণ করে শিক্ষিত যাত্রীর মনোবেদনার কারণ হচ্ছেন। পাণ্ডার দুরবস্থা আজ সকল তীর্থে প্রায় সমান ভাবে দেখা দিয়েছে। পেটের জন্য উঞ্ছবৃত্তি করছে, এমন পাণ্ডার অভাব আজ নেই। যোগ্যতা থাকলে হয়তো এই উঞ্ছবৃত্তির প্রয়োজন হত না।

আমি স্বাতিকে বললুম: তোমার দেখা শেষ হয়েছে?

স্বাতি সন্দেহ করল যে এই প্রশ্নের আড়ালে কোন রহস্য আছে। উত্তর দিল: কেন বল তো?

তোমার দেখা শেষ হয়ে থাকলে পাণ্ডা মহারাজকে কিছু দেখাতে বলি।

আমার জন্যে কেন আটকাচ্ছে!

তোমার নিজের চোখে সব দেখবার ইচ্ছা কিনা, তাই তোমার দেখা শেষ হবার পর বুঝতে পারবে, দেখা কিছু বাকি ছিল কি না।

এতক্ষণে স্বাতি কিছু বুঝতে পারল। বলল: হুঁ।

পাণ্ডা আমার কথা শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন: এ বড় বিরাট জায়গা বাবু, আপনারা যে ভাবে এসেছেন তাতে কিছুই দেখা হবে না।

আস্তে আস্তে স্বাতি বলল: এই শুরু হল!

আমি আরও আস্তে বললুম: থামিয়ে দেব?

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি পাণ্ডার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বুঝতে পারলুম তার মনের কথাটি। শোনবার ও জানবার ইচ্ছা তার কারও চেয়ে কম নয়। মুখের কথা শুধু ছলনা মাত্র।

পাণ্ডা বললেন: এই পুষ্কর মহারাজকেই দেখুন। এর পরিক্রমা পাঁচ ক্রোশ। পর্বতের মধ্য দিয়ে পথ। তার ভেতর পঞ্চমুনির আশ্রম—মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলহ ও পুলস্ত্য মুনির কুটীর। অনেক কুণ্ড—নাগ কুণ্ড গোমুখ কুণ্ড পছকুণ্ড পরশুরামের কুণ্ড বামদেব কুণ্ড ভৃগু কুণ্ড অগস্ত্য কুণ্ড কপিল কুণ্ড। বাহান্নটা ঘাট। তার মধ্যে গৌঘাটই সব চেয়ে বড়। ব্রহ্মা ঘাট ও বরাহ ঘাটও ছোট নয়। আমরা ব্রহ্মা ঘাটে আছি।

আমার মনে হল যে এই পুষ্করে ঘাটের সংখ্যা বুঝি দিনে দিনে বাড়ছে। এক শো বছর আগে সর্বাধিকারী মহাশয় বোধ হয় পনেরটি মাত্র ঘাট দেখেছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে তিনি সেই পনেরটি ঘাটের নাম লিখে রেখে গেছেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের বইয়ে যেন ছেচল্লিশটি ঘাটের কথা পড়েছি।

আঙুল দিয়ে একটা পাহাড় দেখিয়ে পাণ্ডা বললেন: ওই হল সাবিত্রী পাহাড় আর মন্দির। অনেকটা পথ বালি ভাঙতে হয়। তবে আপনাদের জন্যে ডুলি পাওয়া যাবে।

মামা তখুনি বললেন: ও আমাদের দেখা আছে।

পাণ্ডা বললেন: দেখেছেন ঠিকই। এখানকার চার শো মন্দিরের ভেতর চার-পাঁচটি মন্দিরই তো প্রধান। ব্রহ্মা বরাহ অটমটেশ্বর শিব, আর রঙ্গনাথের নতুন মন্দির।

অটমটেশ্বর বোধ হয় আত্মেশ্বর। তীর্থক্ষেত্রে আমরা কত নামেরই যে অপভ্রংশ শুনি তার শেষ নেই। এই সব স্থানীয় নামের ভুল ধরতে যে বিদ্যার দরকার আমাদের অনেকেরই তার অভাব আছে। হঠাৎ মামীর কথা শুনে তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়ল। তিনি দু চোখ বিস্ফারিত করে বললেন: চার শো দেবমন্দির!

পাণ্ডা হাসলেন। এক রকম অদ্ভুত আত্মপ্রসাদের হাসি।

ততক্ষণে পাণ্ডার ছেলেটি জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এসেছে। সেগুলো সাজাতে সাজাতে পাণ্ডা বললেন: আপনারা তা হলে স্নানটা সেরে নিন।

আমরা তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখছি। যে লোকটি পিণ্ডদান করছিল, সে তার পিণ্ডাদি জলে উৎসর্গ করেছে। এক ঝাঁক মাছ এসে ঘাটের কাছটা উত্তাল করে তুলেছে। জলের রঙ হয়েছে ঘন কালো। আর লেজের ঝাপটায় জল চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের বিস্ময় লক্ষ্য করে পাণ্ডার ছেলে বলল: কুমীরও আছে। গৌঘাটে গেলে এখন একটা কুমীর দেখতে পাবেন।

মামা মামী স্নান করতেন কি না জানি না। এই মাছ দেখে ও কুমীরের কথা শুনে মামা বললেন: স্নান করেই তো বেরিয়েছি। মাথায় একটু জল ছিটিয়ে নিই।

মামী আজ আর আপত্তি করলেন না।

মাথায় জল ছিটিয়ে মামা মামী যখন ঘাটের উপর পিণ্ডদানে বসলেন, আমার মনে পড়ল রামচন্দ্রের কথা। রাজা দশরথ সশরীরে সামনে দাঁড়িয়ে যেন ছু হাত পেতে পিণ্ড নিচ্ছেন। না জানি কত তৃপ্তি তিনি সেদিন পেয়েছিলেন। আত্মার অস্তিত্ব আমরা মানি, বিশ্বাস করি পুনর্জন্মে। এ সব অনুষ্ঠান আমাদের না মানলে চলবে কেন! মা বাবার কথা আমার মনে পড়ল। ভাবলুম, তাঁদের পায়ে নাই বা পৌঁছল কিছু। আমি তো তাঁদের স্মরণ করে প্রণাম করে ধন্য হব। দেবতার পায়ে আমরা কি পৌঁছতে পারি! মা বাবাও তো দেবতা!

ছেলেটির হাতে লুকিয়ে আমি টাকা দিলুম। বললুম লুকিয়ে কিছু আনবার জন্য। নিমেষে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বাতি কিছু সন্দেহ করে বলল: কী আনতে দিলে গোপালদা?

চুষিকাঠি।

স্বাতি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম: ঠিকই বলছি। ভোলাবার ব্যবস্থা!

কিন্তু কাকে ভোলাবার, তা আর বললুম না। কাপড়খানা ঘাটে রেখে গামছা নিয়ে জলে নেমে পড়লুম।

স্বাতি চেঁচিয়ে উঠল: কুমীরে ধরবে গোপালদা!

মামা মামী ফিরে দেখলেন।

জলে নেমে বড় ভাল লাগল। অনেক দিন এমন স্নিগ্ধ জলে স্নান করি নি। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে গা-মাথা মুছে মাথার উপর ভিজে গামছা রেখে সন্ধ্যে আহ্নিকটা সংক্ষেপে সেরে নিলুম। অবগাহন স্নান করবার সময়ে বাবার একটা উপদেশ আমার মনে পড়ে। মাথা মুছে গামছাখানা মাথার উপর রেখে তিনি আমায় জপতপ করতে বলতেন। ভিজে মাথায় ভিজে কাপড়ে নাকি শ্রাদ্ধ তর্পণের বিধি। মামা মামীর কাজ কখন সম্পূর্ণ হয়েছিল তা দেখতে পাই নি। ব্রহ্মার মন্দিরের দিকে পা বাড়াবার আগে মামা বললেন: মন্দিরে আসছ তো!

বললুম: এখুনি আসব।

পাণ্ডার সঙ্গে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। স্বাতিও গেল। পাণ্ডার ছেলেটি তার জিনিসপত্র নিয়ে কাছে এল। বলল: আর একটা ডুব দিয়ে এইখানে বসুন।

মহা আড়ম্বরে ছেলেটি নিজে বসল দুধাপ উপরে। বলল: খুব সাবধান। দেখে দেখে পা ফেলবেন। তা না হলে—

তা না হলে কী?

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে বলল: পেছল খুব। দেখছেন না কত শ্যাওলা!

আমি তার বুড়োমি দেখে হাসলুম।

ঘাটে বসবার আগে উপরের দিকটা একবার দেখে নেবার চেষ্টা করলুম। আমার সন্দেহ ছিল, স্বাতি হয়তো একটু দাঁড়িয়ে যাবে। কিছু জিজ্ঞাসা করে গেলে এ সন্দেহ আসত না।

আর একদল যাত্রী আসছিলেন ঘাটে। কিন্তু আমি ঠিক দেখলুম, তাঁদের পিছনে ছিল স্বাতি। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই আমি তাকে চিনেছিলুম। চক্ষের নিমেষে সরে যেতেই আমার আর কোন সন্দেহ রইল না।

কাজকর্ম সেরে বড় তৃপ্তি পেলুম। অদ্ভুত এক আবেগে সমস্ত মন আমার ভরে গেল। ছেলেটির হাতে কিছু গুঁজে দিয়েই বললুম : চল এবারে ব্রহ্মার মন্দিরে।

খানিকটা এগিয়েই স্বাতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কোন ভূমিকা না করেই বলল : এ ভণ্ডামি কেন!

হেসে বললুম : মামা মামীর মন ভোলাবার জন্যে।

মা বাবা তো দেখতে পান নি।

জানতে পারলে হাতে হাতে ফল পাব।

তার মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলুম যে এ কথা স্বাতির বিশ্বাস হল না। বলল : তোমার কূল পাওয়া ভার!

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

১২

ব্রহ্মার মন্দিরে যাবার পথে বাঁ হাতে একটি পায়ে চলার পথ বেরিয়ে গেছে। পাণ্ডার ছেলে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল : সাবিত্রী পাহাড়ের পথ।

সে পথে খানিকটা এগিয়ে দেখলুম যে চোখের সামনেই সাবিত্রী পাহাড়। তার চূড়ায় সাদা মন্দির। পথের ধুলো এখানে বালির মতো। আরও এগিয়ে নাকি শুধুই বালি। ডান হাতে একখানা পাকা বাড়ি। বাঁ-হাতে তৃণগুল্ম। বড় গাছও আছে। ইচ্ছে হল, সেই পথে আরও দূরে এগিয়ে যাই। কিন্তু স্বাতি সঙ্গে আছে। মামা মামী ভাবতে বসবেন। মামী হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। কী দরকার! বললুম : চল।

স্বাতি আপত্তি জানিয়ে বলল : এখান থেকেই ফিরে যাবে?

উপায় কী!

ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি? সকালে তো আজ কিছুই খাও নি!

কেন জানি না, এই প্রশ্নটা আমার ভাল লাগল। এ কথা কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। কোন দিন যে কেউ করতেন, সে কথা যেন দিনে দিনে ভুলে যাচ্ছি। সত্যি কথা স্বীকার করতে এই মুহূর্তে আমার লজ্জা হল না। বললুম : তা একটু পেয়েছে বৈকি!

স্বাতি ব্যস্ত হয়ে বলল : তাই তো, কী খাবে এখানে?

ভারি গিন্নী হয়েছ দেখছি।

স্বাতি লজ্জা পেলেও তা স্বীকার করল না। পাণ্ডার ছেলেকে বলল : কাছে কোথাও খাবার পাওয়া যায়?

প্রচুর খাবার। সব রকমের খাবার। পুষ্করে কি খাবারের অভাব?

তারপরেই বলল : আমাদের বাড়ি যাবেন ?

বললুম : আগে ব্রহ্মার মন্দিরে যাব।

পথ চলতে চলতে স্বাতি বলল : বাবা মাকে তুমি বড্ড বেশি ভয় পাও। এ তোমার দুর্বলতার পরিচয়।

দুর্বলতা একটু আছে বলেই তা প্রকাশ পায়।

কিসের দুর্বলতা ?

তাও তোমাকে বলতে হবে !

স্বাতি উত্তর দিল না। তার ঠোঁটে যে হাসি দেখলুম, তা কৌতুকে ভরা। কাজেই আমাকে আরও কিছু বলতে হল। বললুম : রাণার সঙ্গে তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে আর এমন সঙ্কোচ করব না।

স্বাতি কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল আমার মুখের দিকে।

বললুম : চটলে কী করব !

স্বাতি এ কথারও উত্তর দিল না।

কথা বলছ না যে ?

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : চুপ।

আমি বুঝি চমকে উঠলুম। মামা মামীকে দেখতে পেলেও স্বাতি ভয় পায় না, আড়ষ্ট হয় না এমন ভাবে। তবে সে কী দেখতে পেল ! বললুম : কী হল ?

স্বাতি ফিস ফিস করে বলল : সেই লোকটা !

সেই লোকটা ! এবারে আমারও চোখ পড়ল তাঁর উপর। একবার দেখলে তাঁকে আর ভোলা যায় না। একবার পরিচয় হলে সে পরিচয় মনে থাকে সারা জীবন। কালীঘাটের হালদার মশাইকে আমাদের চির দিন মনে থাকবে। কলকাতার কালীঘাটে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় নি। তাঁকে চিনেছি দক্ষিণ-ভারতের পথে। তারপর রামেশ্বরের সেই কেলেঙ্কারির কথা। হঠাৎ সেই ঘটনা মনে পড়তে আমিও যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। ভয় পাবার আরও একটু কারণ ছিল। মামা বলেছিলেন, ও পারে

না এমন কাজ নেই। মন্ত্রের নামে নিন্দা ছড়ায়, আর পরচর্চা করে ধর্মসভায় বসে।

গোপালবাবু যে!

নিঃশব্দে পাশ দিয়ে যাবার সময় ভদ্রলোক হাসলেন তাঁর দুপাটি দাঁত বার করে। কুৎসিত বেয়াড়া মনে হল এই হাসিটি। উত্তর দেবার প্রবৃত্তি হল না। তবু বললুম: আপনি এখানে!

তেমনই দাঁত বার করে ভদ্রলোক বললেন: কেন, অপরাধ করেছি নাকি!

না না, অপরাধ কেন! এমন দূর দেশে আবার দেখা হয়ে গেল, তাই জিজ্ঞেস করছি।

আরও একটু আন্তরিকতা দেখাবার জন্য বললুম: কোথায় উঠেছেন?

হালদার স্বাতিকে দেখছিলেন। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন বার দুই। আমার মনে হল যে তিনি স্বাতির সিঁথিটা দেখলেন ভাল করে। তারপর বললেন: বাঙালী ধর্মশালায়। আপনারা?

রেলের ধর্মশালায়।

হালদার বললেন: বুঝেছি। নারদের মর্ত পরিক্রমা হচ্ছে।

স্বাতি আমায় ফিস ফিস করে বলল: চল।

হালদারের শ্রুতিশক্তির বলিহারি দিতে হয়। এগিয়ে এসে বললেন: চলুন। গোসাঁইজী বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

আমি বেশ আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। ভদ্রলোক বুঝিয়ে বললেন: আপনার মামাবাবু।

তাঁর ব্যস্ত হবার কী আছে!

কারণ নেই!

স্বাতির দিকে চেয়ে হালদার হাসলেন। একই রকমের বেয়াড়া হাসি! ভদ্রলোকের হাসিটাই এমন যে দেখলে গা জ্বলে যায়।

স্বাতির দিকে চেয়ে মনে হল যে এঁর সঙ্গটা তার অসহ্য মনে হচ্ছে। তাকে আরাম দেবার জন্য বললুম: তা আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন!

তখন আমরা ব্রহ্মার মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেছি। বড় গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে মন্দিরের দ্বার দেখতে পেলুম। রাস্তা থেকে অসংখ্য ধাপ উঠে গেছে। ছোট দ্বার। তার উপর নহবতখানার মতো তিনটে গম্বুজ পাশাপাশি। তার পিছনেও বড় বড় গাছ দেখা যাচ্ছে। যাত্রীরা ওঠা নামা করছে সিঁড়ি দিয়ে। হালদার বললেন: কেন ব্যস্ত হচ্ছি, তা পরে বুঝবেন। তীর্থস্থানে মিথ্যে কথাটা বলতে চাই নে।

তারপরেই বললেন: জানেন গোপালবাবু, এই মিথ্যা ভাষণের জন্যে সৃষ্টিকর্তারও পূজো রহিত হল পৃথিবীতে।

সেদিন এই গল্পটি আমি মনে করতে পারি নি। তাই উৎসাহ দেখিয়ে বললুম: কী রকম?

হালদার খুশী হয়ে বললেন: জানেন না বুঝি!

একটা একটা করে আমরা তখন সিঁড়ি ভাঙছি। হালদার বললেন: সে হল ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর রেষারেষি। শিবলিঙ্গের মাথায় আছে ফুল। সেই ফুল যে আনবে, সেই বড়। বলা মাত্রই দুজনে শিবলিঙ্গ বেয়ে উঠতে লাগলেন। হঠাৎ একটি ফুল উড়ে এসে ব্রহ্মার হাতে পড়ল। ব্রহ্মা তখনই বললেন, এই দেখ, শিবের মাথার ফুল আমি এনেছি। সৃষ্টিকর্তা বড় হবার চেষ্টায় মিথ্যা বললেন। যে দেবতা মিথ্যা বলেন, সে দেবতা পূজার যোগ্য নন।

স্বাতি আমাকে বলল: বিষ্ণুর সঙ্গে তো শিবেরই রেষারেষি শুনেছি।

বললুম: শিবপুরাণে শিব বড়, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু। রেষারেষি নেই। হালদার মশাই যে গল্প বললেন, তা শিবপুরাণের।

হালদার আশ্চর্য হয়ে বললেন: এসব পুরাণ টুরাণ আপনি পড়েছেন নাকি?

সংক্ষেপে বললুম : একটু আধটু।

হালদার খুশী হয়ে জবাব দিলেন : তা হলে বেশ ভালই হল। নারদের ইয়ার্কির গল্পটা সত্যি কিনা জেনে নিই।

কিন্তু বাকিটুকু বলবার আর অবকাশ পেলেন না। আমরা মন্দিরের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মামা মামীর সামনেই পৌঁছে গেলুম। হালদার হাত জোড় করে মামাকে নমস্কার করলেন। বললেন : ভাল আছেন তো!

মামীর মাথায় ঘোমটা ছিল। সেটা আরও খানিকটা টেনে দিলেন। মামার মুখেও প্রসন্নতা দেখলুম না। তবু বললেন : কালীকেষ্টবাবু যে।

হালদার তাঁর হাত জুড়েই বললেন : আপনাদের দুর্ভাবনা দেখে আমারও বড় ভাবনা হয়েছিল। এদের খুঁজে নিয়ে এলুম।

মামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন : তা এ সব কথা আপনাকে কে বলল?

ভয়ে ভয়ে স্বাতি মামীর পাশে এসে দাঁড়াল। হালদার হেসে বললেন : বিদেশে এটুকু খবরও যদি না রাখি—

তাঁর হাসিতে শুধু ঘৃণাই জাগে না, বুকের রক্তও বুঝি শুকিয়ে যায়। মামা কিছু বলার কথা খুঁজে পেলেন না। শুধু বললেন : হুঁ।

হালদার বললেন : দ্বারকা সোমনাথেও যাচ্ছেন তো?

সত্য কথা সহজ ভাবে মামা বলতে পারলেন না, মিথ্যাও বললেন না। উত্তর দিলেন : দেখি।

হালদার চুপ করবার পাত্র নন। বললেন : বাগবাজারের ঘোষেদের চেনেন তো? তাঁদের পেড়াপীড়িতেই এবারে বেরতে হল।

নিজের পয়সায় যে হালদার বেরবেন না, মামার সে বিষয়ে বুঝি সন্দেহ নেই। বললেন : শেষ পর্যন্ত যাবেন তো?

গদগদ ভাবে হালদার বললেন : না গিয়ে আর উপায় কী বলুন! নিজেরা অশক্ত, অথচ পূজো দেবার শখ সোমনাথের। আছেই তো কালীকেষ্ট হালদার, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো!

আমার মনে পড়ল যে এমনই কোন শিষ্যের পয়সায় তিনি দক্ষিণ ভারতটা ভ্রমণ করে গেছেন। আজকের দিনেও যে এমন শিষ্য আছেন, এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার। ভদ্রলোকের ক্ষমতাকে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু এ কথার উত্তর মামা দিলেন না। আমাকে বললেন : তাড়াতাড়ি ঠাকুর দেখে নাও। ফেরবার আগে একটু জল খেয়ে নিতে হবে।

ব্রাহ্মণেরা সযত্নে আমাদের ব্রহ্মার মূর্তি দেখালেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা স্থূলকায় ও রক্তবর্ণ। হংসবাহন। বামে গায়ত্রী দেবী। মন্দির প্রাঙ্গণে আরও অনেক দেবদেবী ও ঋষিমূর্তি দেখা গেল। দ্বারে ইন্দ্র ও কুবের, বাহন হস্তী, পঞ্চমুখ মহাদেব, নারদ, গৌরীশঙ্কর, লক্ষ্মীনারায়ণ ও সূর্যনারায়ণ। সনক সনন্দাদি ঋষি, দত্তাত্রেয়। সাবিত্রী ও সরস্বতী।

এক সময় স্বাতি বলল : ওই ভদ্রলোকের কাছে নারদের ইয়ার্কির গল্পটা শুনতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করতে পারব না।

কেন পারবে না?

বললুম : ভদ্রলোকের মুখে কোন আগল নেই। হয়তো এমন বেফাঁস কথা বলে ফেলবেন যে কানে আঙুল দিতে হবে।

তাতে তোমার কী দোষ?

আমার দোষ নয়! মামীমা নিশ্চয়ই ভাববেন যে আমি উস্কেছি তাঁকে।

স্বাতি কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হল। তাই দেখে হেসে বললুম : ঠিক আছে।

স্বাতি খুশী হল আমার উত্তর শুনে।

মামা মামী নিচে নেমে গিয়েছিলেন। হালদার ও পাণ্ডাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। আমি কাছে আসতেই মামা বললেন: শুনেছ গোপাল, এক শো বছর আগে নাকি এই সাবিত্রী পাহাড়ের ওপর এক বাঙালী বিধবা তপস্যা করেছিলেন। এক আধ বছর নয়, চল্লিশ বছর কঠোর তপস্যা।

সোৎসাহে পাণ্ডা বললেন: পাহাড়ের ওপর থেকে তিনি কখনও নামেন নি। সে সময় বাঘ ভালুকের ভয়ে সন্ধ্যেবেলা কেউ পাহাড়ে থাকতে সাহস পেত না। পূজারীরা সূর্যাস্তের আগেই আরতি করে নিচে নেমে আসতেন। কারও মানসিকের জন্যে রাত্রিবাস করতে হলে মন্দিরের ভেতর দরজা বন্ধ করে থাকতেন। অথচ সেই ব্রাহ্মণকন্যা—

ভক্তিতে পাণ্ডার কণ্ঠ গদগদ হয়ে উঠল। বললেন: একেবারে নির্ভীক ছিলেন।

আমার মনে পড়ল সর্বাধিকারী মশায়ের ডায়েরিতে আমি এই গল্প পড়েছি। তাঁরা এই মহিলার দর্শনও বোধ হয় পেয়েছিলেন। আর একজন উদাসীনের কথা তিনি লিখে গেছেন। এক শো বছর বয়স। এক গুহার মধ্যে তপস্যারত। কেউ কিছু দিয়ে গেলে খান, নয় উপবাস।

পথ চলতে চলতে হালদারকে আমি প্রশ্ন করলুম: আপনি কী যেন জানতে চেয়েছিলেন?

হঠাৎ সে কথা তাঁর মনে পড়ল না। বললেন: কী বলুন তো?

নারদের সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু।

হালদার উল্লসিত হয়ে উঠলেন, বললেন: মনে পড়েছে।

ফুলো গালের উপর তাঁর খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পুরু ঠোঁটে নোংরা দাঁত সব সময় ঢাকা পড়ে না। সেই দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে বললেন: বলিহারি দিই নারদকে। বাপের সঙ্গেও কম রসিকতা করেন নি।

মামা বাধা দিয়ে বললেন : নারদ তো ঝগড়া বাধাতেই ওস্তাদ বলে জানি।

হালদার এবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন : সেই গল্পই তো গোপালবাবুকে বলছিলুম। বাপ-মায়ে যে ঝগড়া বাধায়, সেই হল ছেলে।

ভদ্রলোক আশা করছিলেন আমরা সাগ্রহে গল্পটা শুনতে চাইব। একটুখানি অপেক্ষা করে বুঝলেন যে তাঁর সে আশা বৃথা হবে। তাই নিজে থেকেই বললেন : পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করছেন পুষ্করে। পূর্ণাহুতি দেবার সময় হয়েছে, অথচ ব্রহ্মাণী সাবিত্রী তখনও এসে পৌঁছন নি। মহা বিপদ। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে হবে সস্ত্রীক। শেষে নারদকে ডেকে বললেন, শিগগির তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল : নারদ কি ব্রহ্মার ছেলে ?

নারদ ছেলে বলেই তো পিতামহ ব্রহ্মার আজ এই দুরবস্থা।

আমার দিকে চেয়ে বললেন : ব্রহ্মার শাপের গল্প আপনাকে বলেছি। তার মতান্তর আছে। এখানকার লোকের বিশ্বাস যে সাবিত্রীর শাপে ব্রহ্মার পূজো নিষিদ্ধ হয়েছে।

হালদারের খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। বললেন : কী বলছিলুম যেন ?

পিতামহের যজ্ঞের গল্প।

ঠিক বলেছেন। পিতামহের যজ্ঞের গল্পই বলছিলুম। বাপের হুকুম পেয়েই তো নারদ মায়ের কাছে ছুটলেন, বললেন, শিগগির করে চল মা, বাবা যজ্ঞ শেষ করতে পাচ্ছেন না। ব্রহ্মাণী তখন হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলছিলেন। কপালের ঘাম মুছেই বললেন, ওমা তাই নাকি ! চল্ তবে। ময়লা কাপড়, আঁচলে হলুদের দাগ। চোখ কপালে তুলে নারদ বললেন, সেকি, তুমি এমনি বেশে যাবে ! দেবতাদের বউএরা সব সেজেগুজে, কী বলে

সেই সব ঠোঁটে গালে মাখবার রঙকে, সেই সব মেখে, মাথায় পরচুলা বেঁধে আর হাতে—

বললুম: বুঝেছি।

বুঝেছেন তো! ব্যাপারটা বুঝে ব্রহ্মাণীও বললেন, বুঝেছি। তুই তবে এগিয়ে যা, আমি এখুনি আসছি।

মুখে আঁচল দিয়ে স্বাতি হাসছিল। হালদার আরও উৎসাহ পেয়ে বললেন: নারদ ফিরে এসে বাপকে বললেন, সর্বনাশ। মা তো সাজতে বসেছে, বিলক্ষণ দেরি হবে। তবে উপায়? ব্রহ্মা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। নারদ তখুনি ব্যবস্থা দিলেন, বললেন, ওই দেখ, একটা মেয়ে আসছে। ওকেই বিয়ে করে যজ্ঞ শেষ কর। কিন্তু ও যে গোয়ালার মেয়ে। নারদ বললেন, তাতে কী হয়েছে! গরুকে দিয়ে খাইয়ে দাও, পেট থেকে বেরিয়ে এলেই শুদ্ধ। ব্রহ্মা বললেন, সাবাস বেটা! সেই গোয়ালার মেয়ে গরুর পেট থেকে বেরিয়ে হল গায়ত্রী। তাকেই বিয়ে করে ব্রহ্মা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিলেন।

পচ করে খানিকটা থুথু ফেলে হালদার বললেন: এদিকে সেজে-গুজে সাবিত্রী আসছেন পুষ্করে। তাঁকে আসতে দেখেই নারদ ছুটলেন মায়ের কাছে। বললেন, বাবার কাণ্ড দেখলে মা! এই বুড়ো বয়সে আর একটা বিয়ে করে যজ্ঞ শেষ করে ফেলেছে। অ্যাঁ? বলে ব্রহ্মাণী সেইখানেই বসে পড়লেন, ওই সাবিত্রী পাহাড়ের চূড়োতেই। আর পুষ্করে গায়ত্রী রইলেন ব্রহ্মার পাশে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: সাবিত্রী কি স্বামীকে শাপ দিলেন?

দিলেন বৈকি। বললেন, এই পুষ্কর ছাড়া আর কোথাও বুড়োর পুজো হবে না।

হালদারকে বিদায় দিয়ে আমরা একটু জল খেয়ে নিলুম। তারপর দেখলুম মাগ্‌নিরাম বাঙ্গরের তৈরি রঙ্গনাথের নতুন মন্দির।

উত্তর ভারতে দ্রাবিড় স্থাপত্যের নমুনা এই প্রথম দেখলুম। রাস্তার উপরে বিরাট গোপুর। মন্দিরের দেওয়ালে অসংখ্য পৌরাণিক চিত্র নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল। পাণ্ডা বললেন: সোয়া কোটি টাকায় এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে।

গাড়িতে উঠে মামা বললেন: আবার কিছু দণ্ড যাবে। ওই কালীকেষ্ট হালদার এবারে সহজে ছাড়বে না।

হালদারের একটি কথা আমার মনে পড়ল। বলেছিলেন: কেন ব্যস্ত হচ্ছি. তা পরে বুঝবেন। পরে কী বুঝব জানিনে।

১৩

গাড়িতে অনেকক্ষণ কেউ কথা কইতে পারলেন না। মামার শেষ কথাটিতেই মন সকলের আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। কী এমন অপরাধ করলুম যে ভয়ে আমাদের জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হবে! স্বাতির উপরেই রাগ হল। মামা মামীর সঙ্গে যেতে যেতে কেন ফিরে আসতে গেল। সে না ফিরলে তো দুজনে এক সঙ্গে ওই নিন্দুকটার সামনে পড়তুম না। রামেশ্বরে মামা মামী আরও বেশি ভয় পেয়েছিলেন। সে তো দিনের বেলায় নয়, সে রাতের ব্যাপার! তা নিয়ে আরও বেশি হৈচৈ হয়েছে। হালদার সবই দেখেছেন নিজের চোখে। তারপর! দেশে ফিরে কিছু করেছেন বলে তো শুনি নি। কিন্তু মামার কথায় যেন সন্দেহ হচ্ছে। বললেন, আবার কিছু দণ্ড যাবে। তবে কি আগের বারেও দণ্ড দিয়ে ওঁর মুখ বন্ধ করেছেন! কিছুই বিচিত্র নয়। পরের পয়সায় যে তীর্থ করতে পারে এত দূর দূর দেশে, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। স্বাতির ছেলেমানুষির জন্য আমার মনটাও ভারাক্রান্ত হল।

কিন্তু ছেলেমানুষিই বা কী! ব্রহ্মা থেকে ব্রহ্মার মন্দির এসেছি এক সঙ্গে। কতটুকু পথ! ঘাট থেকে একটা ঢিল ছুঁড়লে মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে পড়বে। তবে এ সব যুক্তির কথা। হালদার যখন গল্প বলবেন, এ সব প্রশ্ন করে রস ভঙ্গ কেউ করবে না। রসের প্রতি অনুরাগ মানুষের অকৃত্রিম। আদি কাল থেকে রস মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বিংশ শতাব্দীর ক্লান্ত মানুষ আজ আকণ্ঠ রস পান করে মাতাল হতে চায়। শুধু জীবন যাপনে নয়, উচ্চাশা ও আদর্শেও। বাস্তবনিষ্ঠার নামে অনেক ক্লেদ আজ সাহিত্যেও আমদানি হয়েছে। সেই ক্লেদাক্ত সাহিত্য চলেছে

সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে। কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারের আর দোষ কী! জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই তো হালদারদেরই প্রতিপত্তি।

খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। স্বাতির কথায় চমক ভাঙল। স্বাতি বলল: সাবিত্রী পাহাড়ে তা হলে ওঠা হল না।

ওঠা হবে না আমি জানতুম। মামা মামী একবার সেই ক্লান্তিকর পথ দেখে এসেছেন। দেখবার আগ্রহ তাঁদের মিটে গেছে। তাঁদের পরিশ্রমের মজুরি যদি পোষাত তো আবার উঠতেন। দেড় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। তার উপরে উঠলে যে চারি দিকের দৃশ্য মনোরম দেখাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে রূপ হাতের মুঠোয়, মানুষকে তা টানে না। যা টানে, তা অন্য জিনিস। সে সাবিত্রী নাম। এই নাম বাঙালী মেয়ের বুকে সোনার অক্ষরে লেখা আছে। হাসতে হাসতে তারা বালির পথ পেরোয়, পাহাড়ে ওঠে। তারপর যথাসময়ে তাদের ভুল ভাঙে। এ সাবিত্রী তো সত্যবানের স্ত্রী নয়, যিনি যমরাজের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর মৃত স্বামীকে। মানুষ সাবিত্রীই আমাদের বাঙলার মেয়েদের পরম দেবতা। সেই সাবিত্রীর নামেই তাদের অনির্বাণ আকুলতা। ব্রহ্মাণী সাবিত্রী থাকুন পদ্মপুরাণের পাতায়, যেমন ব্রহ্মা আছেন, আছেন আরও অনেক দেবদেবী। স্বাতির কথার উত্তর আমি দিলুম না।

মামা বললেন: গোপালেরই দেখা হল না।

গাড়িতে উঠেই তিনি পাইপ ধরিয়েছিলেন। এবারে খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে বললেন: শুনলুম মন্দির খুব পুরনো নয়। শ আড়াই বছর আগে মারবাড়ের রাজা অজিতসিংহের এক পুরোহিত এই মন্দির নির্মাণ করেন।

মামাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললুম: নিচে থেকেই আমি দেখতে পেয়েছি।

নিচে থেকে আবার কী দেখলে?

বললুম : পাহাড়ের চূড়োয় ছোট মন্দিরটি তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। আর সাবিত্রী দেবীর মূর্তি দেখলুম ছবির দোকানে। ফটোগ্রাফ বিক্রি হচ্ছে।

হুঁ।

বলে মামা আবার পাইপ টানতে লাগলেন।

স্বাতি বলল : এবারে আমরা কোথায় যাব গোপালদা?

বললুম : আজমীরে।

সে তো আমিও জানি।

ঘড়ির দিকে চেয়ে মামা বললেন : বেলা তো বেশি হয় নি। এ বেলায় কিছু দেখে নিলে মন্দ হয় না।

মামী বললেন : দুপুরে তা হলে ঘুমনো যাবে, কী বল!

মামী যে বিদ্রূপ করছেন, মামার তা বুঝতে একটুও কষ্ট হল না। বললেন : আমি একাই ঘুমব!

স্বাতি বুঝতে পারল যে প্রশ্নটা সোজাসুজি করতে হবে, তাই আর দেরি করল না। বলল : কী কী দেখাবে গোপালদা?

বলতে পারতুম যে সব কিছুই দেখাব। কিন্তু তাতে সমর্পণের মূল্য দেওয়া হত না। তাই সহজ ভাবে বললুম : পুষ্করের পরেই হল দরগা সাহেব, যার জন্যে আজমীরের নাম আজমীর শরিফ। পেছনে বিখ্যাত দুর্গ তারাগড়। আকবর বাদশাহর প্রাসাদ ও রাজপুতানা মিউজিয়ম, জাহাঙ্গীর বাদশাহর দৌলতবাগ ও আনা সাগর! আর দেখাব আড়াই দিন কা ঝোঁপরা।

স্বাতি ভাবল আমি আরও কিছু বলব। তাই মুখের দিকে চেয়ে রইল। বললুম : এ ছাড়াও জৈনমন্দির আছে, রাজার ছেলেদের জন্য আছে মেয়ো কলেজ, রেলের কারখানা।

বাঙালী ধর্মশালা ও বাঙালী মিষ্টির দোকানের কথাও বললুম।

এখানে দুর্গাপুজো হয় না গোপালদা?

বললুম : বাঙালী আছে অথচ দুর্গাপুজো নেই, এ হতে পারে না।

মামা আমার কথা মানতে চাইলেন না। বললেন : এ তোমার অদ্ভুত যুক্তি।

অদ্ভুত কেন! বাঙালীর কালীবাড়ি আর দুর্গাপুজো তো আজকাল ভারতের সর্বত্র।

স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : দুর্গাপুজোর প্রসাদ অনেক দিন পাই নি।

হেসে বললুম : তোমার কপালের জোর দেখব।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করছিল আমরা সোজা স্টেশনে ফিরব কি না। মামা বললেন : কিছু দেখে ফেরা যায় না?

নিশ্চয়ই যায়।

আমি জানতুম সে এই রকমের উত্তর দেবে। পাণ্ডা বিদায়ের পর্বটা সে চোখের সামনেই দেখেছে। সরাসরি স্টেশনে এনে তুললেই তার ক্ষতি। বলল : তবে আনা সাগর হয়ে ফিরি।

স্বাতি বলল : আনা সাগর নাম কেন হল, সেই গল্প এবারে বল।

তার কণ্ঠে আমি রহস্যের সুর শুনলুম। তাই উত্তর দিলুম না।

চুপ করে রইলে যে!

কিছু না জানা এ যুগে অপরাধ নয়। বরং এই অজ্ঞানতা স্থান বিশেষে প্রশংসার বিষয়। শাস্ত্র পুরাণের আলোচনায় নাক সিঁটকে এ যুগের মানুষকে প্রশংসা পেতে আমি দেখেছি। তাঁরা বিংশ শতাব্দীর সংস্কারমুক্ত মানী ব্যক্তি। স্বাতির এই কথায় আমার মনে হল যে অনেক কিছু এক সময় বলেছি বলেই আজ আমি উপহাসের পাত্র। বললুম : জানি না।

জানি না বলেই মনে হল যে এ মিথ্যা কথা হল। কিন্তু শ্রদ্ধেয় হেরম্ব মৈত্রের মতো বলতে পারলুম না যে জানি, কিন্তু বলব না।

স্বাতি বোধ হয় বিশ্বাস করেছিল আমার কথা। বলল : তুমি জান না এমন কথাও তা হলে আছে!

ইচ্ছে হল বলি নেই, কিন্তু তা পারলুম না।

মামা বললেন: মনে হয় আনা নামে কোন রাজা বাদশাহ ছিলেন।

বলে মামা আগ্রহ নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এবারে আমি মিথ্যা বলতে পারলুম না। বললুম: পৃথ্বীরাজের পিতামহের নাম ছিল অর্নরাজ। সবাই তাঁকে রাজা আনাজী বলত। তিনিই এই জলাশয় তৈরি করেন ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে।

এই তারিখটা জেনেছিলুম লাল সাহেবের কাছে। বেশ কাজে লেগে গেল। স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে কী বুঝল জানি না, আর কোন প্রশ্ন করল না। তার দৃষ্টিতে আমি কি দুঃখ দেখলুম, না কৌতুক! কৌতুক হলে আরও কিছু বলছে না কেন!

মামা কী ভাবলেন কতক্ষণ, তারপরে বললেন: তোমার কাছে এত খবর, তুমি লেখ না কেন?

আমি চমকে উঠলুম। এ কথা তো মামার মুখে কোন দিন শুনি নি! তবে কি—

ভাববার আর অবসর পেলুম না। ড্রাইভার এসে আনা সাগরের ধারে গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নেমে আর একখানা মোটর দেখতে পেলুম। পুরনো আমলের ফোর্ড সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। পরে তার মালিকের কাছে গাড়ির নাম শুনেছিলুম রথ। রথই বটে!

সামনে মার্বেল পাথরে তৈরি বিশ্রামের জায়গা। তার পরেই দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি। যে নাগপাহাড় থেকে আমরা নেমে এলুম, তারই কোলে এই হ্রদ। ডান দিকের পাহাড়ের উপর খানকয়েক বাড়িও দেখা গেল। পরে জেনেছিলুম, এগুলি চীফ কমিশনারের বাড়ি ও অফিস। মহাবীরের মন্দিরও আছে একটি। অন্য দিকে পুষ্করের রাস্তা।

স্বাতি এগিয়ে গিয়েছিল জলের কাছে। মামা মামীও এগোচ্ছিলেন। আমি লক্ষ্য করলুম এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোককে। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা মাঝবয়সী মানুষ। বাঙালী না হয়েই যান না। চেহারাতেও এমন কিছু আছে যে দেখলেই আলাপ করতে ইচ্ছা করে। আমার অভ্যাসের দোষও বটে। তাঁর পরিবার ছিল বিশ্রাম-ভবনের নিচে, তিনি ছিলেন বাহিরে। আমি হাত জুড়ে তাঁকে নমস্কার করলুম, বললুম: জায়গাটি ভারি সুন্দর, তাই না?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: সেইজন্যেই তো দূর থেকে আসি।

আপনি দূর থেকে আসেন! আমি ভেবেছিলুম বুঝি এখানেই থাকেন আপনারা।

ভদ্রলোক যে সদালাপী তার পরিচয় দিলেন, বললেন: আজমীরে না থেকেও আমরা আজমীরের লোক। এখান থেকে ষোল মাইল দূরে কিশনগড়ে আমাদের বাস। এখানে পূজো দেখতে এসেছি।

কোথায় পূজো হচ্ছে?

জানেন না বুঝি! পূজো এখানে বাঙালী ধর্মশালাতেই হয়।

তারপরে বললেন: কোথায় উঠেছেন।

স্টেশনে আছি।

কয়েক দিন থাকবেন না বুঝি?

সময় নেই। আজই আমাদের ফিরতে হবে।

সেকি!

লজ্জিত ভাবে আমি বললুম: সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত যাব কিনা, তাই কোথাও বেশি দিন থাকা হবে না।

ভদ্রলোক দুঃখিত ভাবে বললেন: আজমীরে তা হলে কী দেখবেন!

আপনিই বলুন।

ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন।

আমি বললুম : ভাল গাইড বই পাওয়া যায় ? কিংবা কোন ভ্রমণ কাহিনী ?

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : রাজস্থান নিয়ে তেমন বই কেউ লেখেন নি।

তারপরেই বললেন : যদি দক্ষিণ ভারতে যান, তা হলে একখানা কাজের বইএর সন্ধান দিতে পারি।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

বইএর নামটা ভদ্রলোক মনে করতে পারছিলেন না, বললেন : কি রে, কী নাম সেই বইটার ?

একটি সুশ্রী মেয়ে এগিয়ে এল, বলল : সেই বইটা বাবা ?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

মেয়েটি নাম বলল।

আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠল। আমি কিছুই বলতে পারলুম না।

জলের দিক থেকে বড় স্নিগ্ধ বাতাস আসছে। স্নিগ্ধ ছায়া। মনে হল, পাথরের মেঝেও এমনি শীতল হবে। আমরা দুজনেই বসে পড়লুম। ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই আগে বসে পড়েছেন। ভদ্রলোক বললেন : বাংলা দেশের অনেকের সঙ্গেই আমাদের আলাপ হয় এমনি করে। অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়। আপনাদের অহিনবাবু, বিমলবাবু, সতীনবাবু—এঁদের সবার সঙ্গেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

ভদ্রলোক এবারে নিজের নাম বললেন : ডাক্তার বসু।

আমি আর একবার নমস্কার করে নিজের নাম বললুম : গোপাল।

মামা মামী স্বাতির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলুম।

ডাক্তার বসু বললেন : আজ আপনাদের কিছুতেই ছেড়ে দেব না। বাঙালী ধর্মশালায় চলুন। সেখানে সবার সঙ্গে পরিচয় হবে।

মামা বললেন: গোপাল, ধর্মশালাটা কোথায় জেনে নাও। খেয়ে দেয়ে আমরা না হয় সেখানেই আসব।

কোথায় খাবেন?

স্টেশনে।

সেকি! মহাষ্টমীর দিন আপনারা হোটেলে খাবেন! তার চেয়ে ধর্মশালাতেই চলুন না। সেখানে মায়ের প্রসাদ পাবেন।

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। মামীও কাছে এসেছিলেন। তাঁকে বললুম: স্বাতির ভাগ্য আছে।

কেন?

একটু আগেই তো সে প্রসাদের জন্যে আপসোস করছিল।

মামীর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করলুম। মনে হল যেন এই কাজে খানিকটা সফল হয়েছি। মামী খুশীই হয়েছেন।

মামা বললেন: আমাদের খাবারের অর্ডার তো দেওয়া আছে। সামান্য কিছু প্রসাদ পেলেই আমাদের চলবে।

ডাক্তার বসু আর আপত্তি করলেন না। আমার হাত দুটো ধরে বললেন: যত তাড়াতাড়ি পারেন আসবেন। আমরা সবাই আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

গাড়িতে তুলে দেবার সময় বললেন: আজমীরে সব কিছু দেখাবার ভার আমি নিলুম।

শুধু তাঁর নয়, এই পরিবারের আন্তরিকতায় আমার চোখে জল এল। সহসা তাঁর জবাব দিতে পারলুম না।

১৪

গাড়িতে বসে মামা বললেনঃ দেখেছ গোপাল, বাঙলার বাইরে বাঙালী কত ভদ্র!

আমি জানি যে এ কোন সাধারণ নিয়ম হতে পারে না। বাঙলা দেশেও অনেক ভদ্রলোক আছেন, এবং বাঙলার বাহিরে সবাই ঠিক এক রকম নয়। সমস্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ডাক্তার বসু বাঙলায় থাকলেও হয়তো এমনই থাকতেন। তবু আমি মামার কথাটা মেনে নিলুম।

আমরা কোথায় যাব, ড্রাইভার আর সে কথা জিজ্ঞাসা করল না। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে আমরা শহর দেখব। তাই স্টেশনের দিকে না গিয়ে চলল দৌলতবাগের পাশ দিয়ে। একদা মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রিয় প্রমোদ-কানন ছিল এই স্থান। শ্রীনগরের শালিমারবাগের সঙ্গে পাল্লা দিত পরিকল্পনায়। আজ এই দৌলতবাগ দেখবার জন্য গাড়ি থেকে নামবার প্রয়োজন হল না। ধ্বংসের একটু অবশেষ, একটুখানি স্মৃতি পড়ে আছে। নতুন নামকরণ হয়েছে সুভাষবাগ।

আরও একটি জায়গায় আমরা নামলুম না, নামবার দরকার হল না। সে আকবর বাদশাহের প্রাসাদ। লাল সাহেব আমাকে বলেছিলেন যে জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই প্রাসাদেরই এক অলিন্দ থেকে ইংরেজ রাজদূত সার্ টমাস বো'কে দর্শন দিয়েছিলেন, আর বেগম নূরজাহানের মা এরই একটা ঘরে গোলাপের আতর আবিষ্কার করে পৃথিবীকে দিয়েছিলেন। দারা ও সুজার জন্মও হয়েছিল এইখানে। তারপর সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ-প্রাণশক্তি মিট মিট করে জ্বলত এই দুর্গের ভিতর। স্বাধীন ভারতে এই দৌলতখানা আজ

রাজপুতানা মিউজিয়ম। ভারতের স্বর্ণযুগের স্বাক্ষর ধারণ করে ধন্য হয়েছে। বাহির থেকে আমরা শুধু তোরণ দেখতে পেলুম। ভিতর আজ বন্ধ, মহাষ্টমীর ছুটি।

তারপর নয়া বাজারের জনবহুল পথ দিয়ে আমরা দরগা সাহেবের সামনে এসে পৌঁছলুম। একটি মানুষের কবর দিনে দিনে কত সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, এইখানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে আজ আট শো বছরের পুরনো ঘটনা। সুদূর আফগানিস্থানে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে এসেছিলেন সুলতান সাহাবুদ্দিন ঘোরীর সঙ্গে। স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে তিনি আজমীরে বাস করেছিলেন। নব্বুই বৎসর বয়সে তিনি এই আজমীরেই দেহরক্ষা করেন। তাঁরই সমাধির উপর এই দরগা। ভিতরে মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছেন আকবর বাদশাহ। শ্বেতপাথরের জুম্মা মসজিদ তৈরি করে দিয়েছেন শাহজাহান। আর বাহিরের এই বিরাট তোরণ তৈরি করেছেন হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর।

এই সমস্ত সংবাদ পেলুম দরগার গাইডের কাছে। গাড়ি থেকে নামতেই সে সঙ্গ নিল। কুর্নিশ করেই বক্তৃতা শুরু করল উর্দুতে। স্বাতি একবার আড় চোখে আমার দিকে চেয়েই হেসে মুখ ফেরাল।

তার কটাক্ষের অর্থ বুঝতে আমার দেরি হল না। কিন্তু কোনও উত্তর দিলুম না। চলতে চলতে মামা বললেন: সেবারে পুষ্করের এক পাণ্ডা বলছিল যে ব্রহ্মা নাকি তাঁর যজ্ঞের পর পুষ্করের চার সীমায় চারটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তার তিনটি শিবের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেটি পাওয়া যায় নি, তার নাম অর্ধচন্দ্রেশ্বর। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এই দরগা সেই শিবের ওপরেই তৈরি হয়েছে।

আমার মনে পড়ল, এই ধরনের কথা আমি নিজেও পড়েছি। এক জায়গায় নয়, কম করেও দু তিন জায়গায়। অল্প একটু ভাবতেই সর্বাধিকারী মশায়ের ডায়েরির কথা স্মরণ হল। তিনি

লিখেছেন, আজমীরে চন্দ্রনাথ নামে এক অনাদি শিব ছিলেন। তাঁর নিকট এক বৃক্ষ। সেই গাছে ভিস্তি ঝুলিয়ে রেখে একজন ভিস্তি যখন আহার করছিল, তখন টসটস করে জল পড়ছিল শিবের মাথার উপর। শিব সন্তুষ্ট হয়ে ভিস্তিকে বর দিলেন।

এই গল্পে ছুটি ভ্রম চোখে পড়ে। প্রথমটি হল, শিবের নাম চন্দ্রনাথ, অর্ধচন্দ্রেশ্বর নয়। আর দ্বিতীয়, চিস্তির বদলে এক ভিস্তির উল্লেখ। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের ভ্রমণবৃত্তান্তেও এই জনশ্রুতির উল্লেখ আছে। মহাদেবের বরে নাকি চিস্তি সাহেব সিদ্ধিলাভ করেন। সেই মহাত্মার নির্দেশে শিবের মন্দির আজও আছে। দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দাও এই মত সমর্থন করেছেন। আর একটি নিবন্ধ পড়েছিলুম ইংরেজীতে। লেখক তাতে লিখছেন যে দরবেশ চিস্তি যেখানে বাস করতেন সেখানে এক শিবলিঙ্গ ছিল। তিনি নাকি তাঁর নিজের ধর্ম মত সার্বজনীন করবার জন্য শিবের নাম দিয়েছিলেন অর্ধচন্দ্রেশ্বর। এখানে দরগা হবার পরও দীর্ঘ দিন শিবপূজা হত। এখনও নাকি গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণরা এই দরগা থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকেন।

নিজামী গেট পেরিয়ে বুলন্দ দরওয়াজা। আমি মামার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললুম : এই দরজার জৈন স্থাপত্য লক্ষ্য করবেন।

আমাদের গাইড ছুটো হাঁড়ি দেখাল পথের ছু ধারে। হাঁড়ি বললে ঠিক ধারণা করা যাবে না। জন কয়েক মানুষ অনায়াসে ভিতরে যাবে এমনই বড়। দরগায় উৎসবের সময় এই হাঁড়িতে ভাত রাঁধা হয়। তখন হাতা নাড়তেই অনেক লোকের দরকার।

আকবরী মসজিদ আর জামা মসজিদ দেখলুম, দেখলুম ষোল খাম্বার মসজিদও। রঙে ও সোনায় চিত্রিত গম্বুজের নিচে চিস্তি সাহেবের কবরও দেখলুম। বেশ শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। গাইড বলল : এই দরগা শুধু মুসলমানেরই নয়, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের। খ্রীষ্টানের শুধু প্রবেশ নিষেধ।

সেই সঙ্গে যোগ করল : পূজো দিন।

মানে টাকা ফেলুন।

মামী এই কবর দেখতে ভিতরে আসেন নি। বাহিরে খোলা চত্বরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবারে মামার মুখও দেখলুম কঠিন হয়েছে। আমি জানি তিনি সংস্কারমুক্ত নন। মুসলমানের দরগায় তিনি প্রণামী দিতে পারবেন না।

চল।

বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

গাইড বলল : হিন্দুরা সবাই এখানে পূজো দেয়। এই দেখুন না, এই জায়গাটা হিন্দুর দানে তৈরি। মাণ্ডুর সুলতান তো শুধু এইটুকুই তৈরি করেছিলেন।

অনেক রাজা মহারাজার নাম সে করে গেল। মামা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বাহিরে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে বললেন : আরে বাবা, পূজো দিতে আমরা আসি নি, এসেছি দেখতে। দেখেই চলে যাব।

এরই সঙ্গে আর একটি কবর আমরা দেখলুম, নিজামের কবর। ভিস্তি নিজাম একবার হুমায়ুন বাদশার জীবন রক্ষা করেছিলেন। শের শাহর সঙ্গে যুদ্ধে হুমায়ুনের সৈন্য তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। বাদশাহ নিজেও গঙ্গার জলে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। নিজাম তাঁকে রক্ষা করেন। হুমায়ুন সেদিন প্রতিজ্ঞা করেন যে এই নিজামের নাম নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মতো অমর করে দেবেন। পুরস্কারের লোভে নিজাম দিল্লী এসেছিলেন। হুমায়ুন তাঁকে বারো ঘণ্টার জন্য দিল্লীর তখ্‌তে বসিয়ে সেই ভিস্তির নাম ইতিহাসে লিখে গেছেন।

গাইডের উৎসাহ কিছু ঝিমিয়ে গিয়েছিল। তবু একটা জায়গায় নিয়ে এল। অপূর্ব দৃশ্য। সামনে পাহাড়, আর নিচে শ্যামল জল। পাহাড় আর দরগার মধ্যে এই জলই ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে।

স্বাতি প্রশ্ন করল : এই পাহাড়ের নাম কী গোপালদা ?

বললুম : পাহাড়ের নাম তো জানি নে। আরাবল্লী পাহাড়ের অংশ, এইটুকু শুধু জানি।

গাইড আমার কথা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল। বলল : বিটলি পাহাড়, বিঠলদাস ছিলেন শাহজাহান বাদশাহর সেনাপতি। তাঁর নামেই পাহাড়ের নাম। ওপরে যে গড় আছে, তাকেও অনেকে বিটলিগড় বলে।

আমি তারাগড়ের নাম শুনেছি। বললুম : তারাগড় কোন্‌টা ?

গাইড বলল : তারাগড়কেই লোকে বিটলিগড় বলে।

তারাগড়ের নামে আমার রাজা অজয়পালের কথা মনে পড়ল। সপ্তম শতাব্দীতে তিনি এই দুর্গ নির্মাণ করে নাম দিয়েছিলেন অজয় মেরু। এই নাম থেকেই তো আজকের আজমীর নাম। ভারতের প্রথম দুর্গ কী, তা আমাদের জানা নেই। তবে আকবর-উল-আখিয়ারে লেখা আছে যে এই তারাগড়ই এ দেশের প্রথম দুর্গ। মেবার রাণার চিতোরগড় ও শিবাজীর সিংহগড়ের মতোই হিন্দুশক্তির পরম নিদর্শন। শহর থেকে এক হাজার ফুট উঁচুতে আশি একর জমির উপর এই দুর্গে বারো শো লোক বাস করত। জলের অভাব কোন দিন হত না। হিন্দুযুগে দুই মাইল দীর্ঘ এর প্রাকার ছিল বিশ ফুট উঁচু ও বিশ ফুট চওড়া। সাহেবরা বলেছেন যে তারাগড় নাকি একটি অসাধারণ দুর্গ। দুর্গম ও দুর্ভেদ্য। বিলাতি শিল্প-নৈপুণ্যে নির্মিত হলে দ্বিতীয় জিব্রাল্টর হবার সুযোগ ছিল।

এ কথা যে মিথ্যা নয় তারাগড়ের উপর প্রথম অভিযানে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। বিখ্যাত লুণ্ঠনকারী গজনীর সুলতান মামুদ তারাগড় আক্রমণ করেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আহত হয়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। সুলতানের শক্তি সে দিন কম ছিল না। সোমনাথ ও থানেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে তিনি তাঁর পরাক্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন।

তারাগড়ের দুর্দিন শুরু হয়েছে এর পর থেকে। কত হাত বদল হয়েছে তার গুনতি নেই। আফগান মোগল রাঠোর মারাঠা, তারপর ইংরেজ। আজ প্রায় এক শো বছর হল তারাগড়ের দুর্গ নাম চির দিনের জন্য ঘুচে গেছে। প্রথমে ছিল ইংরেজ সৈন্যের স্বাস্থ্যনিবাস ও গ্রীষ্মাবাস পাদ্রীদের জন্য। গাইড বলল: ওই যে বিরাট দরগাটি দেখছেন, ওটি মিরাণ সাহেবের দরগা। বার শো সালে মিরাণ সাহেব ছিলেন এই দুর্গের গভর্নর। রাজপুতের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঐতিহাসিকেরা এ কথা মানেন না। সে ভালই। মিরাণ সাহেবের মতো একটা সাধারণ মানুষের কবর নিয়ে এত মাতামাতির যুক্তি তা হলে থাকে না।

ওই পাহাড়ে ওঠার পথ কোথায় বলতে পার ?

কেন পারব না !

আঙুল দিয়ে একটা দিক নির্দেশ করে গাইড বলল: ওই জায়গাটার নাম ইন্দ্রকোট। ওইখান থেকে পাহাড়ে ওঠার রাস্তা। দূরে আরও একটা রাস্তা আছে।

ফেরার পরে গাইড জিজ্ঞাসা করল: তারাগড়ে আপনারা ওঠেন নি ?

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন: না।

কাল সকাল বেলায় উঠবেন। তাতে কষ্ট কম হবে। উঠতে নামতে দু ঘণ্টার কমই লাগবে।

মামীর দিকে চেয়ে বলল: আপনারা সঙ্গে থাকলে কিছু সময় বেশি লাগবে।

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলুম যে এই স্থানটা তাঁর ভাল লাগে নি। এখান থেকে বেরতে পারলেই তিনি খুশী হবেন।

গাড়ির কাছে পৌঁছে গাইডকে মামা একটা টাকা দিলেন। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মামার তাড়া খেয়ে নিরস্ত হল।

মামা বললেন : পয়সার লোভ দেখ। ধর্মস্থানে পড়ে থেকেও রোজগারের নেশা গেল না!

আমার আর একটি ঘটনা মনে পড়ল। সেই ঘটনাটি আমি পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণবৃত্তান্তে পড়েছিলুম। আজমীর প্রসঙ্গে তিনি এই ঘটনাটিই শুধু লিখেছিলেন। এই দরগায় এসে স্বামীজী দেখলেন যে কবরের মধ্যে একজন ফকির লুকিয়ে থাকে, আর বাহিরে একজন বৃদ্ধ ফকির যাত্রীদের বলে যে এর ভিতর হাত দিয়ে খোদার কাছে যা চাইবে তাই পাবে। যাত্রীরা হাত ঢোকালেই ভিতরের ফকির হাত ধরে টানে। বাহিরের ফকির বলে খোদা হাত ধরেছে। স্ত্রীলোকদেরও একই অবস্থা। সবাইকে পরামর্শ দেয় যে আড়াই টাকা শীঘ্র বার কর। পাঁচ সিকে হাত ধরাই, আর পাঁচ সিকে হাত ছাড়াই। হাত টানাটানি, দর কষাকষি, শেষ পর্যন্ত দু টাকায় রফা।

এই অদ্ভুত গল্পের কথা আর কোথাও আমিও পড়ি নি।

ড্রাইভার বলল : এবারে আড়াই দিনকা ঝোঁপরা চলি ?

মামী বললেন : আর দেরি করলে পেটে পিত্তি পড়বে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে মামা সে কথা মেনে নিলেন। বললেন : এখন আর কোথাও নয়, সোজা স্টেশন।

স্বাতি বলল : তারপর ?

তারপর বিকেলে দেখা যাবে।

ডাক্তার বসুর কথা আমি মনে করিয়ে দিলুম। কিন্তু মামা কোন উত্তর দিলেন না। খাবার পরে তিনি বিশ্রাম করতে ভালবাসেন। হয়তো সেই কথা তাঁর মনে পড়ে গেল।

স্বাতি বলল : একটা প্রশ্ন আমার রয়ে গেল।

প্রশ্নটা আমাকেই করেছে। কিন্তু আমি কিছুই জানতে চাইলুম না। স্বাতি বলল : এই দরগা সাহেবের এত নাম কিসের ?

এবারে মামা কথা কইলেন। বললেন: আমি শুনেছিলুম, এ দরগা সুফী সম্প্রদায়ের।

সুফী সম্প্রদায়!

স্বাতি আগ্রহ জানাল আরও কিছু জানবার।

মামা বললেন: তাই না গোপাল!

বুঝতে পারলুম যে এবারে আমাকে সুফী সম্প্রদায় সম্বন্ধে ছোট-খাটো একটা বক্তৃতা দিতে হবে। না দিয়ে উপায় নেই। মামা যখন বলেছেন, তখন শুনে ছাড়বেন। আর শেষ পর্যন্ত স্বাতি শুনে একটু হাসবে। বলতে আমারও ভাল লাগে। বাবা বলতেন, অধ্যাপনা না করলে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। যা পড়বে তা একবার কাউকে বলবে। তোমার শ্রোতা যদি বুঝতে পারে, তা হলে তোমারও বোঝা ঠিক হয়েছে। সেই থেকে শ্রোতা না থাকলে ঘরের ভিতর পায়চারি করে আমি বলি। বই পড়ে সে বই মুড়ে রেখে মনে মনে সবটা ভাবি। তাতে শুধু পরীক্ষার পড়াই তৈরি হয় না, ভাল লেখার রসবোধও সম্পূর্ণ হয়। স্টেশনের পথে মামাকে আমি সুফীদের গল্প শোনালুম।

সুফী আরবী শব্দ। সুফ মানে পশম। দরবেশরা পশমের পোশাক পরেন বলেই কি তাঁরা সুফী! কারও মতে গ্রীক Sofos শব্দ থেকে সুফী হয়েছে। সুফীরা প্লেটোর মতাবলম্বী বলে তাঁদের ধারণা। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান। আলীর অনুগত অনুচররাই এই মত অনুসরণ করতে আরম্ভ করেন।

সুফী দর্শনের নাম তসাওয়াফ্। কোরাণের কয়েকটি দুর্বোধ্য শ্লোকের উপর এই দর্শনের ভিত্তি। সুফীরা মনে করেন যে খোদাই একমাত্র সৎপুরুষ। খোদার কাছ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি এবং খোদাতেই সব কিছু লীন হবে। এই মোক্ষমার্গের নাম হল তরিকৎ সুফীরা অদ্বৈতবাদী। সর্ব ভূতে তাঁরা খোদার অস্তিত্ব মেনে থাকেন

বলে বাহ্যিক ক্রিয়ার বাহুল্য তাঁদের নেই। ভগবৎ প্রেম যাদের ধর্মের মূল কথা, তাঁদের কাছে ধ্যানই হল শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান।

সুফীদের মধ্যে কেউ বা ফকির পরিব্রাজক সালিক, কেউ বা সংসারী মনাজিল। প্রকৃত সাধক হতে হলে দীর্ঘ দিন সাধনার প্রয়োজন। তার চারটি স্তর আছে। সরায়ৎ প্রথম স্তর, অনুষ্ঠান তখন বাহ্যিক। দ্বিতীয় স্তরে শুধু ধ্যান, তার নাম তরিকৎ। তৃতীয় স্তরের নাম হকিকৎ। দীর্ঘ দিন আরাধনার ফলে সাধক তখন ত্রিকালজ্ঞ হয়েছেন। এর পরে যে স্তর, তাতে কঠিন পরীক্ষা। মরিফৎ নাম থেকে সেই কৃচ্ছ্র সাধনার ধারণা হয় না। তার কারণ অরিফ মানে জ্ঞান। জ্ঞান বই পড়া নয়। এই জ্ঞান অভিজ্ঞতায় অর্জিত হয়। সাধক তখন লোকচক্ষুর আড়ালে তপস্যা করবেন। নির্জনে অনাহারে। তপস্যা সম্পূর্ণ হলে তিনি সিদ্ধবাক্ হবেন। অন্যায় ও অধর্ম দেখে অভিসম্পাত করলে সেও সত্য হয়ে উঠবে।

এই চার স্তর যাঁরা পার হয়ে গেছেন, তাঁদের আর আচার-নিয়মের বালাই নেই। যা ইচ্ছা বলতে পারেন, যা ইচ্ছা করতে পারেন। কর্ম যাঁর ভগবানে অর্পিত কোন বিধিনিষেধ মানার প্রয়োজন তাঁর নেই।

স্বাতি বলল: এ তো আমাদের যোগীদের মতো হল। সাধু সন্ন্যাসী।

হালকা ভাবে আমি উত্তর দিলুম: বাউল। আমি এঁদের বাউল ভাবি।

আমাদের গাড়ি তখন স্টেশনে ঢুকছে।

১৫

রেস্তোরাঁর খাবারটা সবারই ভাল লাগল। সাহেব আমলের পুরনো ব্যবস্থা এখনও কিছুটা বহাল আছে। পরিচ্ছন্নতা ও আদব-কায়দায় তো বটেই, দামেও কতকটা। চ'টনি দেবার কথা স্বাতি বেয়ারাদের মনে করিয়ে দেয় আগে-ভাগে। আমি হাসলে বলে: ওই চাটনিটুকু আছে বলেই ভাত মুখে রোচে।

তারপরে গম্ভীর হয়ে বলে: লেখাতেও এই চাটনির দরকার, নইলে বই কেউ পড়তে চায় না।

চাটনির অভাবে জীবনটাই পান্‌সে লাগে তো লেখা আর খাবার।

মামা আমাদের সতর্ক করে দেন। বলেন: সবটাই না চাটনি হয়ে যায়!

স্বাতি হেসে ওঠে খিলখিল করে। আর মামী গম্ভীর হয়ে যান।

বিপদ বাধল খেয়ে ওঠবার পর। বাঙালী ধর্মশালায় যাবার কথা স্বাতি মনে করিয়ে দিল। মামা বিশ্রাম করতে চান, মুখে না বললেও মামীরও সেই ইচ্ছে। অথচ স্বাতিকে একা যেতে দেওয়া যায় না। আমার সঙ্গ আরও বিপজ্জনক। অন্ততঃ মামীর যে এই ধারণা বদ্ধমূল তাতে আমার সন্দেহ নেই। বাহিরের সান্নিধ্য তো ভয়ের নয়, ভয় হল ভিতরের আকর্ষণের। নীতির ভয় নয়, ভয় প্রীতির। মেয়ের বিবাহ তিনি ঠিক করে ফেলেছেন, সেই ব্যবস্থা না ভেস্তে যায়। মামী বললেন: এখন বিশ্রাম কর, বিকেলে যাওয়া যাবে।

সমর্থন করে আমি বললুম: সেই ভাল।

সেই ভাল মানে! এখনও যে অনেক কিছু দেখতে বাকি তা মনে আছে!

আজ রাতেই যে আমরা ফিরে যাচ্ছি, তা আমার মনে আছে। তবু আমি স্বাতিকে বাধা দিলুম, বললুম: সব কিছু নাই বা দেখা হল!

মামা যেন মামীর ভাবনা বুঝতেই পারেন নি, এমনি ভাবে বললেন: আহা, তোমরা কেন দেখবে না! তোমরা যাও না।

মামী বিরক্ত হলেন অপরিসীম। বললেন: দু ঘণ্টা পরে গেলে যে কী ক্ষতি, আমি তা বুঝতে পারি নে।

স্বাতি মায়ের কাছে ঘেঁষে গেল। বলল: অন্ধকার হলেই বুঝতে পারবে, কেন ব্যস্ত হচ্ছি। তোমার কোনও ভাবনা নেই মা, তুমি বাধা দিয়ো না।

নরম সুরে জোর দিল কোনও-র উপর।

মামা বললেন: সেই ভাল। এখন তোমরা দুজনে যাও, আমরা বিকেলে যাব।

মামীর পছন্দ নিশ্চয়ই হল না। তবু আর বাধা দিলেন না। বললেন: যা ইচ্ছে কর।

স্বাতির কাছে এই অনুমতিই যথেষ্ট। বলল: চল গোপালদা, আমরা হেঁটেই বেরিয়ে পড়ি।

মামা আপত্তি জানালেন: এই কাঠফাটা রোদে হেঁটে যাবে কেন!

রোদ কোথায়!

বলেই স্বাতি বেরিয়ে পড়ল। আমি একবার মামা মামীর মুখের দিকে চেয়ে স্বাতিকে অনুসরণ করলুম। মামা শুধু হাসলেন। মামী কী করলেন দেখতে পেলুম না।

রোদে নেমেই স্বাতির মেজাজ বেগড়াল। বলল: মার এমন আপত্তি কেন বলতে পার?

পারি না।

তা পারবে কেন! পারলে যে আরও কিছু করতে হয়!

আমি ভালমানুষ সাজবার চেষ্টা করে বললুম: একটু বুঝিয়ে বলবে!

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না। অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলল খানিকটা। তারপর বলল: জগতে কেন এমন হয় বলতে পার?

কী হয়?

এই যেমন হয়েছে। এই যেমন—

এর বেশি স্বাতি আর বলতে পারল না। আমার মনে হল যে আমি তার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। সে আমার সঙ্গে রাণার তুলনা করছে। মামী রাণাকে সৎপাত্র বলে ভাবছেন, ভাবছেন আমার সঙ্গে রাণার তফাত আছে আকাশ-পাতাল। কিন্তু মূর্খ মেয়েটা তা বুঝতে পারছে না। যেদিন বুঝবে, সেদিন বুঝে আর কোন লাভ হবে না। বললুম: মামীর দুর্ভাবনা হয় বৈকি।

কেন হবে!

অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের অবাধে মেলা মেশা তিনি দেখেন নি। তাই তাঁর ভয় হয়।

কিন্তু স্বাতির অন্য প্রশ্ন। অসতর্ক মুহূর্তে সেই প্রশ্ন সে জানিয়ে ফেলল: তোমার কি কোন দাম নেই!

ভেবেছিলুম, এ কথার উত্তর দেব না। তাই হাসলুম। স্বাতি লজ্জা পেল, কিন্তু দমল না। বলল: হেসে তুমি প্রশ্ন এড়িয়ে যেয়ো না। আমি জবাব চাই।

জবাব যে তোমার ভাল লাগবে না।

তা না লাগুক।

এ বাজারে আমার দাম নেই।

কেন নেই?

আমাদের এই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের দাম তার অর্থ-

সামর্থ্যে। রোজগারের অঙ্ক দিয়ে আমরা যোগ্যতার মাপ করি।

স্বাতি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল : কিন্তু কেন এমন করি ?

তার কণ্ঠ অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে।

বললুম : না করে উপায় কি! পয়সা ছাড়া যে এক পাও চলা যায় না। তোমার বাবার পয়সা আছে বলেই আজ আমরা আজমীরের পথে বেড়াচ্ছি।

আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছি, পয়সা না থাকলে কেন আমরা মানুষকে ছোট ভাবব।

বড় ছোটর সংজ্ঞাই তো তাই। যার বেশি আছে, সেই বড় লোক।

পয়সা বেশি থাকলেই সে বড়লোক হবে! আর যার নেই, সে মুখ বুজে ছোট হয়ে থাকবে!

এ সব কথা বেশি বোলো না। যারা বলে, সরকার তাদের পছন্দ করে না।

সত্যি কথা কেউই পছন্দ করে না তা জানি।

এতক্ষণে বাঙালী ধর্মশালায় আমাদের পৌঁছনো উচিত ছিল। কিন্তু পৌঁছলুম না দেখে এক দোকানদারকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। স্টেশন থেকে আসছি জেনে উত্তর দিল, উল্টো পথে এসেছি।

স্বাতি ঠিক এমনিই আশা করছিল। বলল : চল ফেরা যাক।

চলতে চলতে আমি বললুম : মন খারাপ করে লাভ নেই স্বাতি, এ সত্য আমাদের মেনে নিতেই হবে।

দৃঢ় স্বরে স্বাতি বলল : আমি মানব না।

সেই সঙ্গে যোগ করল : তোমাকেও মানতে দেব না।

আমি তার সাহস দেখে চমকে উঠলুম।

স্বাতি বলল : তোমার ক্ষমতা যখন আছে, তখন অন্যায় তুমি

কেন সইবে! রবীন্দ্রনাথের কথা মনে নেই?—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—

আমি হেসে বললুম: সহে নয়, কহে বল। অন্যের অন্যায়—সইতে না পারলে নিজেকেই দগ্ধে মরতে হবে!

কিন্তু স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল: হাসি নয় গোপালদা, এ কান্না। সমস্ত দেশ আজ কাঁদছে। হেসে এ সব উড়িয়ে দেবার চেষ্টা তুমি কোরো না।

হঠাৎ এ কথার উত্তর আমি খুঁজে পেলুম না।

স্বাতি বলল: সেদিন দিল্লীতে মিস্টার চাওলা একটা গল্প বলল। এক দেশের ইস্পাত তৈরির গল্প। মস্ত বড় বড় কারখানা। কিন্তু বাইরে থেকে ইস্পাত আমদানি বন্ধ হচ্ছে না, বরং দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। দেশে ইস্পাতের চাহিদা বাড়ছে বলে প্রথম কিছু দিন চলল। তারপর ধরা পড়ল যে কারখানায় ইস্পাত তৈরি দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সরকার কমিশন বসালেন। তাঁরা সমস্ত খুঁটিনাটি দেখে কয়েক বছর পর রিপোর্ট দিলেন যে কল-কব্জা সব পুরনো হয়ে গেছে, এখন বদলানো দরকার। কাজেই সরকারী কারখানাগুলোর জন্যে বিদেশে বড় বড় অর্ডার গেল।

স্বাতির মুখে আমি কোন দিন গল্প শুনি নি। আজ দেখলুম, সেও বেশ গল্প বলতে পারে। আগ্রহ দেখিয়ে বললুম: তারপর?

স্বাতি বলল: এক বেসরকারী কারখানার মালিক এ কথা মানল না। বলল, এত শিগগির এমন দামী কল-কব্জা অকেজো হতে পারে না। আর তখুনি প্লেনে চড়ে আর একটা দেশে গিয়ে বললে, লোহা তৈরি জানে এমন একজন লোক চাই। আর নিয়েও এল একজনকে। সেই লোকটা সব দেখে শুনে যা বললে, শুনে সবার চক্ষুস্থির।

কী বললে?

বললে, এই কারখানায় দেশী বিদেশী নানান ডিগ্রীওয়ালা ছোট

বড় ইঞ্জিনিয়ার আছে অনেক, কিন্তু লোহা তৈরির কাজ কেউ জানে না।

বল কি!

ঠিকই বলছি। সেই বিদেশী লোকটা সারা দিন ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখত। ইঞ্জিনিয়াররা সব কেতাদুরস্ত। ঠিক সময় আসছে, ঠিক সময় যাচ্ছে। ডিউটির কী কড়াকড়ি, কী শাসন। কারখানার ভেতরে ও বাইরে যে কোন লোক তাদের শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু—

কিন্তু কী?

কিন্তু কাঁচা মাল যত পড়ছে, লোহা তত বেরচ্ছে না। সেই বিদেশী লোকটা হাতায় করে গলা লোহা বার করে বললে, কী দোষ হচ্ছে দেখ তো! ইঞ্জিনিয়াররা হেসে বললে, তাই আবার বলা যায় বুঝি! কেন যাবে না, তা হলে কী দেখছ তোমরা? ইঞ্জিনিয়াররা ভাবল, এ পাগল নাকি! কিন্তু সেই লোকটা দমবার পাত্র নয়। বললে, এ ভাবে হবে না, কাঁচা মাল কম-বেশি করতে হবে। কাঁচা মালে ভেজাল আছে অনেক।

এর পরেই স্বাতি আটকে গেল। বলল: কী বাড়াতে কমাতে হবে, আমার বাপু তা মনে নেই।

তা না থাক্। তারপর কী হল বল।

ওই লোকটার কথা মতো কাজ করে দেখা গেল, দলা-দলা লোহা বেরচ্ছে। লোহা নয়, একেবারে ইস্পাত।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: মিস্টার চাওলা ঠিকই বলেছে। আমাদের দেশের অবস্থাও এই রকম। যাদের কিছু জানা আছে, তাদের মুখ বন্ধ। যারা বাপ-দাদার পয়সায় চাল-চালিয়াতি দেখাচ্ছে, তারাই করে খাচ্ছে এ দেশে।

তার কথার ধরন দেখে আমি হাসলুম।

স্বাতি বলল: তুমি যে হাসবে, তা আমি জানি। আর হেসে

চুপ করে বসে থাকবে। তা না হলে কুঁড়েমিতে কায়েম থাকবে কী করে!

বেশ উর্দু শিখেছ তো?

মিস্টার চাওলার কাছে শিখেছি। তোমার সম্বন্ধে সে কী বলে জান?

কী করে জানব!

এ কথা শেষ করবার আগেই স্বাতি বলল: মিস্টার চাওলা বলে যে নয়া দিল্লীর দুটো ব্লকে রাণাবাবুরা জাঁকিয়ে বসেছে। প্রতিপত্তিশালী কর্মচারী আর পয়সাওয়ালা নাগরিকদের যোগ্য বংশধর। সরকারী দপ্তর আজ স্বার্থপরের রাজ্য হয়েছে।

গম্ভীর হয়ে আমি বললুম: এসব কথা বোলো না স্বাতি। পেছনে টিকটিকি লাগবে।

কেন বলব না! মিস্টার চাওলা ভয় পায় বলতে!

চাওলার চেলা হয়েছ বুঝি! কিন্তু আমার সম্বন্ধে সে কী বলল?

বললে, গোপালবাবুরা সব দূরে আছে। দূরে রাখা হয়েছে তাদের। সরকার নাকি নয়া দিল্লীর ত্রিসীমানায় তোমাদের মাড়াতে দিচ্ছে না।

ওই আনন্দেই থাকি।

আচ্ছা গোপালদা, তুমি কি ওই বড় বাড়ি দুটোর ভেতর কোন মতেই ঢুকতে পার না?

কেন পারব না! পরীক্ষা দিলেই পারি। যার যোগ্যতা আছে সেই পারে।

মিস্টার চাওলা কিন্তু বলছিল যে পার না। ভাল লিখলে পাস করা যায়, কিন্তু চাকরি পাওয়া যায় না। চাকরি পেতে হলে নাকি মৌখিক পরীক্ষায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অন্য সম্বল চাই।

নিজের মনের কথা আমি প্রকাশ করলুম না। বললুম: যারা ফেল করে এ সব তাদের কথা। আমি পরীক্ষা দিই নি।

কেন দাও নি?

কৈফিয়ত চাইছ ?

কেন চাইব না ?

তারপরেই বলল : আজ তুমি রাণাবাবুর পাশের ঘরে বসলে কি আমাকে এত পরীক্ষা দিতে হত !

আমি তার দৃষ্টিতে এক রকম অদ্ভুত আচ্ছন্নতা দেখলুম। মনে হল, তার হৃদয়ের কোন তন্ত্রী থেকে আজ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। যা বলতে চেয়েছিলুম, তা বলতে পারলুম না।

স্বাতি বলল : উত্তর দিচ্ছ না যে!

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম : দাঁড়াও। আবু পাহাড়ে তো রাণার সঙ্গে দেখা হবে, সেখানে তাকে দেখে নেব।

এই পরিহাসে স্বাতি ক্ষুব্ধ হল। কোন উত্তর দিল না।

বাঙালী ধর্মশালায় আমরা তখন পৌঁছে গেছি।

ধর্মশালার দরজার কাছেই ডাক্তার বসু পায়চারি করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন। বললেন : এত দেরি হল!

আমি উত্তর দিলুম : দেরি কোথায়! খেয়ে উঠেই তো বেরিয়ে পড়েছি।

ডাক্তার হেসে বললেন : আপনারা তাহলে অনেকক্ষণ ধরে খান। পায়চারি করে করে আমার জুতোর তলা দেখুন ক্ষয়ে গেছে।

এবারে আমিও হাসলুম। বললুম : খেতে বসেছি কখন তা জিজ্ঞেস করলেন না তো! আনা সাগর থেকে স্টেশনে ফিরি নি। ফিরেছি দরগা দেখবার পর।

ডাক্তার আশ্বস্ত হয়ে বললেন : তাই বলুন।

তারপর ধর্মশালার ভিতরে আসবার সময় বললেন : ওঁরা এলেন না?

এ কথার উত্তর দিল স্বাতি। বলল : বিকালে আসবেন।

প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজা হচ্ছে। বাঙালী স্ত্রী পুরুষ ও ছেলে মেয়ের ভিড়। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি চলছে। প্রসাদ বিতরণ তখনও শেষ হয় নি। সরাসরি নিমন্ত্রণ পেয়ে গেলুম। কেন খেয়ে এসেছি তার কৈফিয়ত দিতে হল। ডাক্তার আমাদের উদ্ধার করে বললেন : শুধু পায়েসটা দাও।

সন্ধি পূজা শুরু হবার আরও কিছু দেরি ছিল। এই অবসরে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল, তাঁদের দুজনকে চির দিন মনে থাকবে। প্রথম হলেন ভট্টাচার্য মহাশয়। রাজস্থান মিউজিয়মের সর্বময় কর্তা। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের ভ্রমণ-কাহিনীতে। এক কথায় এমন অমায়িক মানুষ আমি কম দেখেছি। আর দ্বিতীয় জন হলেন সদানন্দবাবু। আজমীরের বিখ্যাত মিষ্টির

দোকানের মালিক। ধর্মশালার দরজার পাশেই তাঁর দোকান। আমরা সেই দোকানে এসে বসলুম।

হঠাৎ আমার বিমলবাবুর কথা মনে পড়ল। আজমীরে কিছু দিন কাটিয়ে গিয়ে তিনি আমায় অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। তার মধ্যে কর্মভোগ খাবার গল্প ছিল। সেই কথা আমি সদানন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম। আমি বেশ দেখতে পেলুম, ডাক্তার মুখ লুকিয়ে হাসছেন, আর সদানন্দবাবুর মুখ কঠিন হয়েছে।

বাহিরে ডাক্তার বসুর রথ তৈরি ছিল। বললেন: চলুন এবারে।

কোথায় নিয়ে যাবেন?

যা দেখেন নি বলুন।

যা দেখেছি বলতে পারি।

আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই জানালুম: আনা সাগর, সুভাষবাগ, জাদুঘরের গেট আর দরগা সাহেব।

জাদুঘরের গেট কেন?

জাদুঘর তো আজ বন্ধ।

ডাক্তার যেন লাফিয়ে উঠলেন, বললেন: বলেন কি! ভট্‌চায্যি সাহেব আজমীরে থাকতে জাদুঘর আপনারা দেখতে পাবেন না! ভট্‌চায্যি সাহেব কোথায় গেলেন?

বলে ডাক্তার নিজেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে ধরে এনে বললেন: চলুন এবারে।

কাজেই আমরা চারজনে মিলে জাদুঘর গেলুম। লোক ডেকে দরজা খোলা হল। ছুটির দিনেও বাতি জ্বলল ঘরে। মিস্টার ভট্টাচার্য আমাদের অনেক যত্নে অনেক মূর্তি দেখালেন।

শিবপূজা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল, সে কথা আজ প্রথম জানলুম। শিবঠাকুর পূজা পাচ্ছেন বৈদিক যুগেরও আগে থেকে। মহেন-জো-দারোতে পাওয়া অনেকগুলি সীল ও মুদ্রা এখানে আছে। তার ভিতর একটি সীলে ধ্যানমগ্ন শিবের

মূর্তি দেখলুম। তাঁর চারিদিক ঘিরে নানা জন্তু—বাঘ হাতি মহিষ। শিব যে পশুপতি, পশুকে বাদ দিয়ে তো তাঁকে ভাবা যায় না।

আর একটি মূর্তি কালীর। শিব শুয়ে আছেন পদ্মের উপর। তাঁর নগ্নবুকে নৃমুণ্ডমালিনী কালী। দশ মাথা আর চুয়ান্ন হাত। একটি মাথা শুধু মানুষের, বাকি সবই পশুর। এই মূর্তি নিয়ে গবেষণা আজও শেষ হয় নি।

পঞ্চমুখ শিব দেখলুম। সূর্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রকে নিয়ে শিবের পঞ্চমুখ। মিস্টার ভট্টাচার্য আর একটি মূর্তি দেখালেন—যশোদা ও কৃষ্ণের মূর্তি। এই মূর্তির ভুল ব্যাখ্যা নাকি তিনি এসে সংশোধন করেন।

স্বাতি চমকে উঠল আর একটি মূর্তি দেখে। মিস্টার ভট্টাচার্য তার উৎসাহ দেখে খুশী হলেন। বললেন: এ হল ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিবের সীমার সন্ধান। শিবপুরাণের গল্প।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল। বুঝতে পারলুম যে সে হালদারের কথা ভাবছে। এইখানে দেখে গিয়েই বোধ হয় গল্পটা আমাদের শুনিয়েছিলেন।

মূর্তি দেখাতে ও গল্প বলতে মিস্টার ভট্টাচার্যের উৎসাহ দেখলুম আমাদের চেয়েও বেশি। ডাক্তার বসু তাঁকে তাড়া দিলেন, বললেন: হাতে সময় কম ভট্চায্যি সাহেব, আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে।

মিস্টার ভট্টাচার্য সচেতন হয়ে আমাদের পাশের একটা ছোট ঘরে আনলেন। সেখানে আমরা প্রাচীন চিত্র দেখলুম। প্রাচীন গ্রন্থও আছে অনেক।

মিস্টার ভট্টাচার্য জাদুঘরেই রয়ে গেলেন। আমরা এগিয়ে গেলুম আড়াই দিনকা ঝোঁপরার দিকে। পথে যেতে যেতে ডাক্তার বসু আমাদের এই ঝোঁপরার গল্প শোনালেন। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চৌহান সম্রাট ছিলেন বিশালদেব। তিনি বিগ্রহরাজ

নামেও পরিচিত। দু শো ফুট লম্বা আর পৌনে দু শো ফুট চওড়া এই বিশাল শিক্ষামন্দিরটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরের ভিতর সরস্বতীর মূর্তিও ছিল। ঝোঁপরাকে যাঁরা জৈন কীর্তি বলেন, তাঁরা ভুল করেন। দেওয়ালের গায়ে শিব পার্বতী মহাকালী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি আজও দেখতে পাওয়া যায়। কিছু দিন আগে মেঝে খুঁড়ে একটি শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে। দেওয়ালে নাকি সংস্কৃত শিলালিপি আছে—শ্রীবিগ্রহরাজ-দেবেন কারিতমায়তনমিদং। এই সরস্বতী মন্দিরের আয়ু ছিল এক শো বছরের কিছু বেশি। সুলতান সাহাবুদ্দিন ঘোরী আড়াই দিনে এই মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করলেন। সেই থেকে এর নাম হল আড়াই দিনকা ঝোঁপরা।

এর পূর্ব গৌরব আজও যা আছে, তাই দেখে জেনারেল কানিংহাম বলেছিলেন, এর সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম ও শ্রমসাধ্য বৈচিত্র্যের কোথাও তুলনা নেই। জগতের মহত্তর কীর্তির অন্যতম এই ভাঙা ঝোঁপরা। বিখ্যাত ফার্গুসন সাহেবও এই মত সমর্থন করেছেন।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বসু মন্তব্য করলেন : আমি জানি, আপনারাও এই কথা মেনে নেবেন।

দরগা সাহেবের দরজা পেরিয়ে সরু রাস্তা দিয়ে এঁকে বেঁকে কোন মতে একটা ফাঁকা জায়গায় এনে রথ থামালেন। দরজা খুলে আমরা নেমে পড়লুম। পাশেই আড়াই দিনকা ঝোঁপরা। মস্ত উঁচু উঁচু কারুকার্য করা থামের উপর গম্বুজের মতো ছাদ। সেও অপূর্ব শিল্প-সমন্বিত। অনেকক্ষণ ধরে আমরা নিচেটা দেখলুম। তারপর উঠে গেলুম উপরে। ধাপে ধাপে শেষ পর্যন্ত উঠে আজমীর শহরের এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। এক দিকে পাহাড়ের উপর তারাগড়, অন্য দিকের সমতল ভূমিতে বিচিত্র নগরী। ডাক্তার বসু আমাদের অনেক কিছু চিনিয়ে দিলেন।

নামবার সময় স্বাতি বলল : দেখবার আর কী বাকি রইল ?

ডাক্তার বললেন : যা দেখেছেন, সে দেখাও সম্পূর্ণ হয় নি।

মানে ?

আনা সাগরের কিছুই দেখেন নি। দুপুরবেলায় কি কেউ আনা সাগর দেখে !

তবে !

ডাক্তার উত্তর দিলেন হেসে, বললেন : আনা সাগরের রূপ দেখুন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময়, দেখুন বর্ষার দিনে। নাগ পাহাড়ের আড়ালে যখন সূর্য অস্ত যাবে, রামধনুর রঙ দেখবেন আনা সাগরের জলে। তারপর নৌকোয় নামুন পূর্ণিমার রাতে। থাকবেন পূর্ণিমা পর্যন্ত ?

ডাক্তার হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি আমার পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করলুম : আজ রাতেই আমাদের চলে যেতে হবে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ডাক্তার বসু একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন। মনে হল যে আমাদের জন্যই তাঁর দুঃখ হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন : আনা সাগরে আপনাদের আর্য সমাজকা ঘাট দেখিয়েছি ?

না তো !

কেন, বরাদরি থেকে তারাগড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সোজা সামনেই হল আর্য সমাজকা ঘাট। স্বামিজীকা বাগ তার পাশে। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ভস্ম এই বাগানেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই বাগানে কেন ?

মহর্ষির তাই ইচ্ছা ছিল।

তারপরেই বললেন : জানেন বোধ হয়, তিনি তাঁর শেষ জীবন আজমীরেই কাটিয়েছিলেন।

শুনেছি। কিন্তু সে বোধ হয় আমাদের জন্মের ঢের আগেকার কথা।

ডাক্তার হেসে উঠে বললেন : ঢের মানে! তিনি ছিলেন আগের শতাব্দীর মানুষ।

তাঁর জীবন সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি ?

ডাক্তার জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, বললেন : কিছু না। এইটুকু জানি যে তিনি গুজরাটের মার্ভি রাজ্যের মানুষ ছিলেন। আপনারা তো ওই দিকেই যাচ্ছেন, সেখানেই জেনে নেবেন।

স্বাতি কী বলবে বলে অনেকক্ষণ থেকে ইতস্তত করছিল। ডাক্তার থামবার পরেও কিছু বলল না। তাই দেখে আমিই প্রশ্ন করলুম : কিছু বলবে কি ?

স্বাতি আর দ্বিধা করল না, বলল : দয়ানন্দ সরস্বতী কে ছিলেন গোপালদা ?

ডাক্তার আশ্চর্য হলেন, কিন্তু আমি হলুম না। দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম ভারতে আজ কজনে জানেন ? কজন জানেন কেশব সেনের নাম ? বাংলা দেশের মানুষ বলে কেশব সেনের নাম আমরা জানি, আর আজমীরে দেহরক্ষা করেছেন বলেই স্বামী দয়ানন্দ এখানে পরিচিত। সাধারণ মানুষের উপর তাঁদের প্রভাব কী! এক একটা সমাজ গঠন করে গেছেন বলেই আজও তাঁরা বেঁচে আছেন, প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন অনেকের কাছে। একদা ভারতবর্ষে কি মহাত্মা পুরুষের অভাব ছিল ?

আমি কিছু বলবার আগেই ডাক্তার বললেন : দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম শোনেন নি! আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দয়ানন্দ সরস্বতী।

স্বাতি কিছু লজ্জা পেল। তা লক্ষ্য করে আমি বললুম : স্বামী বিরজানন্দের চেলা।

তাড়াতাড়ি স্বাতি বলল : বুঝতে পেরেছি।

আমি বললুম : স্বামী দয়ানন্দ একবার কলকাতায় এসেছিলেন। অতিথি হয়েছিলেন মহাত্মা কেশব সেনের। প্রতিমা পূজার বিরোধী

ছিলেন বলে সেদিন ব্রাহ্মরা তাঁকে নিজেদের দলে মনে করতেন। এ কথা প্রচারও নাকি করতেন। কিন্তু এঁদের মিলের চেয়ে গরমিলটাই বড়। স্বামী দয়ানন্দ সারা জীবন যোগাভ্যাস করেছেন। বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য যোগ সাধনার প্রয়োজন হল অনিবার্য। ব্রাহ্মরা এ কথা মানেন নি।

ডাক্তার আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন জানি নে। জিজ্ঞাসাও করি নি। কিন্তু তিনি জানতে চাইলেন: তারপর?

ফিক করে স্বাতি হেসে ফেলল।

আমি দেখতে পেলুম যে এবারে ডাক্তার লজ্জা পেয়েছেন। তাই কৈফিয়তটা আমি দিলুম, বললুম: স্বাতি আপনার প্রশ্ন শুনে হাসে নি, হেসেছে আমার পণ্ডিতি দেখে। তার ধারণা, আমি নিজেকে সবজান্তা বলে প্রচার করতে চাই।

স্বাতি বলল: আপনার প্রশ্ন শুনে গোপালদার বুকটা যে ফুলে উঠেছিল দেখতে পান নি?

ডাক্তার হাসলেন।

আমি বললুম: স্বাতি সবাইকেই এই কথাটা বলে। আগে লজ্জা পেতুম, এখন আর পাই নে।

ডাক্তার বললেন: আমার প্রশ্নটা কিন্তু মারা যাচ্ছে।

বললুম: স্বামীজীর একটা কথা আমার ভাল লেগেছে। লাহোরের এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে যোগের ভেতর যারা প্রবেশ করতে পারে নি, তারা ধর্ম মন্দিরের বাইরেই রয়ে গেল। ব্রহ্মলাভের জন্যে নিয়মিত প্রাণায়াম ও যোগাভ্যাস করতেই হবে।

দেব দেবীতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। পুরাণের গল্প শুনে বলতেন, সব ঝুট বাত হ্যায়। দেবতার ধ্যান আমরা যুগ যুগ ধরে করে আসছি, পুরাণকে বিশ্বাস করছি জীবনের মতো সত্য বলে। এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত দিলে কি মন আমাদের ভরে উঠবে! যুক্তি

দিয়ে যা পাই নে, বিশ্বাস দিয়ে তা ভরিয়ে নিই। সাধারণ মানুষ বাঁচে বুকে বিশ্বাস বেঁধে।

কিন্তু এবারে আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

পুষ্কর দরগা আর আর্য সমাজ নিয়েই তো আজমীর নয়, এখানে জৈনও অনেক আছেন। এবারে তাঁদের নাসিয়ান দেখতে পাবেন।

নাসিয়ান কী ?

মানে জানতে চাইলেই বিপদে পড়ব। জৈনদের লাল মন্দিরকে নাসিয়ান বলে।

শহরের ভিতরেই এই মন্দির। গাড়ি থেকে নেমে দেখলুম যেদিকটা প্রশস্ত অঙ্গন, সেদিকে যাবার পথ বন্ধ। খোলা পথ ধরে উপরে ওঠার সিঁড়ি পেলুম। একতলা উঠতেই ভিতরের জিনিস সব প্রত্যক্ষ হল। অদ্ভুত ব্যাপার। বিচিত্র রঙে রঙীন, কাচেরই বা বাহার কত। চারি দিকেই সোনার রঙের ছড়াছড়ি। ছোট ছেলে-মেয়ে সঙ্গে থাকলে খেলনা দেখে লাফিয়ে উঠত। ডাক্তার আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, বললেন : জৈনশাস্ত্রে এই হল স্বর্গের পরিকল্পনা। এ সমস্তই নন্দনকাননের দৃশ্য।

আর এক জায়গায় গিয়ে আজমীর শহরের দৃশ্য দেখলুম। স্বাতি ছবি নিল এই দৃশ্যের। তারপর গাড়িতে এসে উঠলুম।

১৭

এক দিনেই আজমীর দেখা আমাদের শেষ হয়ে গেল।

ধর্মশালায় ফিরে দেখলুম যে মামা মামী এসে বসে আছেন। সন্ধিপূজা শেষ হয়ে গেছে। এক সঙ্গেই প্রসাদ পেলুম, মিষ্টি খেলুম সদানন্দবাবুর দোকানের। ডাক্তারবাবু আগ্রহ করে জোর করে অনেক মিষ্টি খাওয়ালেন। কত গল্প, কত হাসি উল্লাস। যেন কত দিনের চেনা, কত দিন পরে আবার দেখা হচ্ছে। সঞ্জীববাবুর কথা মনে পড়ছে। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, বিদেশে বাঙালী সব আত্মীয়, সবাই যেন একই পরিবারের।

তারপর বিদায়ের পালা। ডাক্তার বসু কিশনগড়ে ফিরবেন। আমরা স্টেশনে ফিরে এলুম। রাত সাড়ে দশটায় আমাদের ট্রেন ছাড়বে। চিতোর পৌঁছব ভোর পৌনে ছটায়। আজমীর থেকেই ট্রেন ছাড়বে। তিনখানা বার্থ রিজার্ভ করা আছে। মামাকে না জানিয়ে আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছি, এ নিয়ে নিশ্চয়ই হাঙ্গামা পোয়াতে হবে।

হলও তাই। ট্রেনে উঠে মামা আগুন হয়ে উঠলেন। কী বলবেন প্রথমটায় ভেবে পেলেন না। তারপর পাইপে কয়েকটা টান দিয়েই মুখ খুললেন। বললেন : এক গাড়িতে গেলে কি তোমার জাত যাবে গোপাল ?

ও বালাই তো নেই মামাবাবু যে ভয় পাব !

তবে আপত্তি কিসের ?

বিলাসিতার কী দরকার !

প্রয়োজনকে তুমি বিলাসিতা বল ?

মামা গর্জন করে উঠলেন।

আমি উত্তর দিলুম শান্ত গলায়, বললুম: প্রয়োজন কি সব মানুষের সমান! তা যদি হত, তা হলে বড় সুখের হত এই সংসারটা।

মামী জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিলেন। বিছানা পাতছিল রামখেলাওন। আমি আমার চাদর আর বালিশ নিয়ে নিচে নেমে পড়লুম। স্বাতি বলল: বার্থ একখানা খালি রইল। বাইরের লোক উঠলে বিপদ হবে।

বিপদ কিসের?

কী রকম লোক উঠবে, তার ঠিক কি। চোর ছ্যাঁচোড়ও তো হতে পারে।

তার বিপদের কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম।

মামা বললেন: হাসির কথা নয় গোপাল, এর গুরুত্ব তোমার বোঝা উচিত।

আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললুম: আপনাদের ভয় নেই, গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত আমি কাছেই থাকব। তারপর কেউ আর বিরক্ত করতে আসবে না।

হুঁ, দেশোদ্ধার কর তুমি।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার দৃষ্টি হল বিভ্রান্ত। মনে হল, যে মহিলাটি আমার পাশ দিয়ে গেলেন, সাদা থান পরা বিধবা মহিলা, তিনি আমার পবিচিত। শুধু পরিচিত নয়, তার চেয়ে বেশি। মন থেকে যখন মুছে যান নি, তখন মনে রাখার মতো কিছু নিশ্চয়ই দেখেছি।

ললিতা বউদি কি! তা হলে তো ডেকে কথা কইতেন আমার সঙ্গে। হয়তো টেনেই নিয়ে যেতেন হাত ধরে। কিন্তু তিনি একা বেরবেন কেন। পাশের ওই বউটিও কি তাঁরই সঙ্গে আছে! ও তো বাঙালী মেয়ে নয়। এ দেশেরই মেয়ে, না শখ করে ঘাগরা পরে রাজপুতানী সেজেছে। গাড়ি থেকে নেমে পড়েই আমি তাঁদের

লক্ষ্য করতে লাগলুম। দেখলুম, তাঁরা একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে পড়লেন।

স্বাতি আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল। বলল: কী দেখছ গোপালদা?

বললুম: চেনা মুখ দেখলুম বলে মনে হল।

বিস্ময়ের সুরে স্বাতি বলল: চিতো রর গাড়িতে তোমার চেনা মুখ!

তবু ভাল। যাদের কথা বললুম, স্বাতি তাদের দেখতে পায় নি। দেখতে পেলে আরও বেশি কৌতূহলী হত। কিন্তু ভাবনা আমার অন্য পথ ধরেছে। একা কোন বাঙালী বিধবা এত দূরে বেড়াতে আসবেন, ভাবতে কেমন বিসদৃশ ঠেকছে। চোখ দুটো ভুল করেছে দেখলেই যেন বেশি আরাম পাব। সেই আরামের জন্যই মন ছটফট করে উঠল।

স্বাতি আমার এই অস্বস্তিটুকুও লক্ষ্য করেছে দেখলুম। বলল: কাকে দেখলে, ভাল করে দেখে এস।

একেবারে কাল সকালে আসব।

মামা যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তা বোঝা গেল তাঁর পাইপ টানার ধরন দেখে। খুব জোরে ধোঁয়া নিতে লাগলেন এক সঙ্গে অনেকখানি করে। আমি তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গেলুম।

সেই কামরাটি আমি মনে রেখেছিলুম। তার কাছে পৌঁছতেই আমি চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালুম জানলার ধারে কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠলেন। এ আমার চেনা হাসি। এ হাসি কানে আমার লেগে আছে। এ হাসি আমি ভুলতে পারি না। হাসি থামলে গলার শব্দ পেলুম: আপনি এখানে!

এ যে শান্তিদি! হাওড়ার স্টেশন ছেড়েই আমাদের পরিচয়। কিন্তু শান্তিদি একা কেন! পাশে যেন সেই মারওয়াড়ী মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে। বললুম: আপনি একা!

শান্তিদি হেসে বললেন: একা কোথায়! এই তো আমার সঙ্গী আছে।

বলে পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে দিলেন।

এবারে কী বলব ভাবছিলুম। শান্তিদি বললেন: আসুন না এই গাড়িতে।

এই গাড়িতে আসব!

বলে গাড়ির বাহিরটা দেখবার চেষ্টা করলুম।

শান্তিদি বললেন: ভয় নেই, এটা মেয়েদের গাড়ি নয়। আমরা আপনাদের গাড়িতেই উঠে বসেছি।

এবারে আর বাধা নেই। আমিও উঠে পড়লুম। মস্ত বড় গাড়ি, বহু লোক যাচ্ছে। এই দুই মহিলা মেয়েদের গাড়িতে না উঠে এখানে কেন উঠেছেন ভেবে আশ্চর্য লাগল। শান্তিদি কি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন! বললেন: মেয়েদের গাড়িতে নাকি জানোয়ারের ভয়। এখানে মানুষ ভর্তি গাড়িতে জানোয়ারকেও মানুষ সাজতে হয়।

মনে মনে তাঁর কথা মেনে নিলুম। সভ্যতা তো একটা মুখোশ। বিংশ শতাব্দীতে এই সভ্যতার মুখোশ পথে ঘাটে কিনতে পাওয়া যায়। জানোয়াররা তাই পরে মানুষ সাজছে, আর মানুষের লাঞ্ছনা করছে বেপরোয়া ভাবে। বললুম: দলের আর সবাইকে কোথায় রেখে এলেন?

তাঁরা ধর্মশালায় গেলেন।

আপনি গেলেন না?

আমি ধর্মশালায় যাব!

এ কথার মানে আমি বুঝতে পারলুম না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আরও কিছু শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

শান্তিদি বললেন: ধর্ম আমি ভুলে গেছি।

ধর্ম ভুলে গেছেন! আমি আরও আশ্চর্য হলুম তাঁর কথা শুনে

ধর্মই যদি ভুলে যাবেন তো এত দূরে দেশে এত কষ্ট করে আসবার কী দরকার ছিল! দ্বারকা আর সোমনাথও যাবেন শুনেছি। ধর্ম ছাড়া সেখানে আর কী আছে! এ নিশ্চয়ই শান্তিদির মুখের কথা, তাঁর রাগের কথা। কিন্তু আমাকে তিনি আরও আশ্চর্য করে দিলেন পরের কথায়। বললেন: বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা, তাই না?

কী করে বিশ্বাস করি বলুন!

কেন করবেন না! ধর্ম কি আমি ভুলতে পারি নে?

শান্তিদি হঠাৎ এখানে থেমে গেলেন। আমার মনে হল যে এই কথার আড়ালে কোন বেদনা আছে। তাঁর অনেক দিনের বিশ্বাস বুঝি এক দিনে ভেঙে গেছে। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। এ কথা জানতে চাওয়া ধৃষ্টতা হবে। আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

শান্তিদিও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন: এই মেয়েটিকে আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।

সেকি: এ মেয়ে তো ছেলেমানুষ নয় যে বাপ-মাকে হারিয়ে রাস্তার ধারে বসে কাঁদবে!

শান্তিদি বললেন: একে কুড়িয়ে পাওয়াই বলে। একা একাই চিতোর যাচ্ছে। আমি না এলে ও একাই যেত।

একা চিতোরে যাচ্ছে! চিতোর তো একটা ভাঙা কেল্লা। সেখানে মানুষ কী কাজে যাবে!

শান্তিদি বললেন: কেন যাচ্ছে তাই জানতে পেরেই তো আমি দল ছাড়লুম।

কেন বলুন তো!

শান্তিদি সে কথার উত্তর দিলেন না বললেন: কত হিসেব করতে হয়েছে দেখুন। ওঁরা সবাই আজ আজমীরে নামলেন। কাল পুষ্কর স্নান, সাবিত্রী-দর্শন। পরশু দেখবেন আজমীরের আর সব দেখবার জিনিস। তারপর এই রাতের ট্রেনেই রওনা দেবেন। আবু রোডে নামবেন কিনা এখনও স্থির হয় নি।

কথার মাঝখানে আমি বলে ফেললুম : আপনি কোথায় তাঁদের দেখা পাবেন ?

শান্তিদি হেসে বললেন : দেখা পাবার কী দরকার! দ্বারকার টিকিট একখানা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। বাকি জীবনটা সেখানেই কাটাতে পারব।

বলে সেই টিকিটখানা বার করবার ভান করলেন। বললুম : চমৎকার আইডিয়া!

শান্তিদি খিলখিল করে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন : মারবাড় জংসনে আমি রাত বারোটা থেকে দাঁড়িয়ে থাকব দিল্লী এক্সপ্রেসের অপেক্ষায়। ওঁরা আমায় তুলে নেবেন।

এই মেয়েটি ?

ওর কথা ওই জানে।

বউটির মুখের দিকে আমি এবারে ভাল করে তাকালুম। ওঁরা জানলার ধারে বসেছিলেন। আমি উল্টো দিকে গাড়ির মাঝখানের বেঞ্চিটায় বসেছিলুম তাঁদের মুখোমুখি। পাতলা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আমি একখানি বিষণ্ন মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম। দেশ দেখতে বেরিয়ে মুখ কেন বিষণ্ন হবে! মুখ তো মনের প্রতিবিম্ব! মনের কোন্ কোণে তার বেদনা!

একটা দীর্ঘশ্বাস আমার কানে এল। ও কার দীর্ঘশ্বাস! দুজনেই আমার সামনে বসেছেন। বউটির নাক পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে তার ঘোমটায়। শান্তিদির দীর্ঘশ্বাসই বোধ হয় এমন স্পষ্ট হবে। বললেন : মেয়েটা হতভাগী। এই কচি বয়সেই বিধবা হয়েছে।

শান্তিদির দিকে মুখ তুলে দেখলুম, তাঁরই বা বয়স এমন বেশি কী হয়েছে! তিনিও তো বিধবা। সদ্য বিধবাও নন। আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

শান্তিদি বললেন : হিন্দী তো বুঝি নে, কথাই কইতে পাচ্ছি না ভাল করে! তার ওপর এদের আবার মারওয়াড়ী ভাষা।

বাপের বাড়ি যাচ্ছে না শ্বশুর-ঘর ?

বোধ হয় কোনটাই না।

তবে ?

শান্তিদি অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর বললেন: আমার সন্দেহ অন্য রকম।

কিন্তু তাঁর সন্দেহের কথা বললেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: কী সন্দেহ ?

কিছু বলবেন কিনা, শান্তিদি বোধ হয় সেই কথাই ভাবছিলেন। আমার প্রশ্ন শুনে বলেই ফেললেন: এ মেয়েটি বেশি দিন বিধবা হয় নি। এর আচার আচরণেই আমি তা বুঝতে পারছি। আমার মনে হয়, বিধবা হয়েও বাঁচতে চায় নি। মরতেও পারে নি। সত্তিদা সত্তিদা বলে কী সব বলছিল। বোধ হয় সতীদাহ সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাইছিল। আমি তার কথাই বুঝতে পারলাম না তো উত্তর কী দেব।

বললুম: এদের দেশেও জহর ব্রত আছে। স্বামীর মরার আগে মরণ, সবাই মিলে হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে আগুনে প্রবেশ করে।

মনে হল যে শান্তিদি চোখ বুজে শিউরে উঠলেন।

বললুম: কোথায় যে তাঁরা এই প্রেরণা পেতেন, আমি কোন দিন তা ভেবে পাই নি।

শান্তিদি হঠাৎ বুঝি জেগে উঠলেন, বললেন: ঠিক বলেছেন। কত বড় মনের বল চাই বলুন তো! এক দিন তো আমাদের দেশের সতীরাও লাল-পাড় শাড়ি পরে পায়ে আলতা আর মাথায় সিঁদুর দিয়ে চিতার ওপর স্বামীর পাশে গিয়ে শুতেন। পরে না হয় জোর-জুলুম চলত, কিন্তু চির দিন তো তা ছিল না। এই মনোবলের উৎসটা কোথায় জানেন ?

শান্তিদি কঠিন ভাবে চাইলেন আমার দিকে। বললেন:

এ শুধুই কি একটা সংস্কার! লোকের কাছে বাহবা নেবার চেষ্টা!

শান্তিদি থামলেন না, বললেন: আজকের মানুষ তো বাহবার জন্যে হ্যাংলামি করছে, মেয়েদেরও বেহায়াপনার সীমা নেই। তবে তারা এ কাজ পারে না কেন?

বাধা দিয়ে আমি বললুম: এ আপনার রাগের কথা দিদি। এক আধটা মানুষের দোষে সবাইকে আপনি গাল দিচ্ছেন। আর আত্মহত্যা করে বাহবা নেবার যুগ তো অনেক দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

একে আপনি আত্মহত্যা বলেন!

আর কী বলব বলুন!

আত্মত্যাগ কিংবা তার চেয়েও বড় কিছু!

কিসের জন্যে আত্মত্যাগ! যথেচ্ছ ভোগের দিন ফুরিয়ে গেল বলে!

মনে হল যে শান্তিদি আঘাত পেলেন আমার কথায়। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না। বললেন: ধর্ম প্রেম এ সবের আপনি কোন মূল্য দেন না?

কেন দেব না? কিন্তু প্রাণ দিলেই মূল্য দেওয়া হল, এ কথা মানতে শিক্ষায় বাধে।

কথাটা আরও স্পষ্ট করে বললুম: সতী বলে সম্মান পাবার জন্যে চিতায় উঠবার প্রয়োজন আমি দেখি নে।

জহর ব্রত সম্বন্ধেও আপনার এই মত?

না। সে যুগে তার প্রয়োজন হয়তো ছিল। বর্বরেরা বারে বারে এসে চিতোরের দরজায় হানা দিয়েছে। স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে রাজপুত বীর, আর আত্মসম্মানের জন্যে আগুনে জীবন দিয়েছে রাজপুত নারী। দেহমনের শুচিতা রক্ষার জন্যে এ ছাড়া আর অন্য পথ তারা খুঁজে পায় নি। সম্মানের লোভে

আত্মহত্যা এ নয়, সম্মান রক্ষার জন্যে এ আত্মবিসর্জন। কোন একজনের খেয়ালের বশে নয়, সমগ্র একটা সমাজের পরিণত চিন্তার ফলে। জহর ব্রতের প্রয়োজন মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি হবে না।

শান্তিদি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন: জীবনে আপনি কোন গভীর শোক পেয়েছেন?

উত্তর দিতে আমার একটুও দেরি হল না। বললুম: পৃথিবীতে আমি একেবারেই একা। কাজেই—

শান্তিদির মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা শেষ করতে ভুলে গেলুম। বললুম: অবশ্য বিয়ে এখনও আমি করি নি। কাজেই স্ত্রী পুত্র বিয়োগের যন্ত্রণা আমার জানা নেই।

শান্তিদি কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। আমার দৃষ্টি তখন বাহিরে নিবদ্ধ হয়েছে। জানলার সামনে থেকে যে সরে গেল, হঠাৎ তাকে স্বাতি বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তার শাড়িখানা যেন অন্য রকম দেখলুম। গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই। ঘণ্টা পড়েছে ধীরে ধীরে। প্রথম ঘণ্টা। প্ল্যাটফর্মের উপরে ছুটোছুটি আরও বেড়েছে। লোক বেড়েছে গাড়ির ভিতরেও। তাদের মালপত্র গা মাথা ডিঙিয়ে দরজার কাছে যাবার সুবিধে পেলুম না। সামনের জানলায় তো শান্তিদি আর এই বিধবা মেয়েটি। রাজপুতানার মেয়ে, যার ঠাকুমা দিদিমা মরেছে জহর ব্রতের আগুনে পুড়ে। শান্তিদি হয়তো ঠিকই বুঝেছে। এই মেয়েটা যাচ্ছে চিতোরের মেয়ে দেখতে। তাদের সঙ্গে তার নিজের কোন তফাত আছে কিনা তাই জানতে। তফাত না থাকলে সে তার স্বামীর সঙ্গে চিতায় উঠতে কেন পারল না!

কিন্তু শান্তিদি কী দেখতে যাচ্ছেন!

এক সময় স্টেশন ছেড়ে ট্রেন এল খোলা মাঠের ভিতর। অন্ধকার নির্জন পৃথিবী নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে। শুধু এই ট্রেনখানিই ছুটছে। আমরা সবাই চুপ করে বসে আছি। যারা বেশি পয়সা দিয়েছে রেল কোম্পানিকে, তারা হয়তো লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমের চেষ্টা করছে। গাড়ির ভিতর এখন আর গুমোট নেই। বাহির থেকে বাতাস আসছে হুহু করে। মন আমাদের প্রসন্ন হয়ে উঠল। শান্তিদির মুখেও এই প্রসন্নতা দেখলুম। বললেন : ইতিহাস আপনার কেমন লাগে ?

খারাপ লাগবে কেন !

শান্তিদি হেসে বললেন : অনেক মানুষেরই আজকাল খারাপ লাগে।

আমি আশ্চর্য হলুম এই মন্তব্য শুনে।

শান্তিদি বললেন : আশ্চর্য হচ্ছেন তো ! নিজের কেউ নেই বলেই সংসারটা ভাল দেখতে পান না। পরিবার বড় হলেই আমি যা বলছি তা বুঝতে পারতেন।

কোন প্রশ্ন না করে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

শান্তিদি বললেন : ছেলে আজ বাপকে গাধা ভাবছে, বলছেও অনেকে। সেকেলে বলে মাকে করছে অবহেলা। এ কালের ছেলেমেয়ে কি ইতিহাস ভালবাসবে ! ইতিহাস যে আমাদেরই পূর্বপুরুষের কথা !

মনে হল, জীবনে কোন আঘাত পেয়েছেন শান্তিদি। তাঁর কি নিজের ছেলেমেয়ে আছে, না অন্যের ছেলেমেয়ে দেখে এই কথা বলছেন ! একটা উত্তর দেওয়া দরকার। তাই বললুম : আমরাই

আজকাল তাদের ভুল শিক্ষা দিচ্ছি। নিজেদের বাপ-মায়ের সমালোচনা করছি অপরিণত মনের ছেলেমেয়ের সামনে। বলছি পরের বাপ মায়েরা তো মানুষই নয়।

শান্তিদি আমার দিকে তাকালেন অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে। বললুম: আমি ঠিক কথাই বলছি দিদি। নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবে না, এমন মানুষ আজ চোখে কম পড়ে। বুদ্ধির এই অহঙ্কার বাড়ে দিনে দিনে। অল্প দিন পরেই মনে হয় যে নিজের চার পাশে সবাই গাধা। মানুষের সমাজে এই গাধাগুলো কী করে ঘুরে বেড়ায়, তাই ভেবে আশ্চর্য লাগে। সত্যিকার মানুষ যারা, তারা মনে মনে দুঃখ পায় এই হতভাগ্যদের দেখে। কিন্তু উপায় কী! দিনে দিনে পৃথিবীটাই যে বদলে যাচ্ছে।

শান্তিদি কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন আমার মুখের দিকে। তাতে আমার ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল না। কিন্তু নিজেকে আমি সামলে নিলুম। বললুম: আপনি ইতিহাসের কথা জানতে চাইছিলেন, তাই না?

অন্যমনস্ক ভাবে শান্তিদি বললেন: হ্যাঁ।

বললুম: রাজস্থানের ইতিহাস কতকটা গল্পের মতো কিনা, মনে হয় আপনার উত্তর দিতে পারব।

গল্পের মতো কেন?

রাজস্থানে ইতিহাস তো ছিল না। টড সাহেব গল্প শুনে শুনে ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁকে গল্প শোনাত রাজস্থানের চারণরা।

আপনি আমাকে জহর ব্রতের গল্প বলুন!

আবার জহর ব্রত!

শান্তিদি বললেন: এ দেশের পুরুষদের শক্তি ছিল, কিন্তু মেয়েদের রক্ষা করতে পারত না। এ দেশের মেয়েরা বারে বারে আগুনে পুড়ে মরেছে। পৃথিবীর আর কোন দেশে বোধ হয় এমনি পুড়ে মরার দৃষ্টান্ত নেই।

সত্য কথা। ঠিক এমন করে আমিও ভাবি নি। সেদিনের রাজপুত বিদেশী শত্রুকে ঠেকাত বুক বেঁধে, কিন্তু অন্তঃপুরের নারীকে দিত না বুক পেতে। আত্মরক্ষার দায় নিয়ে তারা কি দেহ মন দুটোই দিত অসংকোচে? অত্যাচার তো ভারতের সর্বত্র সমান হত, কিন্তু জহর ব্রতের আগুন কেন জ্বলত না! ইজ্জতের দাম কি অন্যত্র কম ছিল! কিন্তু সে কথা ভাববার সময় ছিল না। শান্তিদি আমার উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন। তাই বললুম: পৃথিবীর খবর আমি জানি নে। তবে আমাদের ইতিহাস বলে যে রাজপুত মেয়েরা তিনবার জ্বেলেছে জহরের আগুন। প্রথমবার জ্বলেছে আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ে পদ্মিনীর জন্যে। দ্বিতীয়বার গুজরাটের বাহাদুর শাহর আক্রমণে। রাণী কর্ণবতীর রাখিবন্ধ ভাই হুমায়ুন যদি সময়মতো এসে পড়তেন, তা হলে এ আগুন জ্বলত না।

গভীর দৃষ্টিতে শান্তিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। তাই দেখে বললুম: শেষবার আগুন জ্বলেছিল আকবরের আমলে। মোগলের হাতে কন্যা দানে রাণা উদয়সিংহের সম্মতি ছিল না। কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন। যুবক আকবর এসে চিতোর অবরোধ করতেই তিনি পালিয়ে গেলেন।

শান্তিদি বললেন: পদ্মিনীর গল্প আমি জানি।

পদ্মিনীর গল্প কে জানে না! সিংহলরাজ হামীর শঙ্কের কন্যা পদ্মিনী তখন চিতোরে। রাণা রতনসিংহের মহিষী, না নাবালক রাণা লক্ষ্মণসিংহের পিতৃব্য ভীমসিংহের ঘরণী, ঐতিহাসিক তার বিচার করবেন। কিন্তু তিনি যে রূপে ও গুণে অলোকসামান্যা ছিলেন, সেদিন ভারতবাসীর তাতে সন্দেহ ছিল না। সেই সংবাদ পেয়ে দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীন খিলজী এসেছিলেন চিতোরে। মুকুরে পদ্মিনীর রূপ দেখলেন, ছলে বন্দী করলেন ভীমসিংহকে। তার চেয়েও কৌশলে স্বামীকে উদ্ধার করে আনলেন বুদ্ধিমতী পদ্মিনী। আলাউদ্দীন এই অপমানের প্রতিশোধ নিলেন

চিতোর অবরোধ করে, আর জহর ব্রতের আগুন জ্বেলে চিতোরের নারীরা তাঁদের সম্মান রক্ষা করলেন। এ গল্প আজ সবাই জানে। বললুম: বাহাদুর শাহর গল্পও আপনার জানা।

শান্তিদি বললেন: মনে পড়ছে না।

বললুম: রাণী কর্ণবতীর রাখিবন্ধ ভাই হুমাঁয়ুনের কথা মনে পড়ছে?

শান্তিদি আগের মতো নির্বিকারে বললেন: না।

তা হলে গোড়া থেকেই বলি। রাণা সংগ্রামসিংহের কথা থেকে। এই খর্বাকার মানুষটি ছিলেন রাজপুত বীরশ্রেষ্ঠ। রাজ্যলোভে ভাইদের মধ্যে যে বিবাদ হয়, তাতে প্রথম যৌবনেই তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়। ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় রাণার একখানা হাত চলে গেল। তারপর আর একটি যুদ্ধে কামানের গোলা লেগে তাঁর একখানা পাও গেল। সারা দেহে বর্শা ও তরবারির আঘাতের চিহ্ন ছিল আশিটা। কিন্তু এই বিকলাঙ্গ মানুষটির বিক্রম কম ছিল না। মোগল বাবর এসে পাঠানদের জয় করেছেন। সংগ্রামসিংহ ভাবলেন, হিন্দুরাজ্য স্থাপনের এই হল সময়। ফতেপুর সিক্রির নিকট খানুয়ার মাঠে বাবরকে তিনি আক্রমণ করলেন। হেরে গেলেন, পরে মারাও গেলেন। বাবরের মতো গোলা বারুদ থাকলে হয়তো হারতেন না। ভারতের ইতিহাস হত অন্য রকম।

একটু থেমে বললুম: এই সংগ্রামসিংহের রাণীর নাম কর্ণবতী। আর বাবরের ছেলে হুমায়ুন। পরবর্তীকালে এঁরাই হলেন রাখিবন্ধ ভাইবোন।

আশ্চর্য তো!

শান্তিদি মন্তব্য করলেন জোরে জোরে।

বললুম: আজকের দিনে আশ্চর্যই মনে হয়। কিন্তু বাঁচবার জন্যে আর কোলের ছেলে উদয়সিংহের জীবনের জন্যে সেদিন আর

কোন পথ কর্ণবতীর ছিল না। গুজরাটের বাহাদুর শাহ চিতোর অবরোধ করেছেন। কেন করবেন না! রাণা কুম্ভ ও রাণা সংগ্রামসিংহের আমলে গুজরাট আর মালব তো কম লাঞ্ছনা ভোগ করে নি। মালবরাজকে তো বেঁধেই নিয়ে এসেছিলেন। বাহাদুর শাহ এত দিন ওৎ পেতে ছিলেন। মালব জয় করেই চিতোর আক্রমণ করলেন।

রাণা বিক্রমজিৎ চিতোরের বাইরে গেলেন লড়াই করতে। চিতোর রক্ষা করতে লাগলেন সর্দাররা। শেষে তাও যায়। বিক্রমজিতের মা জওহর বাঈ কর্ণবতীকে ডেকে বললেন, ঠিক আছে। তুমি উদয়কে রক্ষা কর, আমি যাচ্ছি যুদ্ধক্ষেত্রে। গেলেনও। সাহসী সহচরীদের নিয়ে তিনি মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করলেন। প্রাণ দিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর বীরত্বের কথা অক্ষয় হয়ে রইল রাজওয়াড়ার ইতিহাসে।

এদিকে আগুনের আয়োজন হল রাওয়ালার ভিতর। তার আগেই কর্ণবতী হুমায়ুনের কাছে রাখি পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন যে অতীতে তাঁদের শত্রুতা ছিল, ভবিষ্যতেও হয়ত তা থাকবে। তবু তিনি এই সংকটে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। ভারতে লোক অনেক আছে, কিন্তু মানুষ নেই হুমায়ুনের মতো।

সত্যিই হুমায়ুনের দিল ছিল। কর্ণবতীর পাঠানো রাখি হাতে বাঁধলেন, আর বোনের জন্যে পাঠালেন সোনার কাঁচুলি। এই তো রাজপুত রীতি।

হুমায়ুন তখন বিহারে ছিলেন। দূত ছুটল চিতোরের দিকে। বলে পাঠালেন যে বিহারের শের শাহকে শায়েস্তা করে তিনি আসছেন।

এসেও নাকি ছিলেন। কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গেছে। রাজকুমার উদয়কে ধাত্রী পান্নার হাতে সমর্পণ করে কর্ণবতী তখন জহর ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তের হাজার রাজপুত ললনা।

আমি দেখতে পেলুম যে গভীর উত্তেজনায় শান্তিদি বড় অস্থির বোধ করছেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর। পাশে তাকিয়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। সেই বধূটির ঘোমটা খসে পড়েছে। সুন্দর ফরসা মুখ, গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন তার দু চোখের দৃষ্টি। ঠোঁটে বুঝি কঠিন সংকল্প। আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। মুহূর্তে ঘোমটা টেনে দিল অনাবৃত মুখের উপর।

আমিও অন্য দিকে তাকালুম। যারা শোবার জায়গা পেয়েছে, তারা শুয়ে পড়েছে। বাঙ্কের উপর থেকে দু একজনের নাক ডাকার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। জায়গা পেলে আমরাও হয়তো শুয়ে পড়তুম। সারা রাত আজ বসে বসেই কাটাতে হবে। মনে পড়ল এমনি বসে বসেই গিয়েছিলুম কলকাতা থেকে দক্ষিণ ভারতে। সেবারে সঙ্গী ছিলেন মৈত্রমশায়, শ্রীনিবাসলু আর ভেঙ্কটাইয়ার। আরও অনেকে উঠেছেন ও নেমেছেন। আজ আমার সঙ্গী পুরুষমানুষ নয়। আজ এই বিধবা মহিলা দুটি আমার সামনে বসে থাকবেন। এঁরাই এবারে আমার সঙ্গী। এই সঙ্গে স্বাতির কথাও মনে পড়ল, মনে পড়ল মামা মামীর কথা। তাঁরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি উঠেছি কিনা, সেটুকুই তাঁদের জানবার দরকার ছিল। স্বাতি এসে তা দেখে গিয়েছে। আর তাঁদের কোন ভাবনা নেই।

স্বাতির কথায় আমার ইতিহাসের কথা মনে পড়ল। ইতিহাস শুনলে স্বাতি বিরক্ত হয়, বিরক্ত ভাব দেখায়। আমি ভাবলুম যে শান্তিদিও হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন। তাই থেমে রইলুম। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলেছে। মাঝে কী একটা স্টেশনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আবার চলেছে। চললেই ভাল লাগে। বাতাস পাই। শরীরের ক্লান্তি খানিকটা ঘোচে।

হঠাৎ শান্তিদি বললেন : ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

কই না তো !

বোধ হয় একটু চমকে উঠেছিলুম। তাই দেখে শান্তিদি

হাসলেন। বললেন: সকাল বেলায় কী হবে জানি নে। আজ আপনাকে আরও একটু জাগিয়ে রাখব।

হেসে বললুম: বসে বসে কি ঘুমনো যায়! সারা রাতই হয়তো জাগতে হবে।

তবু চোখ বুজে ঘুমচ্ছি বলে ভাবব। তাতেও খানিকটা আরাম আছে।

সত্যি কথা। অনেকের অনেক কিছু নেই। তবু চোখ বুজে আছে ভাবতে ভাল লাগে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন, তারও একটা তৃপ্তি আছে। যে দেখে, সেই বোঝে। আজ শান্তিদি আমায় নতুন কথা শোনালেন। কথাটা নতুন নয়, শোনালেন নতুন করে। বললুম: বেশ বলেছেন। দেশের সমস্ত লোককে এই কথা বোঝাতে পারলে দেশের অশান্তি অনেক কমে যেত।

শান্তিদি হাসলেন।

আমি জানি, তিনি আমার কাছে কী শুনতে চাইছেন। তবু জিজ্ঞাসা করলুম: কী আদেশ বলুন।

এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন!

আমি উত্তর না দিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

শান্তিদি বললেন: দুবারের গল্প আপনি শোনালেন। আর একবারের কথা যে বাকি রয়ে গেল!

আমি জানতুম যে তিনি এ কথা ভোলেন নি। তবু জানতে চেয়েছিলুম তাঁর শোনবার আগ্রহ আছে কিনা। বললুম: আকবর কেন চিতোরে এসেছিলেন, তা ঐতিহাসিক বলবে। হিন্দুর সঙ্গে তিনি কুটুম্বিতা করেছিলেন, বিয়ে করেছিলেন মানসিংহের পিসিকে। ছেলের বিয়েও দিয়েছিলেন মানসিংহের জাঠতুতো বোনের সঙ্গে। অনেকে বলেন, তিনি উদয় সিংহের এক মেয়েকেও বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। রাণার অসম্মতির কথা শুনেই তাঁকে শিক্ষা দিতে এসেছিলেন চিতোরে। অন্য সবাই বলেন, উদয়সিংহ আশ্রয়

দিয়েছিলেন আকবরের শত্রু মালবরাজকে। এই ছুতোয় মেবার জয় করলেন তরুণ বাদশাহ আকবর।

রাজওয়াড়ার ভট্ট কবিরা বলেন যে আকবর একবার নাকি চিতোরের দরজা থেকে হেরে ফিরে গিয়েছিলেন। বিলাসী উদয়-সিংহ তখন এক বারনারীর হাতের পুতুল, সেই বিলাসিনীই নাকি আকবরের হাত থেকে উদয়সিংহকে রক্ষা করে। রাণার নিজের মুখে এই কথা শুনে সর্দাররা সেই বারনারীকে হত্যা করেন। দ্বিতীয়বার আকবর এলেন এই অন্তর্বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে।

উদয়সিংহ এবারেও পালিয়ে গেলেন। কিন্তু মেবারের সর্দাররা পালাতে পারলেন না, যুদ্ধে পালানো তাঁরা শেখেন নি। সেদিন যাঁরা বুকে বর্ম বেঁধে চিতোর রক্ষা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জয়মল্ল, পুত্ত ও সহিদাসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে। সহিদাসের উপর ভার পড়েছিল সূর্যতোরণ রক্ষার। তাঁর মৃত্যুর পর সেই ভার পড়ল ষোল বছরের ছেলে পুত্তের উপর।

হঠাৎ আমার কর্মদেবীর নাম মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলুম: কর্মদেবীর নাম মনে পড়ে ?

শান্তিদি সরাসরি না বললেন।

বললুম: পুত্তের মায়ের নাম কর্মদেবী। কর্ণবতী কন্যা ও পুত্রবধূর নাম কমলাবতী। চিতোর অবরোধের কথা শুনে কর্মদেবী নিজের ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মনে তাঁর শান্তি ছিল না। এক সময় স্থির করলেন যে তিনি নিজেও যুদ্ধে যাবেন। মেয়ে বউ দুজনেই তাঁর সঙ্গে চলল।

দুর্গের বাহিরে এসে তাঁরা দেখলেন যে পুত্ত মোগল সেনা আক্রমণ করেছেন। আর একদল সেনা নিয়ে স্বয়ং আকবর একটা গিরিপথ দিয়ে আসছেন পুত্তকে পিছন থেকে আক্রমণ করবার জন্য। এঁরা তিনজনেই ঢিপি ও গাছের আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। মোগল সেনা পিছিয়ে গেল।

আকবর বুঝতে পারলেন যে এঁরা পুরুষ নয়, নারী। রাজপুত নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকবরের বুক ভরে গেল। বললেন, খবরদার, এই তিনজন নারীকে হত্যা কোরো না। তাঁদের জীবিত বন্দী কর। কিন্তু এই আদেশ বুঝি সকলের কানে পৌঁছল না। একে একে সবাই গুলিবিদ্ধ হলেন।

এ দিকে পুত্ত তাঁর নিজের দিক সামলে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন এই দিক রক্ষা করতে। এসে যা দেখলেন, তাতে তাঁর মাথায় বজ্রপাত হল। বোন মারা গেছে, তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই স্ত্রী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু মরবার আগে পুত্তের বুকে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেলেন মুমূর্ষু মা। বললেন, তোমার সামনে শত্রু। এখন তোমার দুর্বলতা সাজে না। তুমি এগিয়ে যাও, আমরা তোমার অপেক্ষা করে থাকব।

অদ্ভুত ভাবে অগণিত শত্রু নিপাত করে পুত্ত সে দিন প্রাণ হারালেন।

সবার শেষে প্রাণ দিলেন সেনাপতি জয়মল্ল নিজে। সম্মুখ সমরে তাঁর সঙ্গে কেউই এঁটে ওঠে নি। রাতের অন্ধকারে তিনি গুলিবিদ্ধ হলেন। চিতোর দুর্গের দেওয়াল এক জায়গায় দুর্বল হয়েছিল কামানের গোলা লেগে। সন্ধ্যাবেলায় বাতি জ্বেলে সেই স্থানটি মেরামত হচ্ছিল। জয়মল্ল নিজে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিলেন। দূর থেকে আকবর তাঁকে দেখতে পেলেন। গুলি ছুঁড়েছিলেন তিনি নিজে। অব্যর্থ গুলি।

কিন্তু বীরের পূজা করতে জানতেন আকবর বাদশাহ। দিল্লীতে ফিরে জয়মল্ল ও পুত্তের মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করেছিলেন আপন প্রাসাদের সামনে।

এ দিকে দুর্গের ভিতর জহর ব্রতের আয়োজন হল। গান গাইতে গাইতে মেয়েরা প্রবেশ করলেন জ্বলন্ত আগুনে। আর পুরুষেরা হলদে কাপড় পরে খোলা তলোয়ার হাতে

মোগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে গেলেন।

চিতোরের আলো নিবল চির দিনের মতো। খিলজীর অত্যাচারের পরে আবার জ্বলেছিল, জ্বলেছিল বাহাদুর শাহর আক্রমণের পরেও। কিন্তু এবার আর জ্বলল না। ভীরু রাণা উদয়সিংহ উদয়পুরে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন।

শান্তিদি হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন: চিতোর গড় কত দিনের পুরনো গোপালবাবু?

আমার গোপাল নামটি কোথায় তিনি জানলেন, ভাবতে যাচ্ছিলুম। শান্তিদি বললেন: আপনি নিজে আপনার নাম বলেছিলেন কলকাতা ছাড়বার পর। এবারে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

বললুম: ঐতিহাসিক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। লোকে বলে, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম এই দুর্গ নির্মাণ করান দ্বাপরে, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। যখন মৌর্যদের রাজধানী ছিল, তখন চিত্রাঙ্গ মোরির নামে এর নাম ছিল চিত্রকূট। মোরিদের শেষ রাজা মানসিংহকে তাড়িয়ে বাপ্পারাও এই দুর্গ অধিকার করেন অষ্টম শতাব্দীতে।

আজ আমরা চিতোরের ধ্বংসস্তূপ দেখতে যাচ্ছি।

বসে বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি নে। ক্লান্ত শরীরে ঘুম বুঝি তাড়াতাড়ি আসে। বিছানার দরকার হয় না, দরকার হয় না সাধনার। দেহটা এলিয়ে দেবার মতো একটুখানি স্থান হলেই হল। চলতি ট্রেনে আমিও খানিকটা ঘুমিয়ে নিলুম।

ভোর বেলায় ট্রেন এল চিতোর গড়ে। অন্ধকারের ঘোর তখনও আছে। শান্তিদি ডেকে বললেন : আর কত ঘুমোবেন!

ধড়মড় করে উঠে সোজা হয়ে দেখলুম, গাড়িখানা খালি হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা দরজার কাছে বসে ছিলেন, তাঁরা নেমে যাচ্ছেন। শান্তিদির সঙ্গের সেই বউটিও জিনিসপত্র গুটিয়ে সোজা হয়ে বসেছে। লজ্জিত ভাবে আমি বললুম : তাই তো, বেশ ঘুমিয়েছি দেখছি।

তাতে লজ্জার কী আছে!

নেই কি! আপনারা হয়তো সারা রাত জেগেই কাটিয়েছেন।

সে তো আমাদেরই দোষ। সব অবস্থায় মানিয়ে নেবার অভ্যাস কেন করি নি।

তা হলে যে লোকে মহাপুরুষ বলবে।

পুরুষ!

খিলখিল করে শান্তিদি হেসে উঠলেন। সেই রকম প্রাণখোলা হাসি। কলকাতা ছাড়বার পর এই হাসি আমি কয়েকবার শুনেছি। আমার রোমাঞ্চ হল। তারপরেই জানলার বাহিরে দেখলুম স্বাতির মুখ। বোধ হয় আমাকে ডাকতে এসেছে। আমি দেখতে পেলুম, স্বাতি কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার এগিয়ে এল। শান্তিদিকে কোন উত্তর দেবার আগেই বাহির থেকে স্বাতির ডাক শুনলুম : গোপালদা!

জানলার কাছে মুখ এনে বললুম: নামছি। ভিড়টা একটু কমতে দাও।

শান্তিদি আমার মুখের উপর তাঁর প্রশ্নের দৃষ্টি তুলে ধরলেন।

বললুম: আমার মামা মামী চলেছেন এই গাড়িতে। স্বাতি তাঁদের মেয়ে।

কথা কটি আস্তে আস্তে বললুম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলুম।

সেই বউটির সঙ্গে শান্তিদিও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। হাত জুড়ে আমার নমস্কারটা ফিরিয়ে দিলেন।

বললুম: আবার কবে দেখা হবে জানি নে।

শান্তিদি হেসে জবাব দিলেন: মনে থাকলেই দেখা হবে।

গাড়ি থেকে নামবার সময় আমি ভাবলুম, শান্তিদি এ কথা কেন বললেন। মনে থাকলেই দেখা হবে! তার মানে কি আমরা ভুলে যাবার ভান করি! ভাল করে সে কথা ভাববার অবসর পেলুম না। দরজার নিচেই স্বাতি দাঁড়িয়ে ছিল। বলল: রিটায়ারিং রুমটা আমাদের এখুনি দখল করতে হবে। এখানে নাকি একটি মাত্র ঘর।

তা হলে তুমি এগোও। ঘরটা আমি দখল করে আসি।

সেই ভাল।

বলে স্বাতি ফিরে গেল। আমি গেলুম রিটায়ারিং রুমের দিকে।

অন্ধকার ঘর। খালিই পড়েছিল। আমার ঝোলাঝুলি নিয়ে দখল করতে একটুও সময় লাগল না। তারপর মামা মামীকে ডেকে আনলুম।

পাশের ওয়েটিং রুমটা স্বাতি একবার দেখে এল। সেখানে নাকি দাঁড়াবারও জায়গা নেই। ফিরে এসে স্বাতি বলল: তিনি কোথায় গেলেন?

প্রশ্নটা যে আমাকে লক্ষ্য করে তা বুঝতে কষ্ট হল না। বললুম: কার কথা জিজ্ঞেস করছ?

কেন, যার সঙ্গে সারা রাত গল্প করে কাটালে!

আমি তার কথার ধরন দেখে হাসলুম।

হাসলে যে?

তোমার প্রশ্ন শুনেই হাসছি।

মামী তখন স্নানের ঘর দেখতে ঢুকেছেন, আর মামা বসে পড়েছেন একখানা চেয়ারে। বোধ হয় এবারে পাইপ ধরাবেন। তিনি কাছে না থাকলে বলতুম: তোমার সতীন নাকি?

কিন্তু এ সব রসিকতায় স্বাতি অভ্যস্ত নয়। হয়তো গেঁয়ো বলে নাক সেঁটকাত। তবু ওই ভর্ৎসনাটুকু ভালই লাগত। আমার অসম্পূর্ণ উত্তর শুনে স্বাতি বলল: হাসবে বইকি।

মামা কিছু শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন: ব্যাপার কী?

ভেবেছিলুম স্বাতি উত্তর দেবে, কিন্তু দিল না। শেষটায় আমিই বললুম: স্বাতি এক মহিলার কথা জিজ্ঞেস করছে।

স্নানের ঘর দেখে মামীও ফিরে এসেছিলেন। মহিলার নাম শুনে তিনিও আমার দিকে চাইলেন। বললুম: শান্তিদি কলকাতা থেকে আসছেন।

জামাইবাবুকে তো দেখলাম না।

কী করে দেখবে! শান্তিদি যে বিধবা।

বিধবা!

মামী যেন চমকে উঠলেন।

আমি যে তাঁকে হাসতে দেখলাম!

বিধবা মানুষের কি হাসতে নেই স্বাতি!

স্বাতি অপ্রস্তুত হল, বলল: বাইরে থেকে তো ভাল করে দেখতে পাই নি। আমি তাঁকে ছেলেমানুষই ভাবছিলাম।

বললুম: বয়স তাঁর বেশি নয়।

শান্তিদিকে মামী দেখেন নি। তবু বললেন: আহা, এমন অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছে!

এ কথার কোন উত্তর নেই। আমি চুপ করে ছিলুম। কিন্তু মামী আমাকে নীরব থাকতে দিলেন না। বললেন: তোমার জামাইবাবু কী করতেন?

জানি নে।

জান না! তোমার কী রকম আত্মীয় তা হলে?

স্বাতি কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বললুম: গাড়িতেই পরিচয়। সবাই শান্তিদি বলছিল, আমিও ডাকছি ওই নামে।

গাড়িতে আরও বাঙালী ছিলেন!

আমি জানি যে স্বাতি আমার কথা বিশ্বাস করে নি। কেন না শান্তিদির সঙ্গে সে আমাকেই শুধু দেখেছে, দেখেছে আজমীর থেকে গাড়ি ছাড়বার আগেও। তখনও তাকে পুরনো পরিচয় বলেই ভাবতে হয়েছে। বললুম: না। এখানে আমরা একাই ছিলুম। পরিচয় হয়েছে কলকাতা ছেড়ে আগ্রার পথে। তখন তিনি পঁয়ত্রিশ জনের একজন ছিলেন।

মামা সোজা হয়ে বসলেন। বললেন: বল কি, পঁয়ত্রিশ জনের একটা দল!

শুনে আরও আশ্চর্য হবেন যে সেই দলে মাত্র চারজন পুরুষ-মানুষ। বাকি সবাই মেয়ে।

বাচ্চা কাচ্চা?

একটাও না। সবাই সধবা আর বিধবা মেয়ে। যত দূর মনে পড়ে, কুমারী মেয়ে দু চারটির বেশি ছিল না। তারা সবাই বড়।

বলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। মনে হল যে তার মনে আরও কিছু মেঘ আছে, তার ছায়া পড়েছে মুখের উপর।

মামা পাইপ ধরাচ্ছিলেন। বললেন: চায়ের পরেই তামাকটা ভাল জমত।

সে ব্যবস্থাও হয়েছে। চা এল বলে।

মামা প্রচুর খুশী হলেন। বললেন: এ না হলে ভাগনে!

মামীকেও বড় খুশী দেখলুম। কিন্তু কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হল না। স্বাতি ভয় পেল না। বলল: তোমায় আজ বড় খুশী দেখছি মা!

মামী তখন হেঁট হয়ে কাপড় বার করছিলেন বাক্স থেকে। বললেন: কলে বেশ জল পড়ছে, এই সময়ে নেয়ে নি।

মামীর কথার ধরনে মনে হল যে স্নান করার জল পাবেন এমন আশা করে তিনি এখানে আসেন নি। তাই এমন খুশী হয়েছেন জল দেখে। স্বাতি বলল: তুমি বুঝি জলের ভয় পেয়েছিলে!

কাপড় গামছা কাঁধে ফেলে মামী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মামার দিকে চেয়ে বললেন: আগের বারের কথা তোমার মনে নেই?

মনে আবার নেই! ধুলো আর জল। একটা যত বেশি, আর একটার তত অভাব!

বলে মামা ধোঁয়া টানতে লাগলেন। আর মামা ঢুকলেন স্নানের ঘরে। স্বাতি আমার সঙ্গে আর কথা কইল না।

এক ফাঁকে আমি গেলুম দুখানা টাঙ্গা ঠিক করতে। স্টেশন থেকে চিতোর গড় অনেকটা দূরে। মাইল দুয়ের কম নয়। শেষ পথটুকু চড়াই, পাহাড়ে উঠতে হবে। একখানা টাঙ্গা ছ টাকার কমে যাবে না বলছে। তাতেই হয়তো রাজী হয়ে যেতুম। কিন্তু কে যেন আমায় বলেছিলেন যে চিতোরে টাঙ্গার ভাড়া বড় সস্তা, দু তিন টাকায় পছন্দ মতো একখানা টাঙ্গা পাওয়া একেবারেই কঠিন নয়। যখন ফিরে আসছিলুম তখন একজন বলল: আমি পাঁচ টাকায় যাব।

আমি বললুম: আমি যাব চার টাকায়।

কিন্তু উত্তর না দিয়ে লোকটা ফিরে গেল।

বোধ হয় একজন যাত্রী আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। বললেন:

ঠিক করেছেন। এক দল বাঙালীবাবু এসে ছ টাকায় খানকয়েক টাঙ্গা ঠিক করে গেছেন, বাকি লোকগুলোও পেয়ে বসেছে। এঁরা সব চলে গেলে টাঙ্গা আপনি তিন টাকায় পাবেন।

আমারও তাই মনে হয়েছিল। নিশ্চিন্ত মনে আমি ফিরে এলুম।

মামা বললেন: ব্যবস্থা হল?

পরে হবে।

পরে কেন?

বেশি পয়সা দেবার লোকে স্টেশন ভরে আছে। তারা বিদেয় হলে সস্তায় টাঙ্গা পাওয়া যাবে।

টাঙ্গা কেন, ট্যাক্সি নেই?

আর কোন গাড়িই দেখতে পেলুম না।

স্বাতি বলল: কপালে এখন টাঙ্গা জুটলে হয়।

স্বাতির কথা শুনে আমি হেসেছিলুম, কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে যখন আমরা স্টেশনের বাহিরে এলুম, তখন মাত্র খানকয়েক টাঙ্গা অপেক্ষা করছিল। কিন্তু একটা টাঙ্গাওয়ালাও এগিয়ে এল না। একজনকে ডেকে বললুম: ব্যাপার কী?

গম্ভীর ভাবে লোকটা উত্তর দিল: এ সব টাঙ্গা ভাড়া হয়ে গেছে।

তবে আমাদের উপায়?

বড় করুণ বোধ করলুম নিজের অবস্থা। পিছনে চেয়ে দেখলুম মামারা অনেকটা দূরে আছেন। তিনি শুনতে পেলে খানিকটা বকবেন সত্যি, কিন্তু স্বাতির কাছে বড় লজ্জা পেতে হবে। একটি বুড়ো গোছের লোক এগিয়ে এল। তাকে দেখেই চিনতে পারলুম। সে পাঁচ টাকায় যেতে রাজী ছিল। চার টাকার বেশি দেব না বলে আমি ফিরে গিয়েছিলুম। এবারে সে এগিয়ে এসে বলল: আর একটা টাকা বেশি দাও, তোমায় এমন গাড়ি এনে দেব যে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে।

তোমার গাড়ি কোথায় ?

চোখ বড় করে বুড়ো বলল : দশ মিনিটে হাজির করব।

আশ্বস্ত হয়ে বললুম : দুখানা আনো।

লোকটা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। চক্ষের নিমেষে ছুটে গেল সামনের একটা দোকানে। তার পরেই দেখতে পেলুম, একখানা সাইকেল নিয়ে আর একটা লোক বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত মনে মামার কাছে ফিরে এলুম।

তোমার গাড়ি কই ?

দেখছেন তো ঘোড়াগুলোর চেহারা! এ গাড়িতে উঠলে চিতোরে আর পৌঁছতে হবে না। আমাদের জন্যে ভাল গাড়ি আনতে পাঠিয়েছি।

একখানা গাড়িতে যাবে কী করে ?

আমি তাঁর ভাবনার কথা জানি, জানি মামীমার মনের কথাও। মামী স্বাতিকে নিয়ে পিছনে বসতে চান। আমার সঙ্গে তাকে সামনে ছেড়ে দিতে তাঁর আপত্তি আছে। এ দিকে মামা তাঁর ভারি শরীর নিয়ে সামনে উঠতে ভয় পান। অতীতে একবার নাকি কাকে পড়ে যেতে দেখেছিলেন। টাঙ্গা উল্টে গিয়েছিল। যে সামনে বসেছিল, সে গড়াগড়ি দিয়েছিল ধুলোর উপরে। এত সব চিন্তা করেই আমি দুখানা টাঙ্গার ফরমায়েশ করেছি। বললুম : একখানায় কেন যাবেন! দুখানা গাড়িতে আরাম করে যাওয়া যাবে।

মামার মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম যে তিনি বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। কিন্তু মামী বিরক্ত হলেন গাড়ির দেরি দেখে। ওয়েটিং হলের নিচে দাঁড়িয়ে বললেন : তোমাদের গাড়ি কোথায় ?

আমি মামার পাশে ছিলুম। ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম : এই এল বলে।

মামা নতুন করে পাইপ ধরিয়েছিলেন। বললেন : বুঝলে গোপাল, এই জন্যেই লোকে বেশি পয়সা দেয়।

আমি তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেখলুম যে বাঙালীদের একটি বিরাট দল হেলতে দুলতে বেরিয়ে এসে কলরব করে গাড়িতে উঠছেন। পুরুষ যত, মেয়ে তত। তার উপর নানা বয়সের ছেলে মেয়ে। রঙে ও সুগন্ধে চারিধারটা আমোদিত হয়ে উঠেছে। দেখে ভাল লাগে। তবু বললুম: বাঙালীদের বদনামও আছে এ জন্যে। তাদের চাল বেশি।

আছে বলেই তো চাল।

কিন্তু এদেশের লোকের চেয়ে কি আমাদের বেশি আছে!

এদের অনেক থেকেই বা কী লাভ হয়েছে! জীবনটাকে ভোগই যদি না করল তো রোজগার কি শুধু যক্ষের মতো আগলাবার জন্যে?

ভোগের ধারণা সবার সমান নয়। অন্ধকারে টাকা গুণে গুণে কারও আঙুলে কড়া পড়ছে। সকাল বেলায় সেই কড়া দেখেই তারা জীবন সার্থক ভাবছে। কেউ আবার রাস্তার নালায় গড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত ভোগ করেছি ভাবতে পারে না।

তা যা বলেছ।

পিছন থেকে মামীর বিরক্তি শোনা গেল। বললেন: সাত সকালে ঠেলে বার করলে, সে কি দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে।

মন্তব্যটা মামার উদ্দেশ্যেই করেছিলেন। কিন্তু উত্তর আমি দিলুম: আমাদের ভাল গাড়ি আসছে। পথেই এঁদের সবাইকে আমরা ছাড়িয়ে যাব।

সব কখানা টাঙ্গাই তখন বেরিয়ে গেছে। তাই দেখে স্বাতি বলল: তুমি কিছু ভেব না মা, গোপালদা ভাল ব্যবস্থাই করেন।

বলে ঠোঁট উল্টে হাসল।

আমি উত্তর দিলুম না। জানি যে ভাল গাড়ি তাড়াতাড়ি না এলে এই খোঁচা আমাকে হজম করতেই হবে। যে রাস্তাটা শহরের দিকে গেছে, সেই দিকে চেয়ে আমি মুহূর্ত গুনতে লাগলুম।

খানিকক্ষণ পরেই পথের ধুলো উড়িয়ে হৈ হৈ করে একখানা

টাঙ্গা এল, তার পিছনে আর একখানা। টাঙ্গাওয়ালা বসে আসছে না, আসছে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে। কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

উৎফুল্ল হয়ে আমি বললুম: আসুন এবারে।

রামখেলাওনকে সামনে নিয়ে মামা একখানায় বসলেন। আমি সামনে বসলুম আর একখানায়। স্বাতিকে নিয়ে মামী বসলেন তার পিছনে।

তেমনি হৈ হৈ করেই আবার গাড়ি ছুটল স্টেশন ছাড়িয়ে পাকা রাস্তার উপর দিয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে। খানিকটা এগিয়ে সেই টাঙ্গার সারি দেখতে পেলুম। মনে হল যে এমন জোরে ছুটলে অল্পক্ষণেই তাদের ছাড়িয়ে যাব। স্বাতির দিকে ফিরে বললুম: ব্যবস্থা কেমন দেখছ?

স্বাতি কোন উত্তর দিল না।

২০

খানিকটা পথ এগিয়েই স্বাতি আমাকে আক্রমণ করল। বলল: কিছু বল গোপালদা, চুপ করে বসে রইলে কেন?

কী বলব বল!

সে কথা কি আমি বলব? ইতিহাস পুরাতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব—কোন একটা তত্ত্বের তথ্য পরিবেশন শুরু করে দাও।

বেশ গম্ভীর ভাবে স্বাতি কথা বলছিল। কিন্তু রহস্যের সুর গোপন ছিল না তার কণ্ঠস্বরে। বললুম: সেই কথাই তো ভাবছি। তোমার কোন্‌টা জানা নেই, তা জানতে পারলে আমার সুবিধে হত।

স্বাতি বোধ হয় এই রকম উত্তরের আশা করে নি। তাই বলল: জানা তো সবই আছে, তবু আর একবার শুনি।

সেই ভাল। আমি তা হলে সাড়ে চুয়াত্তর থেকে শুরু করি।

বলে থেমে রইলুম খানিকক্ষণ। ইচ্ছা ছিল, স্বাতি কিছু জিজ্ঞাসা করে কিনা দেখি। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন তাকে করতেই হল। বলল: সাড়ে চুয়াত্তর আবার কী?

সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি।

ওই নামে একটা ছবি দেখেছিলুম কিছু দিন আগে।

বললুম: তবে তার মানে নিশ্চয়ই জান।

জানি নে তো।

ছবি দেখার আগে কখনও ওই কথাটা শোন নি?

স্বাতি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করল: শুনি নি।

মামী বললেন: সেকি, চিঠি লিখে খামের পিছনে যে আমরা সাড়ে চুয়াত্তর লিখতাম।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে তাকাল মায়ের মুখের দিকে। বলল: আমি তো কখনও দেখি নি।

মামী বললেন: এ সব কি এ যুগের কথা! আমরা ছেলেবেলায় লিখতাম। পেছনে সাড়ে চুয়াত্তর লিখে দিলে যার চিঠি সেই শুধু খুলবে। অন্য কেউ খুলবে না।

কেন?

তাই নিয়ম ছিল।

এবারে স্বাতি আমার শরণ নিল, বলল: কেন গোপালদা?

গম্ভীর ভাবে বললুম: ইতিহাসের গল্প কি তোমার ভাল লাগবে?

তৎপর ভাবে স্বাতি জবাব দিল: আর ছেলেমানুষি কোরো না গোপালদা, যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

আমি দেরি করতে চাই নি। শুধু স্বাতির আগ্রহ দেখতে চেয়েছিলুম। দীর্ঘ দিন একত্রে কাটিয়েও যদি একে অপরের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করতে না পারে তো মিথ্যা তার বুদ্ধির অহঙ্কার। আমি নিজের বুদ্ধির পরীক্ষা নিচ্ছিলুম। এবারে খুশী হয়ে বললুম: এই গল্পের জন্ম হয়েছিল চিতোরে। আজ যে চিতোর আমরা দেখতে যাচ্ছি, তার বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী আকবর বাদশাহ নিজে। এই দুর্গ দখল করতে এসে দুর্গের শেষ মানুষটিকে পর্যন্ত শেষ করে গিয়েছিলেন। হঠাৎ কী খেয়ালে বললেন, এই যুদ্ধে যত লোক মরেছে তাদের পৈতেগুলো খুলে ওজন করে দেখা হল। ওজন হল সাড়ে চুয়াত্তর মণ।

স্বাতি বিস্ময়ে তার দু চোখ বিস্ফারিত করে বলল: সাড়ে চুয়াত্তর মণ পৈতের ওজন!

ইতি গজর মতো করে আমি বললুম: সে যুগে চার সেরে এক মণ হত।

স্বাতি হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল: এ যে মাদ্রাজের আঙুর কেনার মতো হল। মনে নেই গোপালদা?

মনে আছে বইকি। চার আনা সের আঙুর জেনে কী আনন্দই না হয়েছিল। তারপর আধ সেরে আঙুর উঠেছিল গোটাকয়েক। পরে জানা গেল ষোল টাকার ওজন হল এক সের। বললুম: এ তোমার ষোল তোলার সের নয়। আমাদের হিসেবে প্রায় সাড়ে সাত মণ।

মামী বললেন: সত্যিই তো, সাড়ে সাত মণ পৈতের ওজন কি কম!

স্বাতি বলল: তারপর কী হল?

বাদশাহ হুকুম দিলেন যে গোপনীয় সরকারী চিঠির পেছনে লেখ সাড়ে চুয়াত্তর। যে ওই চিঠি খুলবে অন্যায় ভাবে, তার পাপ হবে চিতোরের সমস্ত মানুষ হত্যার।

মামী বললেন: নতুন কথা শুনলাম।

তখন আমরা গম্ভীরী নদীর পুলের কাছে এসে গেছি। পাকা সিমেণ্টের বাঁধানো পুল। পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত। নিচে দিয়ে এক ফালি নীল জল এঁকে বেঁকে বয়ে যাচ্ছে। পিছনে চিতোর দুর্গ সগৌরবে মাথা উঁচু করে আছে, আর ডান দিকে জয়স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট ভাবে। আমি স্বাতিকে বললুম: এই পুলটা কে তৈরি করেছে জান?

জানি না বলতে স্বাতি ইতস্তত করল না।

বললুম: সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর ছেলে খিজির খান এই পুল তৈরি করেন।

সেই খিজির খান গোপালদা, যার গল্প শুনিয়েছিলে দিল্লীতে, দেবলা দেবীর গল্প?

হ্যাঁ।

তিনি এখানে এসে পুল তৈরি করবেন কেন!

কেন করবেন না! তাঁর বাপ এসেছিলেন পদ্মিনীর জন্যে।

পদ্মিনীকে পান নি, পেয়েছিলেন শূন্য গড়। খিজির খান এই চিতোর গড়ের খবরদারি করেন দশ বছর।

গম্ভীরী নদী থেকেই চড়াই শুরু হয় নি, হয়েছে ঝালি বাও থেকে। রাণা উদয় সিংহের রাণী এখানে জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। পাহাড় এমন কিছু উঁচু নয়। চার পাঁচ শো ফুট হয়তো হবে। ঘোড়ায় টানা গাড়ি বলেই বেশি উঁচু মনে হয়। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে টাঙ্গার শ্রেণী আর টানতে পারছে না। বাঁধানো রাস্তার উপর পা টেনে চলছে। কেউ এক দিকের চাকা নামিয়েছে ধুলোর উপর। বোধহয় এতে ঘোড়ার পা ফসকাবার ভয় কম।

হঠাৎ একটা হৈ হৈ রব উঠল। কী ঘটেছে বোঝবার আগেই দেখলুম গাড়িগুলো সব রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমাদের টাঙ্গা থামল না, পাশ দিয়ে যাবার সময় যা দেখলুম, তাতে কৌতুকের চেয়ে ভয় পেলুম বেশি। চলতে চলতে একটা ঘোড়া পা মুড়ে বসে পড়েছিল। এ হল পা পিছলে যাবার ফল। বসে না পড়লে আরও কেলেঙ্কারি হত।

যে ভদ্রলোক সামনে বসেছিলেন, তিনি ছিটকে পড়েছিলেন রাস্তার উপর। উঠে দাঁড়িয়ে অবশ্য বললেন যে তিনি লাফিয়ে নেমেছেন। হাত পা খানিকটা ছড়ে গেছে, কিন্তু চোট লাগে নি। একজন মহিলাকে কিছু কাবু দেখলুম। তাঁরা দুজন পিছনে বসেছিলেন। একজনের কোমরে আঘাত লেগেছে, কিন্তু কী করে লাগল সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। পরিচয় নেই বলেই সঙ্কোচ হল।

এবারে আমাদের টাঙ্গা লাফিয়ে লাফিয়ে চলল। ছাড়িয়ে গেল আর সবগুলোকেই। আমি মামাকে লক্ষ্য করছিলুম। তিনি ক্রমাগতই টাঙ্গাওয়ালাকে উপদেশ দিচ্ছেন: আস্তে, সাবধান, হুঁশিয়ার, সামাল্‌কে। মাঝে মাঝে ক্ষেপেও যাচ্ছেন: কেয়া করতা হ্যায়! দেখতা নেহি! কিধার যাতা!

স্বাতিও বুঝি শুনতে পেয়েছিল, বলল: বাবার কথা শুনছ মা?

মামী বললেন : ওঁর ওই রকম।

পিছন ফিরে দেখলুম যে স্বাতি হাসছে। আমায় ফিরে তাকাতে দেখে বলল : তারপর গোপালদা ?

তারপর কী ?

চিতোরের কী হল ?

যা হল, ওপারে পৌঁছে তা দেখতে পাবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে স্বাতি বলল : তুমি কি রাগ করলে গোপালদা ?

তার প্রশ্ন শুনে আমি হেসে বললুম : রাগ করব কেন !

এ তো তোমার রাগের কথাই হচ্ছে।

আমি টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম : পথের ধারে যা কিছু দেখবার জিনিস পড়বে, আমাদের বলে দিয়ো।

এতক্ষণ এই মানুষটা মুখে নানা রকম আওয়াজ করতে করতেই আসছিল, আর বীরবিক্রমে চাবুক ঘোরাচ্ছিল শূন্যে। এইবারে নিজের ত্রুটির কথা বুঝতে পেরেই লজ্জিত হয়ে উঠল। একটুখানি কৈফিয়ৎ দিয়েই বলল : এই যে এইমাত্র সিঁদুর মাখানো একটা বেদী ছেড়ে এলাম, এটা হচ্ছে বাঘা রাবলকা স্মারক। প্রতাপগড়ের বাঘসিং এইখেনে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহর সঙ্গে লড়াই করে মারা গিয়েছিলেন।

আমরা একটা ফটকের নিচে দিয়ে যাচ্ছিলুম। টাঙ্গাওয়ালা বলল : চিতোরের এই প্রথম গেট, নাম পাডন পোল। পাটবী মানে প্রথম। এক সময় এই দরজার নাম ছিল পাটবন পোল।

একটুখানি এগিয়েই টাঙ্গাওয়ালা একটা রাস্তা দেখাল। বলল : এই রাস্তা ঝরনায় গেছে।

বলে ঝরনার বর্ণনা দিল। দুর্গের ভিতর যে গজমুখ আছে, তার আর এক নাম শাস বহুকে কুণ্ড। সেই কুণ্ডের জল ঝরছে এই ঝরনায়।

দ্বিতীয় দরজার নাম ভৈরো পোল। বাহাদুর শাহর সঙ্গে লড়াই করতে করতে এই দরজার উপরে প্রাণ দিয়েছিলেন ভৈরোদাস সোলাঙ্কি।

তারপরেই কল্লা ও জয়মলের সমাধি। এঁদের বীরত্বের কাহিনীও শোনাল লোকটা। শেষ হবার আগেই আমরা হনুমান পোল পেরিয়ে গেলুম। কাছেই হনুমানজীর মন্দির। আমরা এমনই করেই পার হয়ে গেলুম গণেশ পোল, জোড়লা পোল, লক্ষ্মণ পোল ও রাম পোল। এই সব পোলের পাশেই গণেশ লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্রের মন্দির। রাম পোলের কাছে আরও একটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। তার নাম পুত্তাজীকা চবুতরা। মানে পুত্তের সমাধিস্থান।

এই পর্যন্ত এসে রাস্তা সমতল হয়ে গেল। টাঙ্গাওয়ালা বলল: দুর্গের শুরু এইখান থেকে।

একে একে আমরা নেমে পড়লুম। দেখলুম যে আরও কয়েকখানা টাঙ্গা আগে এসে পৌঁছে গেছে। পিছনে আরও আসছে। টাঙ্গাওয়ালা বলল: ওই রেলিঙের ধার থেকে নিচে চিতোর শহর দেখতে পাবেন। ছবির মতো দেখাবে।

স্বাতি তার ক্যামেরায় হাত দিয়ে বলল: তা হলে ছবিও নিতে হবে।

আমরা এগিয়ে গেলুম।

পাহাড়ের উপর থেকে এবারে শহরের দৃশ্য দেখতে পেলুম। চিতোর দুর্গ থেকে চিতোর শহরের দৃশ্য। ছোট ছোট অসংখ্য গৃহে নিচের সমতলভূমি ছেয়ে আছে। দূর দিয়ে মন্থর গতিতে বয়ে যাচ্ছে গম্ভীরী নদী। কিছুক্ষণ আগে নিচে থেকে দুর্গের দৃশ্য দেখেছি। এবারে দুর্গের উপর থেকে নিচের দৃশ্য দেখলুম। স্বাতি ছবি নিচ্ছিল। মামী ডেকে বললেন: বেশি কাছে যাস নে স্বাতি।

রেলিঙের ভিতর দিয়ে গলে নিচে পড়ে যাবার বয়স যে তার

নেই, মামী সে কথা ভুলে যান। কিন্তু স্বাতি ভুলতে পারে না। উত্তর না দিয়ে শুধু হাসে।

আমি দুর্গের দৃশ্য দেখি। একেবারে পরিত্যক্ত একটা বিরাট দুর্গ। দুর্গ বললে ভুল হবে। নীচে থেকে যাকে দুর্গ বলে মনে হয়েছে, উপরে উঠে তাকে একটা পরিত্যক্ত শহর মনে হচ্ছে। একটি সমতলক্ষেত্রের উপর ছড়ানো অনেকগুলো ভাঙা বাড়ি। শুনেছিলুম যে লম্বায় এই শহরটি ছিল সাড়ে তিন মাইল, প্রস্থে মাত্র আধ মাইল। হিসেবীরা অঙ্ক কষে দুর্গের আয়তন বলেছেন ছ শো নব্বুই একর। পাহাড়ের নিচেটা ঢের বড়। তার বেড় আট মাইলের কম হবে না।

মামা বললেন: একটা গাইড পেলে মন্দ হয় না।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: তার কি দরকার হবে!

আমি উত্তর দিলুম না।

মামা বললেন: এখানে দাঁড়িয়েই যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে সারা দিন এইখানেই কেটে যাবে।

আমি লক্ষ্য করছিলুম কয়েকটা টাঙ্গাকে। সেগুলো নিজের নিজের যাত্রীদের তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল। বললুম: হাঁটতে বোধ হয় বেশি হবে না।

মামা বললেন: সেই জন্যেই তো গাইডের খোঁজ করছি। হাঁটবার দরকার না থাকলে অনর্থক হাঁটাবে না।

কিন্তু গাইডের কোন সন্ধান পেলুম না। টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেও কোন সুরাহা হল না। বলল: বোধ হয় অন্য যাত্রীর সঙ্গে ব্যস্ত আছে।

আমার মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি এল। বললুম: এখানে কোন সরকারী অফিস আছে?

আছে বইকি। এই পথ ধরে এগিয়ে যান। ডান হাতে দপ্তর দেখবেন।

সরকারী দপ্তর দেখে কী হবে?

গাইডের চেষ্টা দেখব।

টাঙ্গাওয়ালার নির্দেশ মতো এগিয়ে গিয়ে দেখলুম যে সে হল ভারত-সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিস। যে ভদ্রলোক অফিসে ছিলেন, আজমীরের মিস্টার ভট্টাচার্যের নাম নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললুম। চিতোরে নতুন অফিস খোলা হয়েছে। পুরনো বাড়িঘর সব মেরামত শুরু হয়ে গেছে। পরে একটা জাদুঘরও নাকি খোলা হবে। ভদ্রলোক নিজে থেকেই একটা লোক দিলেন আমাদের সঙ্গে। ভাল করে সব দেখাবার জন্য বিশেষ ভাবে বলে দিলেন।

এই লোকটি আমাদের অনেক যত্নে অনেক কিছু দেখিয়েছিল। মামা তার যত্নে ও পরিশ্রমে খুশী হয়ে বকশিশ দিতে চেয়েছিলেন, অনুরোধ করেছিলেন নিতে। আশেপাশের আরও অনেকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু লোকটা কিছুতেই কিছু নিল না। কেন নিল না, মামা তা বুঝতে পারলেন না। দুঃখ করে আমায় বললেন: পয়সা লোকে ফিরিয়ে দেয়, এদিকে এ আমি প্রথম দেখলুম।

আমিও বিস্মিত হয়েছিলুম।

মামা বললেন: কেন নিল না বলতে পার?

পারি নে।

উত্তর দেবার পর আমার মনে হল যে এর কারণ আমি জানি।

তুমি জান না, এ হতেই পারে না।

আমি লজ্জা পেয়ে বললুম: তার মনিব তাকে পাঠিয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী, তা জানে না বলেই হয়তো ভয়।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: বোধ হয় তাই।

এ কথা মিথ্যা হলে আমার অপরাধ হবে। আমি কেন, এমন অপরাধ সকলেই করে। মানুষের সততায় আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি।

২১

গঢ় তো চিত্তৌড় গঢ় ঔর সব গঢ়েয়াঁ।
রাণী তো পদ্মাবতী ঔর সব গধেয়াঁ॥
ঝর্ণা ঝরে গৌমুখ পড়ে, নরভে নাথ কি ঠৌড়।
ক্রৌড় যুগ তপস্যা করে, তব পাবে গঢ় চিত্তৌড়।

গড় দেখতে বেরিয়েই এই কহাবতটি শোনাল আমাদের গাইড। স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : এ ভারি অন্যায়। পদ্মাবতী ছাড়া আর সব রাণীরা কেন গাধা হবে? মীরা বাঈও তো চিতোরে রাণী ছিলেন।

আমি তাকে শান্ত করবার জন্যে বললুম : এখন আমাদের দেখবার আর শোনবার পালা স্বাতি। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ কী! মাঝে থেকে লোকটা আর কিছু বলবারই সাহস পাবে না।

মামা বললেন : তবে তপস্যার কথা ঠিকই বলেছে। মেবারের রাণারা ছাড়া এ দুর্গ আর কেউ ভোগ করতে পারে নি।

আমরা থামতেই গাইড বলল : লোকে বলে চিতোর গড় হল মেবারের রাণাদের। কিন্তু আমি কী বলি জানেন?

কী বল।

লোকটা একটু ভয়ে ভয়ে বলল : আমি বলি চিতোর হল মহারাণা কুম্ভের। দেখুন না চেয়ে, তাঁর কীর্তি বাদ দিলে এই গড়ের আর কী রইল!

এ কথা বলতে তোমার ভয় কিসের!

আমরা মূর্খ তো। যে কথা কেউ বলে না, তেমন কথা বলতে আমাদের ভয় করে।

আমার দিকে চেয়ে স্বাতি বলল : এ কথা সবাই যদি বুঝত, তা হলে পৃথিবীটা অন্য রকম হত। তাই না গোপালদা?

ঠিকই বলেছ।

গাইড বলল : ওই দেখুন ন তলা জয়স্তম্ভ, এক শো বাইশ ফুট উঁচু আর নিচে তিরিশ ফুট বেড়। ও হল মহারাণা কুম্ভের মুসলমান বিজয়ের নিশানা। ওই জয়স্তম্ভ দেখতেই তো চিতোরে আপনারা আসেন। গোটা জিনিস চিতোরে আর কী আছে!

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : আর কিছু দেখবার নেই!

গাইড বলল : নেই তা নয়, কিন্তু তা দেখবার জন্যে আপনারা আসবেন না।

একটা বড় বাড়ির মেরামতি কাজ চলছিল। বাঁশ বেঁধে বাইরেটা নতুন করে তৈরি হচ্ছে। সেই দিকে দেখিয়ে গাইড বলল : এই যে মহল দেখছেন, এও মহারাণা কুম্ভের মহল। এত দিন তো এ সব ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল। এবারে সরকার বাহাদুর মেরামত করাচ্ছেন। এর ভেতরে নাকি একটা সুড়ঙ্গ আছে, তার নাম রাণীকা ভাণ্ডার। অন্দর মহল থেকে গৌমুখ পর্যন্ত গেছে। রাণী তাঁর সহচরীদের নিয়ে ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে যাতায়াত করতেন। তারপর—

গাইড হঠাৎ থেমে গেল।

তারপর কী?

লোকটা ইতস্তত করে বলল : লোকে বলে এই মহলের ভেতর সুড়ঙ্গের মধ্যেই নাকি বিখ্যাত জহর ব্রত হয়েছিল।

আমি দেখতে পেলুম যে জহর ব্রতের নামে মামী শিউরে উঠলেন। কিন্তু গাইড থামল না, বলল : নিজের প্রাসাদ আর জয়স্তম্ভ নিয়েই মহারাণা কুম্ভ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর রাণী মীরা বাঈয়ের নাম ভারতে আজ কে না জানে!

চলতে চলতে স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আমি কিছু বললাম না।

গাইড বলল : গিরিধারী গোপালের ভক্ত ছিলেন মীরা বাঈ। রাণা বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করলেন—কুম্ভশ্যামজী। আর তার কাছেই

তুলে দিলেন মীরা বাঈএর প্রার্থনা মন্দির। কিন্তু এ মন্দিরে আজ দেবতার মূর্তি নেই।

মামী আমার দিকে চেয়ে বললেন: মীরা বাঈ কি মেবারের রাণী ছিলেন?

রাণী ছিলেন কিনা বলতে পারি না। তবে তিনি যে রাজকুলবধূ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: তার মানে?

ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন। সাধারণ ভাবে টড সাহেবের মতটাই সবাই মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে মীরা কুম্ভের রাণী ছিলেন।

আমরা সবাই তো এই কথাই জানি।

কিন্তু মেকলিফ সাহেব যে এই নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছেন।

গণ্ডগোল কিসের!

তিনি বলেছেন যে মীরার বিয়ে হয়েছিল কুমার ভোজরাজের সঙ্গে। মীরার জন্ম দেখিয়েছেন ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে আর বিয়ে তার বারো বছর বয়সে। সে সময় মেরতার রাণা ছিলেন সিং রাঠোর, তাঁর ছেলের নাম ভোজরাজ। আবার রাণা সঙ্গের ছেলের নামও ভোজরাজ। এদিকে রাণা কুম্ভের বড় ছেলের নামও ভোজরাজ। অনেকে মীরা বাঈকে এই ভোজরাজের স্ত্রী বলেই মানেন। কুম্ভের জীবদ্দশাতে এই ভোজরাজের মৃত্যু হয়। আর কুম্ভ নিহত হন তাঁর অপর ছেলে উদয়করণের হাতে। সে হল ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে একবার হাসল। বুঝতে পারলুম যে আমার দুর্বলতার কথা সে স্মরণ করিয়ে দিল। তাই চুপ করে গেলুম।

গাইড এবারে তার পুরনো কথার জের টেনে বলল: মহারাণা কুম্ভের আরও একটা নিশানা আছে।

সে কথা শোনবার জন্যে আমি আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

গাইড বলল: ভাপ্‌সি নামে একটা সংকীর্ণ স্থান আছে। লোকে তাকে ভাক্‌সিও বলে।

কী হয়েছিল সেখানে?

নিশ্চয়ই জানেন যে গুজরাট ও-মাণ্ডুর সুলতান এক সঙ্গে আক্রমণ করেছিলেন মহারাণা কুম্ভকে। মহারাণা এক লক্ষ পদাতিক ও চোদ্দ শো হাতি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। যুদ্ধে শুধু জয়লাভই নয়, মাণ্ডুর সুলতান মামুদ খিলজীকে বেঁধে নিয়ে এলেন চিতোরে। তাঁকেই এই ভাপ্‌সিতে বন্দী করে রেখেছিলেন।

পরে আমরা এই স্থানটি দেখেছিলুম। কোন মানুষের বাস একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। মনে হয়েছিল যে এই স্থানটি বোধ হয় বন্দী সুলতানের স্নানাগার ছিল। বিচিত্র নয়। অনেক দিন পরে এক ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলুম যে টার্কিশ বাথের নাম ভাপ্‌সি বা হামাম।

পথ চলতে চলতে গাইড আমাদের সব কিছুই দেখিয়ে দিচ্ছিল। গল্পও শোনাচ্ছিল সব কিছুর। ছোট একটি প্রাচীন মন্দির দেখিয়ে বলেছিল, বেইমান বনবীরের তৈরি তুলজা ভবানীর মন্দির। সেই বনবীর, শিশু উদয়সিংহকে হত্যার চেষ্টার জন্য যে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তারই সঙ্গে ধাত্রী পান্না। পরের ছেলেকে বাঁচাতে নিজের ছেলেকে পেতে দিল খড়্গের নিচে, এমন ঘটনা কি পৃথিবীর কোনও দেশে আজও ঘটেছে! এ কি রাজভক্তি, না প্রতিজ্ঞাপালন, না আর কিছু! এ কথার উত্তর কি ধাত্রী পান্নাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি! জেনে নিয়ে লিখে রাখে নি বইয়ের পাতায়, কিংবা মুখে মুখে গান গেয়ে বেড়ায় নি রাজস্থানের বিখ্যাত চারণেরা!

বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। স্বাতির প্রশ্নে চমক ভাঙল। স্বাতি বলল: বনবীর কে গোপালদা?

বনবীর যে রাণা পৃথ্বীরাজের উপপত্নী শীতলসেনীর পুত্র, সে কথা

বলতে মুখে বাধল। সংক্ষেপে বললুম: মেবারের একজন বীর সর্দার।

এমন উত্তরে স্বাতি সন্তুষ্ট হতে পারে না জানি। তবু আর কিছু বলবার চেষ্টা করলুম না। স্বাতিই প্রশ্ন করল: তাকে বেইমান কেন বলছে?

ঠিকই বলছে।

অকারণে কেন রাগ করছ বল তো?

ভারি বিপদ! ইতিহাসের গল্প বললেও বিপদ, না বললেও বিপদ। মামা আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন: বুঝলে গোপাল, বিয়ে হল দিল্লীর লাড্ডু, ও খেলেও বিপদ, দিলেও বিপদ।

কথাটা ভাল লাগল। বললুম: তা হলে খাওয়াও উচিত নয়, দেওয়াও উচিত নয়। কী বলেন?

এ যুগে সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ।

স্বাতি বলল: তোমাকে খেতেও হবে না, দিতেও হবে না। তুমি বল।

ছেলেবেলায় পড়ার বইয়ে ধাত্রী পান্নার গল্প পড় নি?

নামটা শোনা মনে হচ্ছে, কিন্তু গল্পটা মনে পড়ছে না।

কিন্তু ইতিহাসের গল্প যে!

স্বাতি বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বলল: আর কত খোশামোদ করব!

খোশামোদ তো চাই নে, বাধা না দিলেই হল।

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না দেখে আমি বনবীরের গল্প তাকে শোনালুম। রাণা বিক্রমজিৎ সংগ্রামসিংহের সাত পুত্রের একজন। কিন্তু তিনি তাঁর দুর্ব্যবহারে রাজ্যের বিশিষ্ট সর্দারদের ক্ষেপিয়ে দিলেন। একদা যে করিমচাঁদ তাঁর পিতা সংগ্রামসিংহকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর জীবনরক্ষা করেছিলেন, বিক্রমজিৎ প্রকাশ্য সভায় সেই

বৃদ্ধকে প্রহার করে তাঁর বর্বরতার পরিচয় প্রকাশ করে দিলেন। সর্দাররা মিলিত হয়ে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। ঠিক হল যে স্বর্গত রাণার শিশুপুত্র উদয়সিংহের নাবালক আমলে সর্দার বনবীর রাজকার্য পরিচালনা করবেন, আর বিক্রমজিৎ তাঁরই প্রাসাদে বন্দী থাকবেন। বনবীর প্রথমে এই দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু পরে রাজী হলেন। আরও কিছু দিন পর দেখা গেল যে তাঁর আমূল পরিবর্তন এসেছে। পাকাপাকি ভাবে গদিতে বসবার জন্য তিনি লালায়িত। এক দিন রাত্রির অন্ধকারে তিনি বিক্রমজিৎকে হত্যা করলেন। উদয়সিংহ তখন ছ বৎসরের শিশু। এবারে উদয়ের পালা। বনবীরের পথ তা হলে নিষ্কণ্টক হবে।

উদয়ের ধাত্রী পান্না তখন উদয়কে ঘুম পাড়িয়েছেন। সেই সময় অন্তঃপুর থেকে আর্তনাদ এল তার কানে। বারি এসে সংবাদ দিল, সর্বনাশ! রাওয়ালার ভিতর বিক্রমজিৎকে হত্যা করেছে বনবীর। এ দেশে নাপিতরা অন্তঃপুরে কাজ করে, তাদের বারি বলে। বুদ্ধিমতী পান্না বুঝতে পারে যে আর কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত, তারপরেই এ মহলেও সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। পাশের ঘরে একটি ফলের ঝুড়ি ছিল। আর কিছু লতাপাতা। নিদ্রিত উদয়কে পান্না তারই ভিতর শোয়াল, ঢেকে দিল লতাপাতা দিয়ে। তারপর সেই ঝুড়ি তুলে দিল বারির মাথায়। বললে, বীরা নদীর ধারে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। চিতোরের নিচে এখন গম্ভীরী নদী। বারি বললে, তুমি যাবে না? পান্না উত্তর দিল, না, আমার চন্দন আছে এখানে। চন্দন তার নিজের ছেলে। বারি বললে, চন্দনকে নিয়ে তুমিও চল না। পান্নার কণ্ঠস্বর হল কঠিন, বললে, উদয়কে বাঁচাতে হলে চন্দনকে আমার দিয়ে যেতে হবে। তুমি আর তর্ক কোরো না ভাই, তুমি পালাও।

এই হল ধাত্রী পান্না। রাজপুত নারী। সংগ্রামসিংহের রাণী কর্ণবতীর হাত থেকে যখন উদয়কে গ্রহণ করেছিলেন, তখন প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন যে তিনি নিশ্চিন্তে জহর ব্রতের উদ্‌যাপন করতে পারেন, প্রয়োজন হলে বুকের রক্ত দিয়েও উদয়কে রক্ষা করবেন। রাজপুতের কাছে নিজের বুকের রক্ত দেওয়া এমন কী কঠিন কাজ! কিন্তু আজ যে মা হয়ে ছেলের বুকের রক্ত দিতে হচ্ছে! এ কি মায়ের কাজ, না রাক্ষসীর!

কর্তব্য স্থির করতে পান্নার সময় লাগে নি। চন্দনকে তার বিছানা থেকে তুলে নিয়ে রাজকুমারের পরিচ্ছদ পরিয়ে উদয়ের বিছানায় শুইয়ে দিল। রাজপুতের ছেলে, বড় হয়ে তো রাণার জন্য নিজে থেকেই প্রাণ দেবে। সেই তার ধর্ম! আজ না হয় আগেই সে প্রাণটা দিল! কিন্তু লোকে যে তাকে রাক্ষসী বলবে! মা হয়ে নিজের ছেলেকে পেতে দিল খাঁড়ার নিচে!

কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হল না। জল্লাদের মতো বনবীর এল ঝড়ের বেগে। বললে, উদয় কোথায়? পান্নার হৃদয় উঠল হাহাকার করে। উদয় কোথায় তা বলা যায় না। উদয় যে বাপ্পা হামীর কুম্ভ সঙ্গের একমাত্র বংশধর। মেবারের রাণা বংশের শেষ প্রদীপ। উদয় গেলে এই রাণা বংশেরই দীপ নিবে যাবে চির দিনের মতো। তার জীবনের জন্য এক চন্দন কেন, শত চন্দনকেও বলি দিতে হবে প্রসন্ন মনে। পান্না পাগল নয়, রাক্ষসীও নয়। পান্না স্থির মাথায় তার কর্তব্য স্থির করেছে। বাহুতে চোখ ঢেকে আঙুল দিয়ে দেখাল উদয়বেশী চন্দনকে।

একটি মাত্র মুহূর্ত, তারপর একটি মাত্র আর্তনাদ! পান্না আশ্চর্য হয়ে গেল, তার বুক দিয়ে কোন রক্ত বেরচ্ছে না! বনবীর তো তারই হৃৎপিণ্ড উপড়ে দিয়ে গেল!

তারপর গোপালদা?

আমি কোন কথা কইতে পারলুম না। মামী আঁচল দিয়ে তাঁর চোখ মুছছেন। মামার পাইপ থেকে তামাক পড়ে গেছে। স্বাতিই আবার বলল: উদয়ের কী হল?

এর পরে আর সে গল্প ভাল লাগবে না।

তবু বল।

বারি অপেক্ষা করছিল বীরা নদীর তীরে। এক সময়ে পান্না এল সেখানে। কিন্তু উদয়কে কার কাছে রাখা যায়! আপাতত সন্দেহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না!

দেবলবাজ সিংহরাও এ ভার নিলেন না, ডুঙ্গরপুরের রাওয়াল ঐশকর্ণও দায়িত্ব নিতে নারাজ। নানা স্থানে চেষ্টার পরে কুম্ভমেরুর জৈন আশা শাহ সম্মত হলেন। তাও তাঁর মাতার আদেশে। আশা শাহর ভাগনে বলে উদয় বড় হতে লাগল।

স্বাতি বাধা দিল! বলল: বনবীরের এই জঘন্য কাজ সর্দাররা সহ্য করল?

না করে উপায় কি। প্রভুভক্ত জাত তো!

তবে বিক্রমজিৎকে কেন রাজ্যচ্যুত করল?

তিনি বাড়াবাড়ি করছিলেন।

স্বাতি ফোঁস করে উঠল, বলল: তুমি কি পাগল হলে গোপালদা! একজন সর্দারের গায়ে হাত তোলা হয় বাড়াবাড়ি, আর রাণাবংশ নির্মূল করা কোন অপরাধই নয়!

সে কথা সর্দারদেরই জিজ্ঞেস কর। আমি তোমায় টড সাহেবের লেখা গল্প বলছি।

এ কথার উত্তর স্বাতি খুঁজে পেল না।

বললুম: বনবীরের আচরণের প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন চন্দ্রাবৎ নামে এক রাজপুত বীর। মেবারের রাণার প্রসাদকে বলে ছুনা। রাজা যাঁদের সঙ্গে একত্র আহার করেন, তাঁদেরই ছুনা পাবার অধিকার। এ একটা সম্মানের ব্যাপার। রাণা হয়ে বনবীর ভাবলেন, তিনিও সর্দারদের ছুনা দেবেন এবং তা দিতে গিয়ে প্রথম দিনেই বিপত্তি। সর্দাররা তাঁর ছুনা কেন গ্রহণ করবেন!

দাসীপুত্রের ছুনা বলেই যে আপত্তি উঠেছিল, সে কথা আমি বলতে পারলুম না।

এ দিকে সংবাদ পাওয়া গেল যে বনবীরকে যে মারবে, সে গোকুলে বাড়ছে। দলে দলে রাজপুত আর সর্দাররা পৌঁছতে লাগলেন কমলমীরের কুম্ভমেরুতে। সুযোগ বুঝে বৃদ্ধা ধাত্রী পান্নাও এলেন সেই বারির সঙ্গে। উদয়সিংহের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর বনবীরের মেয়ের বিয়ে। যৌতুকের জন্য জিনিস আসছে কচ্ছ থেকে, পাঁচ শো ঘোড়া ও দশ হাজার ষাঁড়ের পিঠে। সঙ্গে এক হাজার রাজপুত। ক্রুদ্ধ সর্দাররা লড়াই করে সমস্ত ছিনিয়ে নিলেন। উদয়সিংহের বিয়েতে কাজে লাগবে বলে সমস্ত কিছু কুম্ভমেরুতে দিলেন পাঠিয়ে।

স্বাতি যে খুশী হয়েছে, তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। বলল: বনবীরের কী হল, সেই কথা বল তাড়াতাড়ি।

বললুম: যা আশা করছ, তাই হল। দুজন মাত্র সর্দার ছিলেন তাঁর পক্ষে, মাহোলী ও মালজী। কুম্ভমেরুর যে উৎসবে উদয়সিংহের রাজ্যাভিষেক হল, সেখানে তাঁরা উপস্থিত হলেন না। ফলে একজনের প্রাণ গেল যুদ্ধে, আর একজন আত্মসমর্পণ করলেন।

দেরি করলে স্বাতি বলত, আর বনবীর? আমি তাই এক নিঃশ্বাসেই বললুম: বনবীর সাহায্য করতে এসে হেরে গেলেন। সপরিবারে পালিয়ে গেলেন দক্ষিণ দেশে।

সর্দাররা পালাতে দিল?

না দিলে পরবর্তীকালে নাগপুরের ভোসলাদের জন্ম হত না ভারতের ইতিহাসে।

২২

গাইড আমাদের অনেক কিছু দেখাচ্ছে। নৌলাখা ভাণ্ডার, মানে দৈনন্দিন খরচের জন্ত ন লাখ টাকা থাকত এই ভাণ্ডারে। তারই কাছে নৌকোঠা তোপখানা, ইংরেজীতে বলে ম্যাগাজিন। মামা কথা কইলেন বৌদ্ধস্তূপ দেখবার পর। একটা ছাদহীন ঘেরা জায়গা, তার ভিতর পাথরে খোদা বৌদ্ধস্তূপ। সবই এক ধরনের, শুধু আকারে ছোট বড়। বড়গুলোও সাঁচীর মতো একটাও নয়। খুব জোর দু হাত উঁচু হবে মাটি থেকে। তবু তো বৌদ্ধস্তূপ। মামা বললেন: বৌদ্ধরা এখানে কবে এল?

জানি নে তো।

গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে মামা বললেন: বিশ্বাস করি নে।

আমি লজ্জা পেলুম। বললুম: সত্যিই জানি নে।

মামা উত্তর দিলেন না বটে, কিন্তু মুখ দেখে মনে হল না যে আমার কথা তাঁর বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে বিশ্বাস করাবার জন্ত বললুম: মেবারের ইতিহাস আমরা কতটা জানি! প্রথম দিকের সবটাই তো প্রায় কল্পনা। আজ অবশ্য একথা সবাই মেনে নিয়েছেন যে গুহিল নামে এক বীর ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই মেবার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামেই বংশের নাম হয় গুহিলোট। এই বংশের অষ্টম পুরুষ বাপ্পারাও ৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মোরি সর্দার মানসিংহকে পরাজিত করে চিতোর দখল করেন।

তারপর সাড়ে পাঁচ শো বছরের খবর আমরা জানি নে। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলজী এসে চিতোর ধ্বংস করে দখল করেন। তখন চিতোরের রাণা রত্নসিংহ। কিন্তু তিনিই পদ্মিনীর স্বামী, না ভীমসিংহ, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনেকে

বলেন যে পদ্মিনী নামে কোন রাণীই ছিলেন না চিতোরে। যাই হোক, এই যুদ্ধেই গুহিলোট বংশের প্রধান শাখা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এবারে এল আর এক শাখার শিশোদীয় সর্দার হামীর। তেইশ বছর পরে চিতোর উদ্ধার করে রাণা হয়ে বসলেন। এই বংশেই রাণা কুম্ভ, রাণা সংগ্রামসিংহ, রাণা উদয় ও রাণা প্রতাপের জন্ম। রাণা রাজসিংহের নাম করলেই মেবারের ইতিহাস বুঝি সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এঁদের ভিতর বৌদ্ধ কেউই ছিলেন না।

মামা বললেন: স্তূপগুলো আরও পুরনো বলে মনে হয়।

গাইড বলল যে বৌদ্ধদের স্মৃতি আরও এক স্থানে আছে। এখান থেকে মাইল সাতেক উত্তরে নগরী নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। সেখানে দুটি বৌদ্ধস্তূপ আর বৌদ্ধদের একটি ভাঙা বাড়ি আছে। আকবর যখন চিতোর আক্রমণ করেন তখন নাকি এই বাড়িতে তাঁর হাতি রেখেছিলেন। সেই থেকে একে হাতিকা বাড়ি বলে।

বললুম: পুরাকালে এইখানেই কোথাও মধ্যমিকা নামে একটি জায়গা ছিল। সে খ্রীষ্টের জন্মের আগের কথা। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এ সবের উল্লেখ আছে।

স্বাতির বুঝি ভাল লাগছিল না। তাই এগিয়ে গিয়ে সাত বিশ দেউড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ল। আমি বাহিরে দাঁড়িয়ে এই স্থানের পরিচয়লিপি পড়লুম। এ হল জৈন মন্দির। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে যে চিতোরে জৈন প্রতিপত্তি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সবই তার প্রমাণ। সাত বিশ দেউড়ী, শৃঙ্গার চৌরি ও কীর্তিস্তম্ভ সদম্ভে চিরকাল এই কথা ঘোষণা করবে।

খানিকটা ভিতরে গিয়ে মূল মন্দির পাওয়া গেল। একেবারে পিছনে দাঁড়িয়ে স্বাতি ছবি তুলছিল। মন্দিরের গায়ে প্রচুর কারুকার্য। নারীমূর্তি দেখলুম নানা ভঙ্গির। এমনই কারুকার্য করা মন্দিরগাত্র দেখেছি মহিসুর রাজ্যে। উড়িষ্যাতেও আছে শুনেছি।

মনে হল যে সেই সব শিল্পী এসে এই মন্দিরও নির্মাণ করেছে। একাদশ শতাব্দীর মন্দির।

দুর্গে প্রবেশের সময় আর একটি জৈন কীর্তি দেখেছিলুম। তার নাম শৃঙ্গার চৌরি। ছোট একটুখানি মন্দির। কিন্তু তার গায়েও এমনই অদ্ভুত কারুকার্য। প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দির তৈরি হয়েছে। কিন্তু গাইড বলেছিল, রাণা কুম্ভের কোষাধ্যক্ষের পুত্র ভেল্‌কা এই মন্দির নির্মাণ করেছেন ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে।

ফেরার পথে আর একটি জৈন কীর্তি দেখেছিলুম। এই কীর্তি-স্তম্ভ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। কিন্তু এখানে প্রচার যে জিজা নামে জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ের বাঘেরওয়াল মহাজন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এমনিই হয়। ইতিহাসে আর প্রবাদে অনেক তফাত। কিন্তু তাতে আমাদের ক্ষতি নেই।

পঁচাত্তর ফুট উঁচু এই স্তম্ভটি আমরা ভাল করে দেখলুম। নিচের বেড় তিরিশ ফুট, আর উপরে পনের। বিজয়স্তম্ভের সঙ্গে তুলনায় এটা অনেক ছোট। কোথায় এক শো বাইশ ফুট আর কোথায় পঁচাত্তর! কিন্তু বেড়ে সমান। স্তম্ভটি যে আদিনাথের নামে উৎসর্গ করা তার প্রমাণ আছে তার সারা গায়ে। জৈনধর্মের নানা চিত্রের সঙ্গে আদিনাথের মূর্তিও আছে কয়েক শত।

সাত বিশ দেউড়ী থেকে একটুখানি পথ এগিয়ে মীরা বাঈয়ের মন্দির। সাদাসিধে ছোট মন্দির, দেওয়ালে কোন কারুকার্য নেই। তবু আমার উড়িষ্যার মন্দিরের কথা মনে পড়ল। নাট মন্দির ও জগমোহনের পিছনে হল মূল মন্দির। এই মন্দিরেও তিনটে চূড়া আছে। কিন্তু তাকে নাট মন্দির বা জগমোহনের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। শুধু এর মূল মন্দিরটিই উড়িষ্যার স্থাপত্য রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ধরনটি যেন একই রকম।

ততক্ষণে স্বাতি মন্দিরের ভিতর থেকে ফিরে এসেছে। এসেই বলল: ভেতরে দেবতা নেই কেন গোপালদা?

চিতোর যে মীরা বাঈকেই এক সময় বিসর্জন দিয়েছিল স্বাতি, তাঁর দেবতাও সেই সঙ্গে বিদায় নিয়েছেন। উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে নাকি সেই বিগ্রহ আছে।

মামী বললেন: মীরা বাঈয়ের গল্প শুনেছি গ্রামোফোন রেকর্ডে।

স্বাতি বলল: আমি শুনি নি তো।

মামী বললেন: সে অনেক দিন আগের কথা। তোরা তখন খুবই ছোট। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মতো লোকে তখন মীরা বাঈয়ের ভজন গান গাইত। কী সুন্দর সেই সব গান, যেন আমাদের কীর্তন শুনছি।

খিলখিল করে স্বাতি হেসে উঠল। মামী লজ্জা পেলেন, কিন্তু দমলেন না। বললেন: তোমাদের আধুনিক গান আমি বুঝি না বাপু, আমাদের দিন হলে আমরা ন্যাকামি বলতাম।

মামীকে সমর্থন করবার জন্য মামা বললেন: এ কালের কবিতার মতো।

বলেই একটা কবিতার চরণ শোনালেন:

ঐ কালো দাঁড় কাকটার ধূসর ঠোঁটে
ঘামাচির মতো—

তারপরে আর মনে করতে না পেরে বললেন: বল না গোপাল, তার পরের লাইনটা কী?

আমি হেসে ফেললুম। হাসল স্বাতিও। এঁদের কাছে প্রতিবাদ করে কী হবে! মাইকেল রবীন্দ্রনাথের পরে কবি আর বঙ্কিম শরৎচন্দ্রের পর ঔপন্যাসিক এঁরা ভাবতে পারেন না। তেমনই গানের শেষ হয়েছে কীর্তন ভজনে। মীরার ভজন এঁদের ভাল লাগবে বইকি। এক দিন ভারতের সবারই তো ভাল লেগেছিল। তা না হলে লোকে বলবে কেন যে আকবর বাদশাহ তানসেনকে নিয়ে চিতোরে এসেছিলেন মীরার ভজন শুনতে। গানে মুগ্ধ হয়ে যে মুক্তার মালাটি দিয়ে গিয়েছিলেন, তার দাম ছিল দশ

লাখ টাকা। সে দিন আকবর বাদশাহ কোথায়! কোথায় মিঞা তানসেন! তবু তো লোকে এই সব গল্প তৈরি করেছে।

কিন্তু এই গল্পের আড়ালে যে খানিকটা সত্য ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ভক্তমাল গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। মনে হয় যে কোন রাজা উদাসীন বেশে এসেছিলেন মীরার কাছে। গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মীরাকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন রত্নহার। কিন্তু মীরা তা গ্রহণ করেন নি। তাই উদাসীন সেই মালা রণ্ছোড়জীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

গল্প এইখানেই শেষ হল না। রাণা কুম্ভের কানে এই সংবাদ পৌঁছল। দশ লাখ টাকার মালা কেউ গান শুনে উপহার দেয়! তবে কি মীরা—

রাণা আর ভাবতে পারলেন না। নানা সন্দেহে মন তাঁর অস্থির হয়ে উঠল। শেষে লিখে পাঠালেন, মীরা, আজ রাতে তুমি নদীতে ডুবে মর, আমি শান্তি পাব।

মীরা কহে বিনা প্রেমসে নহীঁ মিলে নন্দলালা! এই তো নন্দলালাকে পাবার সময়। গভীর রাতে মীরা নদীতে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু তাঁকে রক্ষা করলেন মীরার নন্দলালা। প্রভাতে সংজ্ঞালাভ করে দেখলেন যে তিনি নদীতটে শায়িত আছেন। মনে পড়ল তাঁর স্বপ্নের কথা। তাঁর রণ্ছোড়জী বলছেন, তোমার কর্তব্য এখনও শেষ হয় নি। তোমাকে বাঁচতে হবে। মীরা তাঁর শক্তি আবার ফিরে পেলেন, যাত্রা করলেন বৃন্দাবনের পথে।

হঠাৎ আমার গাইডের একটা কথা মনে পড়ল। সে বলছিল যে চিতোর হল রাণা কুম্ভের। কুম্ভ নির্মাণ করেছেন বিজয়স্তম্ভ, তাঁর প্রাসাদ, কুম্ভশ্যামের মন্দির, মীরার মন্দির, কিন্তু মীরাকে কে গড়ল! রাণা কুম্ভ কি মীরাকে নিজের হাতে তৈরি করে পৃথিবীকে উপহার দেন নি!

মারবাড়ের মেরতা গ্রামের সামান্য এক রাঠোর সামন্ত রতিয়া

রাণার কন্যা মীরা। রূপে অসামান্যা, আর কণ্ঠে স্বর্গের সুধা। এই সংবাদ পেয়েই তো যুবরাজ কুম্ভ গিয়েছিলেন ছদ্মবেশে, বিয়ে করে তাঁকে চিতোরে রাণী করে এনেছিলেন।

রাণা কুম্ভের নাম শুধু দেশের ইতিহাসেই নয়, সাহিত্যের ইতিহাসেও আছে। মেবারী তো রাজস্থানী ভাষারই শাখা। সাহিত্যে এই ভাষা কুম্ভই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। চারখানি নাটক তিনি লিখেছিলেন। তাতে কর্ণাটকী ও মহারাষ্ট্রী ভাষার সঙ্গে মেবারী ভাষাও তিনি ব্যবহার করেছিলেন। জয়স্তম্ভের এক পাথরের উপর এই কথা আছে খোদাই করা।

কুম্ভের পর এই ভাষার প্রথম কবি মীরা বাঈ। কিন্তু মীরাকে কবিতা লিখতে কে শেখাল! কুম্ভের হাত না থাকলে কি তাঁর রাগ গোবিন্দ কোন দিন লেখা হত, না লেখা হত গীতগোবিন্দের টীকা!

বিবাহের পর রাণা লক্ষ্য করলেন যে মীরা যেন ম্রিয়মাণ হয়ে থাকেন। বাপের বাড়িতে যে আনন্দ দেখেছিলেন মীরার অন্তরে, তার সবটুকুই বুঝি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। বিলাসে ব্যসনে তাঁর বিরাগ লক্ষ্য করেছেন, কিসে অনুরাগ তা জানা হয় নি। রাণা কবিতা লিখতেন, মীরাকেও শেখালেন কবিতা লেখা। মীরা পদ রচনা করলেন রণ্ছোড়জীর নামে। সুর দিয়ে সেই পদ গাইলেন ঃ

> প্যারে দরসন দীজ্যো আয়।
> তুম বিন রহিয়ো না যায়॥
> জল বিন কমল, চন্দ বিন রজনী
> ঐসে তুম দেখ্যোঁ বিন সজনী॥

কিন্তু ঘরের ভিতর গান গেয়ে মীরার হৃদয় পূর্ণ হল না। তিনি সকলের মাঝে কৃষ্ণনাম বিতরণ করতে চাইলেন। রাণার প্রথমে আপত্তি ছিল, পরে রাজী হলেন। এই মন্দির নির্মাণ করে দিলেন মীরাকে। বালগোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। আজ সে মূর্তি

নেই, মীরাও নেই। শূন্য মন্দির আছে চিতোরে, আর মীরা পূর্ণ করে আছেন মানুষের মন।

কী ভাবছ গোপালদা ?

মিথ্যা কথা তাকে বলতে পারলুম না। বললুম ঃ ভাবছি রাণা কুম্ভের কথা। মীরাকে তিনি ভালবেসেছিলেন! কিন্তু কোন দিন তাঁকে পান নি। তাই বোধ হয় মীরাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে তাঁর মত আছে কিনা। সানন্দে সম্মত হয়েছিলেন মীরা।

সে সময় ঝালবার রাজকুমারীর সঙ্গে মন্দার রাজকুমারের বিবাহ স্থির হয়েছিল। ঝালবার রাজের অন্য অভিপ্রায় ছিল। সে কথা বুঝতে পেরে রাণা কুম্ভ তাঁর কন্যাকে হরণ করে এনে বিবাহ করলেন। কিন্তু এ বিয়েও সুখের হল না। কুম্ভ শুধু কন্যাকেই পেলেন, পেলেন না তাঁর প্রণয়।

এক দিন ছদ্মবেশে মন্দার রাজকুমার এসেছিলেন মীরার কাছে। কিন্তু তাঁর হাত থেকে প্রসাদ নিলেন না। বললেন, একটা সাধ পূর্ণ করলে তিনি এই প্রসাদ গ্রহণ করবেন। ঝালবার রাজকুমারীকে তিনি একবার মাত্র দেখতে চান। মীরা তাঁকে অন্তঃপুরের গুপ্ত দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। সেই অপরাধে কুম্ভ মীরাকে পরিত্যাগ করেন।

একবার নয়, দুবার নয়, রাণা বার বার মীরাকে ত্যাগ করেছেন। বার বার তাঁকে গ্রহণও করেছেন। কুম্ভের জীবনে মীরা এক মস্ত পরীক্ষা। কোন দুর্বল মুহূর্তে যেমন তিনি হেরে গেছেন, তারপরেই সে ভুল সংশোধন করেছেন নিরভিমানে। কুম্ভ উদার ছিলেন, মহান ছিলেন। তাই তিনি মীরাকে উপহার দিতে পেরেছিলেন পৃথিবীকে।

স্বাতি বলল ঃ সে তাঁর দুর্ভাগ্য।

দুর্ভাগ্যই বটে।

মনে মনে আমি ভাবলুম, কুম্ভ হতভাগ্যই ছিলেন। অমন বীর ছিল না তাঁর সময়ে। গুজরাট আর মালব জয় করে মালবের সুলতানকে বন্দী করে এনেছিলেন। প্রজার দুঃখ ছিল না, অশান্তি ছিল না রাজ্যের কোনখানে। কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে তিনি কী পেলেন! শুধুই কি বেদনা!

কিন্তু মামা আমাকে ভাববার অবকাশ দিলেন না। বললেন: সেই গল্পটা তোমার মনে আছে গোপাল?

আমি মামার দিকে তাকালুম।

মামা বললেন: সেই যে বৃন্দাবনের রূপগোস্বামীর গল্প, যিনি মীরা বাঈকে দর্শন দিতে আপত্তি করেছিলেন!

কী গল্প গোপালদা?

রূপগোস্বামীর গল্প আমি স্বাতিকে বললুম। সেই বৈষ্ণব তখন কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করেছেন, স্ত্রীলোকের মুখদর্শন পর্যন্ত করেন না। কাজেই মীরাকে কাছে আসতে দিলেন না। সেই কথা জেনে মীরা লিখলেন, ঠাকুর, স্ত্রীপুরুষের ভেদ আজও বুঝলেন না, এ বড় দুঃখের কথা। বৃন্দাবনে যে একটিমাত্র পুরুষ, তিনি কৃষ্ণ, আর তো সবাই আমরা গোপিনী। রূপগোস্বামী লজ্জায় যেন মরে গেলেন। মীরাকে নিমন্ত্রণ করে এনে বললেন, তুমি আমায় জ্ঞান দিলে।

মামা বড় উপভোগ করলেন এই গল্পটি। মামীও হাসলেন অল্প অল্প। কিন্তু আমি তখনও রাণা কুম্ভের কথা ভুলতে পারি নি। বললুম: জান স্বাতি, রাণা কুম্ভের শেষ দিনগুলো কত করুণ! মীরা নেই, দ্বারকায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগল। বলছেন:

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসর না কোই।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নাহি কোই॥

এদিকে রাণা রোগশয্যায়। এক কুচক্রী ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করে তাঁর হত্যার ব্যবস্থা করছেন। শেষ পর্যন্ত রোগে তাঁকে মরতে হল না। মরলেন তাঁর এক পুত্র উদার হাতে। পিতাকে হত্যা করে সেই পশু আজ অমর হয়ে আছে।

স্বাতি তার বেদনার্ত দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে ধরল। তার কণ্ঠ বুঝি রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মামী বললেন : বেলা বড় তাড়াতাড়ি বাড়ছে, একটু পা চালিয়ে দেখতে হবে।

স্বাতি বলল : আমাদের গাইড লোকটা পা চালাতে জানে।

সত্যিই তাই। একটা দ্রষ্টব্য সম্বন্ধে বলার কথা শেষ করেই আর এক জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়। ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলে তাকেই হারিয়ে ফেলতে হবে। এই ভয়ে আমরাও তার পিছনে ছুটছি। অনেক সময় আঙুল দিয়েও দেখিয়ে দেয় অনেক জিনিস, বলে, তেমন কিছু দ্রষ্টব্য নয়।

এমনই করে মন্দিরও দেখলুম অনেক।—কুম্ভশ্যামজীর মন্দির, সামনে গরুড় মূর্তি। সমিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির। লোকে বলে মালবরাজ ভোজ এই মন্দির নির্মাণ করেন, আর সংস্কার করেন রাণা মুকুল। এই মন্দিরে তিনটি শিলালিপিও আছে। তাতে দেখা যায় যে আজমীরের চৌহানরাজা আর্যরাজকে পরাজিত করে গুজরাটের চালুক্যরাজা কুমারপাল এসেছিলেন চিতোরে। অদ্ভুতজী শিবের মন্দির। মন্দিরের বিরাট মূর্তির জন্যই শিবের এই নাম। ধীরে ধীরে সবই যেন ভেঙে পড়ছে! অন্নপূর্ণার মন্দির রাণা হামীরের তৈরি মহালক্ষ্মীর মূর্তি। নিকটেই বনমাতার মন্দির। তারপর কুকড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির। টড সাহেব নাকি এক শিলালিপিতে পেয়েছিলেন যে অষ্টম শতাব্দীর এক রাজা এক মন্দির আর কুণ্ড নির্মাণ করেছেন। আজ তার অবশিষ্ট একটি স্তম্ভ মাত্র আছে। বাকি সবটুকু রাণা কুম্ভের তৈরি।

কালিকা মাতার মন্দিরে আমাদের অনেকটা সময় কাটাতে হল। সুদূর চিতোরে কালী মন্দির দেখতে আশ্চর্যই লাগে। লোকে বলে,

একদা এই মন্দির ছিল সূর্যের। সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি। কালীর পাশে দুর্গার মূর্তিও আছে।

আমরা বাহির থেকে মন্দিরের গঠনরীতি দেখছিলুম। মনে হল যে সংস্কারের সময় এর পরিবর্তন হয়েছে অনেক। তবু যেন বৌদ্ধ যুগের কিছু স্থাপত্য রীতি রয়ে গেছে।

মন্দিরে নিত্য পূজা হচ্ছে। যাত্রী আসছে নানা মানসিক নিয়ে। আমার সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। যিনি তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে এখানে আসছিলেন জাতকের প্রথম কেশ দান উৎসর্গের সংকল্প নিয়ে। গাইড বলল : প্রতি বৎসর বৈশাখে এখানে মেলা হয়।

মামা মামী ভিতরে কী করছিলেন জানি নে. একটু সময় নিয়ে বাহিরে এলেন।

গাইড বলল : চলুন এবারে পদ্মিনীর মহল।

এই মন্দিরে আসবার আগে আমরা জয়স্তম্ভ দেখেছিলুম। রাণা কুম্ভের ভারত-বিখ্যাত জয়স্তম্ভ, চিতোরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এই স্তম্ভ দেখে ফার্গুসন সাহেব এর তুলনা করেছিলেন ট্রজানের স্তম্ভের সঙ্গে। বলেছিলেন রোমের চেয়ে এর স্থাপত্যরুচি আরও উঁচু দরের।

দূর থেকেই স্বাতি বলছিল যে জয়স্তম্ভের উপরে উঠতে হবে।

মামা আপত্তি করে বলেছিলেন : কী দরকার ওপরে ওঠবার।

আমি তাঁর আপত্তির কারণ অনুমান করতে পারি। নিজে উঠবেন না তাঁর দৈহিক বাধার জন্য। ভারী শরীর নিয়ে ওঠা নামা করতে তাঁর কষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের উঠতে দিতে বাধা অন্য কারণে। এই সব স্মৃতিস্তম্ভ কি আজকের। রাণা কুম্ভ মাণ্ডুর সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই জয়স্তম্ভ তৈরি হয়েছে তার দশ বছর পরে। মানে আজ থেকে প্রায় পাঁচ শো বছর আগে। এ তো রেলের পুল নয় যে মাঝে মাঝেই পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর ভিতরের অবস্থা শুধু

ভগবানই জানেন। ভেঙে পড়লে তাঁকে দায়ী করে তো আর ক্ষতিপূরণ মিলবে না! মামা তাই প্রথমেই আপত্তি করেন।

কাছে পৌঁছেই স্বাতি বলল : এ তেমন বেশি উঁচু নয়, তাই না গোপালদা?

মামা বললেন : কমই বা কী।

স্বাতি আমার দিকে চাইল। মানে, উচ্চতা বলতে হবে। কিন্তু না জিজ্ঞাসা করলে আমি কিছুই বলব না। শেষ পর্যন্ত তাকে বলতে হল : দিল্লীর কুতুব মিনারের চেয়ে কি বেশি উঁচু হবে?

বললুম : ঠিক আধখানা।

স্বাতি চমকে উঠেছিল। বললুম : ঠিকই বলছি। কুতুব মিনার হল দু শো আটত্রিশ ফুট, আর এই জয়স্তম্ভ মাত্র এক শো বাইশ।

মনে হল স্বাতি আমার কথা বিশ্বাস করল না। নটা তলা নিচে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে! কুতুব মিনারের তুলনায় কি এ স্তম্ভ এতই ছোট! বলল : তা হলে তো ন তলা বাড়ির মতোই হল।

একটু থেমে বিমর্ষ ভাবে বলল : তবে আর উঠে কী হবে!

আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে উপর থেকে সমস্ত চিতোরের একটা চমৎকার দৃশ্য দেখা যাবে, কিন্তু সে কথা বলবার সুযোগ পেলুম না। মামা বললেন : চল চল, এগিয়ে চল।

আঁকাবাঁকা পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে গাইড এগিয়ে গিয়েছিল। আমরাও সেদিকে এগিয়ে গেলুম। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকে বাঁধানো ঘাট। পাহাড়ের ভিতর এক অদ্ভুত সরোবর! বাঁ হাতে শ্যামল গাছপালা গম্ভীর ছায়া বিস্তার করে আছে, দক্ষিণে দুর্গের প্রাচীর। লক্ষ্য করে দেখলুম যে সিঁড়ির শেষ ধাপে জল পড়ছে কল কল করে। খানিকটা বাঁধানো জায়গা। তার উপর কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, আর নিচে জল ঝরার শব্দ। পায়ের চটি খুলে আমি জলে নেমে গেলুম। বড়

স্নিগ্ধ শীতল জল, স্বাতিও নামল। গাইড় বলল: হুঁশিয়ার, বড় পেছল জায়গা।

নিচে নেমে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। যে স্থানটি ঘরের মতো, তারই ভিতর পাথরের বাঁধানো মুখ। সেইখান থেকে জল ঝরছে। পাহাড়ের ঝরনার জল। এই কুণ্ডকে এরা গৌমুখ বলে। কেউ বলে শাস বহু কা কুণ্ড। শাশুড়ি বউ এর কুণ্ড। এক সময় এর নাম ছিল মন্দাকিনী।

এই সব স্থান দেখতে আমরা যত হেঁটেছি, তার চেয়ে বেশি চড়েছি টাঙ্গায়। এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে টাঙ্গা এগিয়ে যায়। আমরা পায়ে হেঁটে খানিকটা দেখে আবার গিয়ে টাঙ্গায় বসি। কালিকা মাতার মন্দির থেকেও আমরা টাঙ্গায় বসে পদ্মিনীর মহলে এলুম।

টাঙ্গা থেকে নেমেই স্বাতি বলল: কী কী দেখা হল মনে আছে তো গোপালদা ?

কিছু আছে বইকি।

কুম্ভের মহল ছাড়িয়ে যে সুন্দর সাদা দোতলা বাড়িটা দেখলুম, তার নাম কী ?

গাইড বাংলা বোঝে কিনা জানি না। জবাব দিল: ফতে প্রকাশ।

এমন ঐতিহাসিক জায়গার ভেতর বাড়িটা কেমন খাপছাড়া ঠেকল, তাই না গোপালদা ?

লাগবেই তো। বাড়ির বয়স যে মাত্র পঞ্চাশ বছর।

ছ লাখ টাকা খরচ করে রাণা ফতেসিং এই বাড়ি কেন তৈরি করলেন, আমি তার কারণ ভেবে পাই নি। নব্বুই লাখ টাকার জয়স্তম্ভের একটা মানে আছে।

আর কী দেখলাম বল তো ?

গাইড উত্তর দিল তৎপর ভাবে, বলল: মহাসতী, সূর্যকুণ্ড,

পুত্তজীকা মহল, জয়মলজীকা হাবেলী, চিত্রঙ্গ মেরী কা তালাও, লাখোটা বাড়ি, রাণা রতনসিংকা—

মামা বললেন : থাম থাম. সব গুলিয়ে গেল। এগুলো কি দেখেছি, না দেখতে বাকি আছে ?

কিন্তু গাইড আমাদের দাঁড়িয়ে গল্প করবার পাত্র নয়। সে ততক্ষণে রাস্তা ছেড়ে ফুলের বাগানের ভিতর ঢুকে পড়েছে। রুক্ষ খটখটে মাটি। তাতে অপরিসীম পরিশ্রমে ফুলের চাষ হচ্ছে। সূর্য তখন মাথার উপর। এই রোদের নিচেই মালিরা জল বয়ে এনে গাছের গোড়ায় ঢালছে। কিছু পাতার গাছ, ফুলের গাছও আছে অনেক। স্থানে স্থানে মরসুমী ফুল ফুটে আছে।

স্বাতি বলল : পদ্মিনীর মহলে আজ দেখবার কী আছে ?

আমি জল মহলের কথা বলতে যাচ্ছিলুম। ছোট জলাশয়ের ভিতর একটা ক্ষুদ্র প্রাসাদ। প্রাসাদ নয়, কয়েকখানা ঘর। ডাঙায় হলে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি বলতুম। জলের ভিতর বাড়ি তৈরির প্রয়োজন সে যুগে ছিল। বিদ্যুতের পাখা ছিল না, রেলে চড়ে পাহাড়ে যাবারও উপায় ছিল না দুরন্ত গ্রীষ্মে। পয়সা থাকলে তৈরি কর হাওয়া মহল কিংবা জল মহল। দরজা জানলা খুলে দিয়ে পাথরের মেঝেতে শুয়ে এয়ার কণ্ডিশনের স্বপ্ন দেখ। সিংহল-রাজকন্যা পদ্মিনী তাই দেখতেন। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই গাইড বলল : খানকয়েক আয়না আছে।

এই আয়নায় রাণী পদ্মিনীর রূপ দেখে পাগল হয়েছিলেন দিল্লীর বাদশাহ, আলাউদ্দীন খিলজী তাঁর নাম। কিন্তু পদ্মিনীর খবর তাঁর কানে পৌঁছল কেমন করে ? পণ্ডিতেরা বলেন, পদ্মিনী নামে কি কেউ ছিলেন যে খবর পৌঁছবে ? জিয়াউদ্দীন বরণী লিখেছেন তারিখ-ই-ফিরোজশাহী। তাতে চিতোর অবরোধের গল্প আছে, নেই পদ্মিনীর কাহিনী। কবি আমির খসরু তো খিলজী বাদশাহরই সভাকবি ছিলেন। ফলাও করে লিখেছেন দেবলা দেবীর কথা।

পদ্মিনী নামে যদি কোন রাণীই থাকবে তো তাঁর কথা কেন লিখবেন না!

অন্য দল মুখ নেড়ে বললেন, না লেখার মানে কি নেই হল! নিজামউদ্দীন আউলিয়া বড় সাধু। তাঁরই বংশের শিষ্য হলেন মালিক মুহম্মদ জৈসি। তাঁর লেখা পদ্মাবত পড়ুন।—

সরবর রূপ বিমোহা হিই
হিলোর করেই।
পাউ ছুয়ই মকু পাবই এহি মিস
লহরই দেই।

এ তো পদ্মিনীরই কথা। পদ্মিনীর রূপের বর্ণনা। অতি প্রাচীন দেশজ ভাষা বলেই আজ বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। রাজস্থানী ডিঙ্গল ভাষাতেও পদ্মিনীর কাহিনী আছে। বইয়ের নাম খোমান রাসো। পদ্মিনীকে নিয়ে আরও কে কে বই লিখেছেন রাজোয়াড়ার পাতায় তার সম্পূর্ণ বিবরণ পাবেন।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন পিয়ারী বেগমের কথা। দিল্লীতে পাঠান বাদশাহ আলাউদ্দীন খাসমহলের ছাদে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে পিয়ারীর গান শুনছেন—আজ চিতোরের অন্তঃপুরে যে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে, তার দোসর কোথা! জগতে তার জুড়ি কই! ধন্য রাণা ভীমসিংহ। জয় রাজরাণী, চিতোরের রাজ-উদ্যানের প্রফুল্ল পদ্মিনী! আলাউদ্দীন বললেন, পিয়ারী, আমার ইচ্ছে করে পদ্মিনীকে এই খাসমহলে নিয়ে আসি। পিয়ারী বেগম হেসে বললেন, শাহেনশা, আমার সাধ যায়, আকাশের চাঁদটাকে সোনার কৌটোয় পুরে রাখি।

পর দিনই আলাউদ্দীন লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোর অবরোধে চললেন। এ এক অদ্ভুত অবরোধ। যুদ্ধ নেই বিগ্রহ নেই, হুমকি হামলাও নেই। দিল্লীর সমস্ত ফৌজ এসে চিতোরের চারি দিকে ছাউনি ফেলে বসে আছে। কাণ্ড দেখে চিতোরের রাণা নিজেও আশ্চর্য

হয়েছেন। দূত পাঠালেন বাদশাহর কাছে, ব্যাপার কী জানবার জন্য। বাদশাহ বললেন, কোন শত্রুতা নেই, কোন অভিসন্ধিও নেই, শুধু পদ্মিনীকে চাই। পদ্মিনীকে পেলেই অবরোধ তুলে উঠে যাব।

তারপর আবার সব শান্ত, দুপক্ষেই চুপচাপ। দিন যায়, মাস যায়, বছরও গেল ঘুরে। চিতোরের লোক তবু বাহিরে আসে না। আলাউদ্দীন রোজই আশা করেন যে এবারে তাদের খাবার ফুরোবে, দরকার হবে বাহিরে আসবার। তবু কারও দেখা নেই আর আপত্তি দেখা দিয়েছে নিজের ফৌজদের ভিতর। তারা আর মরুভূমিতে পড়ে থাকবে না, তারা দিল্লী ফিরবে।

এমনই সময় বুদ্ধি এল বাদশাহর মাথায়। বলে পাঠালেন, পদ্মিনীকে একবার দেখতে পেলেই ফিরে যাবেন। মুখোমুখি না হোক, আয়নায় দেখলেও হবে। তারপর যুদ্ধ নয়, বিগ্রহ নয়, হুমকি-হামলাও নয়। লক্ষ্মী ছেলের মতো সমস্ত সৈন্য নিয়ে ফিরে যাবেন। রাণা রাজী হলেন।

গাইড বলল : এই তো সেই মহল, আর এই সেই আয়না।

জল মহলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল : পদ্মিনী ছিলেন ওই মহলে, আর তাঁর ছায়া পড়েছিল এই ঘরের এই আয়নাখানিতে।

এ কথা স্বাতির বিশ্বাস হল না। কী করে হবে! আমার দিকে চেয়ে বলল : বুঝলে গোপাল দা, এমনি একটা ক্যামেরা থাকলে বাদশাহকে এত হাঙ্গামা করতে হত না। কী বল!

বলে নিজের ক্যামেরা খুলে জল মহলের ছবি তোলায় মন দিল।

আমার মনে হল যে মানুষ দিনে দিনে অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে। সামান্য ব্যাপারেও আজ মানুষের অবিশ্বাস। কিন্তু চির দিন ভারতের এমনটি ছিল না। মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করত, শত্রুকেও। নিরস্ত্র আলাউদ্দীন খিলজী সেদিন তাঁর লক্ষ লক্ষ সেনা বাহিরে রেখে শত্রুর দুর্গে এসেছিলেন পরম নিশ্চিন্তে। অতিথির অমর্যাদা করবে না হিন্দু বীর, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। ভীমসিংহ সেই বিশ্বাস তাঁর রেখেছিলেন।

নিজেও যখন বাদশাহকে এগিয়ে দিতে পাহাড়ের নিচে নেমে আসছিলেন অসতর্ক ভাবে, তাঁর মনেও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। কিন্তু ধূর্ত পাঠান তাঁর সংকল্প রক্ষা করেন নি। দু শো ঘোড়সওয়ার লুকিয়ে রেখেছিলেন নিচে। তারা ভীমসিংহকে বন্দী করে শিবিরে নিয়ে এল।

আলাউদ্দীন ভেবেছিলেন যে পদ্মিনী এবার ধরা দেবেন। এই তো হিন্দু নারীর ধর্ম। স্বামীর জন্য তারা প্রাণ দেবে, দরকার হলে বাদশাহর বেগমও হবে। তাই পদ্মিনীর কাছ থেকে বেগম হবার প্রস্তাব যখন এল, আলাউদ্দীন একটুও বিস্মিত হলেন না। এ ছাড়া যে পদ্মিনীর আর কোন উপায় নেই, এ বিশ্বাস বাদশাহর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিল।

কিন্তু পদ্মিনী একা আসবেন না। তাঁর কিছু সখী তাঁরই সঙ্গে দিল্লীতে যাবেন। আর কিছু তাঁকে পৌঁছতে আসবেন বাদশাহর কাছে। তাঁদের যেন মর্যাদাহানি না হয়। তাঁরা যেন নির্বিঘ্নে আবার চিতোরে ফিরে যেতে পারেন। গোঁফে তা দিয়ে বাদশাহ বললেন, তথাস্তু।

পর দিন সাত শো ডুলি এল বাদশাহর শিবিরে, তারই মধ্যে সোনার চতুর্দোলা। ভীমসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পদ্মিনী যাবেন বাদশাহর কাছে। কিন্তু কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, বাদশাহ টের পেলেন না। পদ্মিনী নেই, ভীমসিংহও নেই। সাত শো ডুলিও ফিরে গেছে। যারা আছে, তারা বড় বড় রাজপুত বীর।

স্থানে স্থানে বাধা পেয়ে আলাউদ্দীন যখন চিতোরে পৌঁছলেন, ভীমসিংহ তখন নাগালের বাহিরে। মাথা নিচু করে বাদশাহ দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

মামী বললেন: তোমাদের আজ ক্ষিধে পায় নি?

ঘড়ির দিকে চেয়ে মামা চমকে উঠলেন, বললেন: তাই তো, অনেকক্ষণ আগেই আমাদের ফেরা উচিত ছিল।

টাঙ্গায় উঠবার সময় খানিকটা দূরে আমি যেন একটি চেনা মানুষকে দেখতে পেলুম। সেই রাজস্থানী বউটি, যাকে শান্তিদির সঙ্গে ট্রেনের কামরায় দেখেছি সারা রাত। কয়েকজন রাজস্থানী মেয়ের সঙ্গে জটলা করছে। একা একা মেয়েটা এখানে কী দেখতে এসেছে! জহর ব্রতের আগুন! সে তো অনেক দিন আগেই নিবে গেছে। পদ্মিনীকে হারিয়ে দিল্লী ফিরে যাবার তেরো বছর পর আবার আলাউদ্দীন চিতোরে এসেছিলেন। চিতোরকে শ্মশানে পরিণত করে অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কিন্তু পদ্মিনীকে পান নি। চিতোরের মাটিতে সেই প্রথম জ্বলেছিল জহর ব্রতের আগুন। তারপর আরও দুবার। সতীদাহের আগুনও আজ নিবে গেছে। এই বিধবা মেয়েটা আজ এখানে কী দেখছে!

গাইডকে বিদায় দেবার আগে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম: গোরা বাদলের কোন সমাধি এখানে নেই?

স্বাতি হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল: গোরা বাদল কে গোপালদা?

দুজন সিংহলী। রাণী পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক।

ইতিহাসের কথা স্বাতির মনে পড়ল কি না জানি না। আমার মুখের দিকেই চেয়ে রইল। বললুম: অনাথ ভাইপো বাদলকে কোলে নিয়ে গোরা এসেছিলেন পদ্মিনীর সঙ্গে। সেই পদ্মিনীর জন্যেই প্রাণ দিয়েছিলেন প্রভুভক্ত গোরা। তাদের বীরত্বের কাহিনী চিতোরের ইতিহাস থেকে কোন দিন মুছে যাবে না।

চিতোরে আর আমরা দেরি করি নি। শুধু পাহাড় থেকে নামবার সময় মামা কিছু দেরি করিয়ে দিয়েছেন। স্থানে স্থানে উৎরাই বড় খাড়া, ঘোড়ার পা পিছলে যায় বারে বারে। আর বারে বারে মামা তাড়া দেন: আস্তে, সাবধান, হুঁশিয়ার, সামাল্‌কে।

ইচ্ছে থাকলেও টাঙ্গাওয়ালা জোরে চালাতে পারে নি। একেবারে পাহাড় থেকে নিচে নেমে তবেই ঘোড়া ছুটতে পেরেছে।

স্টেশন থেকে দুর্গে যাতায়াতের দুটো পথ আছে। একটা শহরের ভিতর দিয়ে, আর একটা বাহির দিয়ে। কথাটা ঠিক পরিষ্কার হল না। বললে ভাল হত যে শহরটাকে এড়িয়েও চিতোরের দুর্গে ওঠা যায়। আমরা এক রাস্তায় গিয়েছিলুম, ফিরলুম অন্য রাস্তা দিয়ে।

চিতোরে হোটেল ধর্মশালার সন্ধান আমরা করি নি। তার দরকার ছিল না। স্টেশনে খাবার জায়গা আছে। সেখানেই বলে এসেছি। উদয়পুরের গাড়ি ছাড়বে দুপুরবেলাতেই। রিটায়ারিং রুমে একটুখানি গড়িয়েই ট্রেনে ওঠা যাবে।

খেয়েদেয়ে মামীর মনে পড়ল রাণার কথা। বললেন: ছেলেটার খুবই ইচ্ছে ছিল আমাদের সঙ্গে বেরবার।

মামা পাইপে আগুন ধরাচ্ছিলেন। বললেন: কোন্ ছেলেটার কথা বলছ?

ছেলে আমরা আবার কটা চিনি!

সে কথা সত্যি! নিজেদের ছেলে নেই বলে তো যাকে তাকে ছেলে বলে ভাবতে পারেন না, সে কথা মামার বোঝা উচিত। মামা বুঝেও ছিলেন, বললেন: হুঁ।

মামী বোধ হয় আজ আর শোবেন না। তাই বিছানার উপর বসে বললেন: ভারি দুঃখ হয় ছেলেটার জন্যে।

কেন?

কেন আবার! পূজোর সময়েও কয়েকটা দিন ছুটি পেল না, কষ্টের কথা নয়!

মুখে খানিকটা ধোঁয়া নিয়েই মামা বললেন: ছুটি পেল না, না ছুটি নিল না! কোন্‌টা ঠিক?

কী বললে!

উত্তরে মামা একটুখানি হাসলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মামী বললেন: কিছু জান যদি তো খুলেই বল না।

মামা বললেন: জানবার আবার দরকার কী. এ সব বুঝতেই পারা যায়।

মামী দৃঢ় ভাবে প্রতিবাদ জানালেন, বললেন: রাণা আমাদের তেমন ছেলে নয়।

তেমন ছেলে নয় বলেই তো মুশকিল হয়েছে।

উত্তর দিতে মামাকে একটুও ভাবতে হল না। আরও খানিকটা ধোঁয়া টেনে বললেন: তেমন হলে কোন ভাবনাই ছিল না।

মামার কথাগুলো আজ হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছিল। মামী ভাল বুঝতে পারলেন না, বললেন: যা বলবার খুলে বল। অমন রেখে ঢেকে আধখানা করে বোলো না।

মামা বললেন: এই গোপালকে দেখ, ওর সম্বন্ধে কিছু ভাববার দরকার আছে কি!

আমি অস্বস্তি বোধ করলুম আমার নিজের কথা উঠে পড়তে দেখে। বাধা দিয়ে বললুম: আমাকে এর ভেতর কেন টানছেন!

মামা বললেন: কেন টানব না!

মামীরও এ কথা ভাল লাগে নি, বললেন: তুমি রাণার কথাই বল।

মামা কিন্তু আমার কথাই বললেন: গোপাল যা ঠিক করে বসে আছে, সে তা করবেই। তুমি আমি মাথা খুঁড়লেও নিজের মত বদলাবে না।

মামাকে আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলুম: ছি ছি, আপনি এ কী বলছেন!

ঠিকই বলছি। কী মতলব নিয়ে তুমি কেরানিগিরি করছ, আমি জানি না। কিন্তু কিছু একটা যে মতলব আছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।

ভাবলুম জিজ্ঞাসা করব, কেন হয়েছেন। কিন্তু তা পারলুম না।

মামা বললেন: পয়সার জন্যে নিশ্চয়ই চাকরি করছ না। তা করলে জ্ঞানশঙ্করের পোষ্যপুত্র হয়ে অনেক পয়সা পেতে। আর নিজের রোজগার! তার জন্যে ভাল কিছু করবার যোগ্যতা তোমার আছে।

যোগ্যতা থাকলেই কাজ পাওয়া যায় না মামাবাবু। ভাল কিছু পেলে তো করব!

ছাই করবে।

তাড়াতাড়ি আমি বললুম: আপনি আমায় ভুল বুঝছেন।

ভুল কি তোমায় নতুন বুঝছি, গোড়া থেকেই তো তোমায় ভুল বুঝে এলুম।

এ মামার রাগের কথা। আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মামা বললেন: দিল্লীতে তুমি সবাইকে বোকা বানালে।

তারপরেই হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। বললেন: বেশ করেছ, বড় অহংকার ওদের। বুদ্ধির অহংকার। আমি খুশী হয়েছি খুব।

মামী জানতে চাইলেন: কার কথা বলছ?

ওই তোমাদের নীতীশ বাঁড়ুজ্জের কথা।

একটু থেমে বললেন : দিল্লীতে তার ঘনিষ্ঠতা দেখে আমি ভুল করেছিলুম। কিন্তু গোপাল চালাক ছেলে, সে ভুল করে নি।

কী বলছ এ সব ?

ঠিকই বলছি। এত দিন এ সব বলি নি বলে ভেব না যে আজ নতুন কথা ভাবছি।

তারপরেই সমস্ত গল্পটা আমাদের খুলে বললেন : এলাহাবাদে গোপাল নামল কিনা, সেই খবর নিতে গিয়েই জেনে গেলুম। জ্ঞানশঙ্করের কাছ থেকেই সব জানলুম। গোপাল পোষ্যপুত্র হতে রাজী হয়ে দিল্লী যাবে বলল, অমনি সে খবর দিয়ে দিল নীতীশ বাঁড়ুজ্জেকে। কেন দিল, সেই কথাটিই শুধু জানাল না। সরকারী মহলে গোপালের প্রতিপত্তি চেয়েছিল, না তাঁর মেয়েকে চেয়েছিল বউ করে, তা এখনও বুঝতে পারি নি। কিন্তু কিছু একটা চেয়েছিল।

কিংবা তোমাকেই ভয় পেয়েছিলেন।

আমাকে ! আমাকে ভয় পাবে কেন !

মামা যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

লোক তো তুমিও সুবিধের নও।

মামা এবারে হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন, বললেন, ঠিক বলেছ। গোপালের খবর তাকে আমিই দিলুম, আর আমাকেই পাবে ভয় !

মামী এ কথার উত্তর দিলেন না। কিন্তু স্বাতি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল।

স্বাতির হাসিটা মামা দেখে ফেললেন, বললেন : এই মেয়েটা গোপালকে কিছু চিনেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকালুম মামার মুখের দিকে।

মামা বললেন : স্বাতি গোড়াতেই আমাকে বলেছিল যে এ সবই গোপালের ছল। বোকা পেয়ে সবাইকে নাচাচ্ছে।

স্বাতি তৎপর ভাবে তার আপত্তি জানাল: আমি তোমাকে এই কথা বলেছিলাম।

কী বলেছিলে তা তো মনে নেই, তবে তার মানেটা এই রকম বুঝেছিলুম।

একটু ভেবে বললেন: গোপাল আসবার আগেই তো বলেছিলে যে এমন প্রস্তাবে সে রাজী হবে না। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার মর্যাদা জ্ঞান অনেক বেশি টনটনে।

স্বাতি বলল: অহঙ্কার বল।

অহঙ্কার তো মর্যাদা জ্ঞানেরই।

এ প্রসঙ্গটা বন্ধ করবার জন্য বললুম: রাণাবাবুর কথা কী বলছিলেন?

মামা এর উত্তর দিলেন না, বললেন: খানিকটা সন্দেহ অবশ্য স্বাতিরও ছিল। দিল্লীতে তার হাবভাব দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তবু বলেছিল, এলাহাবাদে গোপাল নামবে না। তার কথা সেদিন পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি বলেই জ্ঞানশঙ্করকে চিঠি লিখেছিলুম।

এবারে স্বাতির দিকে চেয়ে আমি হাসলুম।

রাণা ও মিত্রা ব্যানার্জি সাহেবের পুত্র-কন্যা। জ্ঞানশঙ্করবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার গ্রহণ না করে মিত্রাকে আমি নিষ্কৃতি দিয়েছি। চাওলা বুদ্ধিমান ছেলে, সে এই কথাই ভাবে। কিন্তু স্বাতি অন্য কথা বলে। বলে, মিত্রাকে আমি হারিয়েছি। তাকে পাবার চেষ্টা কোন দিন করেছিলুম কিনা, সে কথার জবাব দিতে সে নারাজ। রাণার কথা স্বতন্ত্র। বোনের সঙ্গে বেড়াতে এসে সে বিপদে পড়েছে। এমন একটি মেয়েকে তার ভাল লাগল, যার মনের গড়ন বড় দৃঢ়। স্বাতির কাছ থেকে তো সাড়াই পাচ্ছে না, উৎসাহ পাচ্ছে না বাপের কাছেও। যেটুকু প্রশ্রয় সে পেয়েছে, তা শুধু মেয়ের মায়ের কাছেই। মামী তাকে সুপাত্র মনে করেন। যে কোন মেয়েরই মা তাই করবেন। কিন্তু মামা! মামাকে আজও আমি চিনতে পারি নি।

কিন্তু স্বাতি বলে, পেরেছি। কেন বলে, তা আমি জানি। তাঁকে না চিনলে আমি এত দূর ছুটে আসতুম না। আমি কি মামার জন্যই আসি! হাসি পায় তার কথা শুনে।

মামা অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া নিচ্ছিলেন মুখে। এক সময় মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বললেন: এবারে আমাদের সঙ্গেই তো দিল্লী ফিরবে। ফিরে একবার দেখা কোরো শীতীশের সঙ্গে।

বলে পরম কৌতুকে রসিয়ে রসিয়ে হাসলেন।

মামী বিরক্ত হয়ে বললেন: তুমি রাণার কথা বল। সে ছেলে যে আবু পাহাড়ে এসে বসে থাকবে, তার জন্যে কী ভেবেছ?

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: আসবে তো ঠিক!

কেন আসবে না! সে নিজের মুখে বার বার বলে গেল। তার কথার কি কোন মূল্য নেই!

তেমনই গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: সেটা কি তার বাপের কথা, না তার নিজের? নিজের হলে আসতে পারবে না।

কেন?

বলেছি তো, রাণা গোপাল নয়। গোপাল হলে কোন সন্দেহ করতুম না।

আবার আমার কথা! তাড়াতাড়ি বললুম: আমাদের ট্রেন আজ কটার সময়?

সে কথার উত্তর কেউ দিলেন না। আমিই আবার বললুম: টাইম টেবলটা কোথায়?

টাইম টেবল মামার অ্যাটাচি কেসের মধ্যে, তা সবাই জানে। আমিও জানি। মামা তাই আমার প্রশ্ন উপেক্ষা করে বললেন: যদি বাপ তাকে আসতে দেয়, তবেই আসবে। তার নিজের আগ্রহে আমার সন্দেহ আছে।

এই পিতৃভক্তির প্রশংসা যে যুগে ছিল, সে যুগ আজ গত হয়েছে। আজ স্বেচ্ছাচারিতার যুগ। ছেলেমেয়ে বড় হতে না হতেই পিতা-

মাতাকে অগ্রাহ্য করে। ভাবে যে তাদের জন্মের জন্য যারা দায়ী, তাদের লালনের নৈতিক দায়িত্বও সেই পিতামাতার। স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে স্বাধীন মতবাদ পোষণ করবে, তাদের স্বাধীন চলায় হস্তক্ষেপ করবার কারও কোন অধিকার নেই। ভাল না লাগে চুপ করে থাক। খারাপ লাগে, পাঠিয়ে দাও বোর্ডিঙে। খরচ বন্ধ করলে চলবে না।

রাণার মতো ছেলে আজও আছে। সংসার তাদের গাধা বলে। বাপকে অগ্রাহ্য করে স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখালে তা বলত না। কিন্তু মামার মতো পুরনো লোক কেন এ কথা বলছেন! তার গলদটা কোথায়!

হঠাৎ আমার মনে হল যে গলদ তার চরিত্রে নয়, গলদ তার বুদ্ধিতে। তার বাপকে আজও সে চিনতে পারে নি। সে ভদ্র-লোককে চিনতে পারলে তার কর্তব্য স্থির করতে একটুও সময় লাগত না। একটা পথ তাকে বেছে নিতে হত। সেইটে সে পারে নি বলেই মামার চোখে সে ছোট হয়ে গেছে। রাণা তো এখনও ছেলেমানুষ নয়, তার পৌরুষকে প্রতিষ্ঠা করবার যথেষ্ট বয়স তার হয়েছে।

মামীকে বড় বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে রাণা আসবে। কিন্তু মামার কথায় সেই বিশ্বাসে আজ আঘাত লেগেছে।

অনেকক্ষণ থেকে বাহিরে কোলাহল শুনতে পাচ্ছিলুম। এবারে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম যে একখানা ছোট ইঞ্জিন কয়েকখানা খালি গাড়ি নিয়ে টানাটানি করছে। আর যাত্রীরা প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে সেই গাড়িগুলোর ভিতর ওঠবার চেষ্টা করছে। ঘরের ভিতর ফিরতেই মামা বললেন: কিসের গোলমাল গোপাল?

বললুম: যাত্রীর। গাড়িতে আজ ভিড় হবে।

মামা চিন্তিত হয়ে বললেন: জায়গা পাব তো!

আমার পিছনে স্বাতিও বাহিরে বেরিয়েছিল। সে এসে বলল: সেই দলটাও যাচ্ছে গোপালদা।

কোন্ দলটা ?

স্বাতি হেসে ফেলল উত্তর দেবার সময়। বলল : টাঙ্গা থেকে যাঁরা পড়ে গিয়েছিলেন।

ব্যস্ত ভাবে মামা বললেন : ওরাই তো একটা গাড়ি দখল করবে। তা হলে আমাদের উপায় !

মামী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : উপায় একটা হবেই।

মামা বিরক্ত হয়ে বললেন : হয়েছে। গাড়ি কি রিজার্ভ করা আছে যে গিয়ে উঠলেই হল !

শুধু কয়েক ঘণ্টার পথ। বিকেল বেলায় বেড়ানোর মতন। তার জন্যও এত ভাবনা এঁদের। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক চলে নির্ভাবনায়। এক গাড়িতে যাবে ভেবে আর এক গাড়িতে যায়। এক দিন যাবে ভেবে আর এক দিন যেতে বাধ্য হয়। লাঠির মাথায় বোঁচকা বেঁধে পায়ে হেঁটে বাড়ি ছাড়ে। কয়েক ঘণ্টার পথ পায়ে হেঁটে রেলের স্টেশন। ট্রেন সেখানে এক মিনিট দাঁড়াবে। সেই এক মিনিটের ভিতর ছেলেকে তুলবে, বউকে তুলবে, তারপর নিজে। সঙ্গে জিনিস থাকলে তাও তুলতে হবে এক মিনিটের মধ্যে ! চব্বিশ ঘণ্টায় একখানি ট্রেন সব স্টেশনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যায়। কলকাতার বাসের মতো তার অবস্থা। প্রথম চেষ্টাতেই উঠতে পারবে, এমন ভরসা কেউই রাখে না। উঠতে পারলে কৃতার্থ মনে করে জীবন। এই তো ভারতের রেলযাত্রা।

বললুম : আমি দেখছি।

মামা কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন : তাই দেখ। সময় হলে আমাদের ডেকে নিয়ো।

কিন্তু আমাকে ডাকতে হল না। আমার দেরি দেখে নিজেরাই বেরিয়ে এলেন। উদয়পুরের গাড়ি ছিল ওধারের প্ল্যাটফর্মে। জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই এসে উপস্থিত হলেন। বললুম : রোদে যে আপনাদের দাঁড়াতে হবে।

কেন ?

প্রথম শ্রেণীর অবস্থা আমি তাঁকে দেখালুম। ভিড় তৃতীয় শ্রেণীর চেয়েও বেশি। মামা বললেন : কী হবে তা হলে !

আর একখানা গাড়ি লাগাবার ব্যবস্থা করেছি।

দু একজন অপরিচিত ভদ্রলোক কাছেই ছিলেন। তাঁদেরই একজন বললেন : ধন্যি আপনাকে। আমরা রেলের লোক হয়ে কিছু পারলুম না, আর আপনি কি না—

বাধা দিয়ে বললুম : এ আপনাদের অক্ষমতা নয়, এ ভারতীয় চরিত্রের মাহাত্ম্য।

মামা আশ্চর্য হলেন আমার কথা শুনে। ভদ্রলোক দুজনও হলেন। তাই বুঝিয়ে দিলুম আমার কথাটা। বললুম : আপনাদের দেশী ভাষায় যখন আপনাদের অসুবিধার কথা বলছিলেন, তখন আমি বাইরে থেকে তা শুনছিলুম। আমি তাই ইংরেজীতে তার কৈফিয়ত তলব করলুম। বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, একখানা কামরায় রিজার্ভড্ লেবেল ঝুলছে!

তাই নাকি !

দুজন ভদ্রলোকই খুব বিস্মিত হলেন।

বললুম : এ বড় দুঃখের কথা। গোলামি মনোবৃত্তি এখনও আমাদের গেল না ! পরস্পরকে সাহায্য করতে আমরা চাই নে, নিজের স্বার্থ নিয়েই মশগুল হয়ে আছি।

বুঝতে না পেরে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বললুম : দুর্নীতি দমনের ভয় দেখিয়েছিলুম ইংরেজীতে।

খিলখিল করে স্বাতি হেসে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ছোট একখানা গাড়ি জোড়া হল। প্রথম শ্রেণীর গাড়ি। তারই একটি কামরায় মামাদের তুলে দিয়ে আমি নিজের জন্য একটুখানি জায়গা দেখতে নামলুম। কে একজন বললে, এ গাড়ি মালভি জংশন পর্যন্ত যাবে। মামা বিচলিত হয়ে ডাকলেন আমাকে, বললেন: শুনছ গোপাল, কী বলছেন এঁরা!

আমি আবার খবর নিলুম রেলের কর্মচারীদের কাছে। তাঁরা আশ্বাস দিলেন যে গাড়ি উদয়পুর পর্যন্তই যাবে। কিন্তু মামার তাতে শান্তি হল না। বললেন: একটু খেয়াল রেখ গোপাল, শেষটায় একটা বেয়াড়া জায়গায় না পড়ে থাকি।

সেজন্যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন: তাই তো আছি।

এই সঙ্গে রিটায়ারিং রুমের জন্যও বলে দিলুম। দুখানা ঘর চাই। একজন কালো কোট পরা কর্মচারী আমাদের নামধাম টিকিটের নম্বর লিখে নিয়ে বললেন, এখুনি তিনি ব্যবস্থা পাকা করে রাখছেন, সেখানে পৌঁছে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। এই কর্মচারীটির অজ্ঞতার কথা অনেক দিন আমাদের মনে থাকবে।

আমি অন্য গাড়িতে যাবার জন্য পা বাড়ালুম। মামা আপত্তি করলেন না। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালুম। একখানা গাড়ির ভিতর থেকে শান্তিদির ডাক শুনতে পেলুম: কোথায় যাচ্ছেন!

ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম: উদয়পুর।

শান্তিদি হেসে বললেন: সে তো জানি।

আমি অপ্রতিভ ভাবে বললুম: তবে জিজ্ঞাসা করছেন কেন!

আমি কি তাই জানতে চেয়েছি! কোথায় যাচ্ছেন মানে কোন্ গাড়িতে। সোজা কথায়, আমি এইখেনে, এই গাড়িতে আসুন।

বলেই হাসতে লাগলেন আগের মতো।

লজ্জা পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি শান্তিদির গাড়িতেই উঠে পড়লুম। মেয়েদের গাড়ি নয়, তবে আরও দু চারজন মেয়ে চলেছেন। শান্তিদির কাছাকাছি একটুখানি জায়গা সংগ্রহ করে বসে বললুম: সেই বউটি কোথায়?

চিতোরে তাকে দেখেন নি!

দেখেছি বইকি। কিন্তু তাকে কি ফেলে এলেন?

শান্তিদি হেসে বললেন: আমি তো তাকে ডেকে আনি নি যে ফেলে আসব! সে এসেছে নিজের ইচ্ছেয়, থাকবার জন্যেই এসেছে।

কোথায় থাকবে, কার সঙ্গে থাকবে!

শান্তিদি বুঝি আমার অজ্ঞতা দেখেই হাসলেন। বললেন: যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই বা কার কাছে থাকত!

এ সব কথা আপনি বুঝি জানতে চান নি!

জানতে চাইলেই তা বলছে কে, আর বললেই বা বুঝবে কে!

তা সত্যি। আমরা বাঙলা দেশের মানুষ। বাহিরের মানুষের সঙ্গে পরিচয় আমাদের কতটুকু যে তাদের ভাষায় সুখ দুঃখ বুঝব আপনার জনের মতো। বড় দেশের এই তো বিপদ! মানুষে মানুষে প্রভেদ কিছুতেই ঘোচে না।

শান্তিদি হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন: বউটির মুখ আপনি দেখেছিলেন?

বললুম: ঘোমটার আড়ালে একটুখানি দেখেছি।

মুখের পোড়া দাগটা বুঝি দেখতে পান নি!

এই প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠলুম। বললুম: পোড়া দাগ!

হ্যাঁ। মনে হয়েছিল সদ্য পোড়া। কী করে পুড়ল আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে মেয়েটা শুধু জ্বল গিয়া বলেই চুপ করে গেল।

একটু থেমে শান্তিদি বললেন : তার হাতে পায়েও আমি পোড়া দাগ দেখেছিলাম।

তাঁর কথা শুনে মনে হল, আমিও বুঝি এই সব পোড়া দাগ দেখতে পেয়েছি। চোখ বুজে দেখতে লেলুম, মেয়েটা তার স্বামীর সঙ্গে চিতায় গিয়ে উঠেছিল। কিন্তু পুড়ে মরতে পারে নি। আধখানা জ্বলবার পর নেমে এসেছে চিতার উপর থেকে। বুকের ভিতরটা আমার ঢিপঢিপ করে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে বললুম : আপনি কি মনে করেন—

কথাটা আমি শেষ করতে পারলুম না।

শান্তিদি বললেন : সন্দেহ করি বইকি !

কী সাংঘাতিক সন্দেহ ! মেয়েটা কি তাই যাচ্ছে চিতোরের মেয়ে দেখতে ! সেখানকার যে মেয়েরা প্রয়োজনের সময় পুড়ে মরতে পারত হাসিমুখে, সেই মেয়ে।

শান্তিদি অনেকক্ষণ আর কথা কইতে পারলেন না। আমিও নীরব থেকে তাঁকে চিন্তার অবকাশ দিলুম।

মেয়েটা কেন মরতে চেয়েছিল ! শোকে, না অন্য কোন কারণে ! অন্য কারণ কী হতে পারে ! অভাব ! অভাবের কথা মনে হতেই আমি শান্তিদিকে জিজ্ঞাসা করলুম : কোথা থেকে সে আসছিল তা কি জানেন ?

জায়গাটার কী নাম বললে মনে নেই। কিন্তু সে যে মরুভূমির দেশ, এইটুকুই শুধু মনে আছে। জলের বড় কষ্ট, অভাব খাদ্যের।

এ দেশের লোকেরও কি খাদ্যের অভাব আছে ! অনাহারে মারা যায় তারা ! বাঙলা দেশে যাদের আমরা দেখতে পাই, তাদের দেখবার পর এ কথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। ওরাই তো আমাদের মেরে ফেলছে অনাহারে, মেরে ফেলছে বিষ খাইয়ে। নিজের দেশে এরাও তা হলে মরে ! কিন্তু কে মারে এদের !

আমার পাশে এক রাজস্থানী ভদ্রলোক ছিলেন। বাঙলা যে

তিনি বুঝতে পারেন, তা বোঝা গেল তাঁর কথা শুনে। বললেন: জয়সলমের হল মরুভূমির মাঝখানে।

আজমীরের পথে লাল সাহেবের মুখে মরুভূমির গল্প শুনেছি। যোধপুর বিকানের ও জয়সলমের হল রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তিনটি বিরাট রাজ্য। এই ভূখণ্ডকে রাজস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হয়েছিল। পশ্চিম থেকে থর মরুভূমি দিনে দিনে এগিয়ে আসছে। কে একজন বলেছিলেন যে মরুভূমির এই অগ্রগতি রুখতে না পারলে ভারতের রাজধানী দিল্লীরও পরিত্রাণ নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম: সে কি জয়সলমেরের মেয়ে!

লজ্জিত ভাবে ভদ্রলোক বললেন: কার কথা বলছেন, তা তো জানি নে। মরুভূমির নামেই জয়সলমেরের নাম বললুম।

যোধপুর বিকানেরও তো শুনেছি মরুভূমির রাজ্য।

ঠিকই শুনেছেন। তবে ও দুটো নাম তো আপনাদের মনে থাকে। যা থাকে না, তাই আপনাদের বললুম।

আপনার দেশ কোথায়?

অনুমান করুন।

আপাতত কলকাতার বড়বাজার।

আশ্চর্য হয়ে ভদ্রলোক বললেন: কী করে বুঝলেন! আপনার সঙ্গে তো আমি বাঙলায় কথা বলি নি!

এবারে আপনার দেশ বলুন।

রাজস্থানের ভেতর বর্ষা যেখানে সব চেয়ে সুন্দর, সেখানেই আমার দেশ।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক সুর করে বললেন:

সিয়ালো তো খাটু ভলো, উনলে অজমের।
জোধাণো নিতরো ভলো, শাবণ বীকানের॥

বুঝতে কষ্ট হল না যে তাঁর দেশ বিকানের। কেন না শ্রাবণ মাস বিকানেরেই ভাল। ছড়াটা কোথাও শুনেছিলুম কিনা তা মনে পড়ল না। কিন্তু ভদ্রলোক আমায় মানে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: নাগর জেলার খাটু ভাল শীতকালে, আর গরমে আজমের। শ্রাবণে বিকানের ভাল, কিন্তু যোধপুর ভাল সব ঋতুতে।

বললুম: শুনেছি তো ওধারে বৃষ্টির পরিমাণ বছরে মাত্র কয়েক ইঞ্চি। বর্ষার কী সৌন্দর্য দেখব সেখানে ?

ভদ্রলোক তখনই উত্তর দিলেন, বললেন: কয়েক ইঞ্চি বলবেন না। বলুন চার থেকে সাত ইঞ্চি। তবু বলব, শ্রাবণে একবার বিকানেরে আসুন।

তখন আমি শান্তিদির দিক থেকে এই ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বসেছি। খুশী হয়ে ভদ্রলোক বললেন: বিকানের আপনি দেখেন নি, তাই না!

শুধু বিকানের নয়, মরুভূমির ধার দিয়েও যাই নি।

মারবাড় জংসন থেকে একবার চলে যাবেন। চিতোর আর উদয়পুর নিয়েই তো রাজস্থান নয়, দেখবার অনেক কিছু সেখানেও আছে।

থাকবেই তো।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন: এই বিকানেরের কথাই ধরুন না কেন। দিল্লী থেকে মাত্র দু শো সাতাশ মাইল পথ, আজমেরের চেয়ে কিছু বেশি। কিন্তু এমন অনেক জিনিস দেখতে পাবেন, যা দিল্লীতে নেই, আজমেরেও না।

তাই নাকি ?

এই যেমন উটের গাড়ি। জয়পুরে উট দেখেছেন, কিন্তু উটের গাড়ি নিশ্চয়ই দেখেন নি।

আমি স্বীকার করলুম যে তা সত্যিই দেখি নি।

ভদ্রলোক ভাল করে আমাকে উটের গাড়ি বোঝালেন

বললেন: একা দেখেছেন তো, কতকটা তেমনি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক উঁচু, বসবার জায়গাটা কাঠের রেলিঙে ঘেরা। মানে, পড়ে যাবার ভয় নেই। সামনে ঘোড়ার বদলে উট। নতুন যা লাগবে, তা হচ্ছে গাড়োয়ান গাড়িতে না বসে বসবে উটের পিঠে, দু ধারে পা ঝুলিয়ে।

ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি গঙ্গা রিসালার নাম শুনেছেন?

না।

ভদ্রলোক বললেন: গঙ্গা রিসালার ইংরেজী নাম ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ক্যামেল কোর। রাজার উটবাহিনী। চীনে সোমালিল্যাণ্ডে যুদ্ধ করেছে, মিশরেও লড়াই করেছে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়।

বিকানেরের ইতিহাসও শোনালেন ভদ্রলোক। বললেন: সে প্রায় পাঁচ শো বছর আগের কথা। বিকা নামে এক রাঠোর রাজপুত এই শহর পত্তন করেন। বর্তমান দুর্গ তার প্রায় এক শো বছর পরে তৈরি। পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এই শহরের পরিধি সাড়ে চার মাইলের কম হবে না। শিবের মন্দির মসজিদ জৈন উপাশ্রয়, সবই আছে। ভাল ভাল বাড়ি আছে। গঙ্গানিবাস, লালগড়। আপনারা শিক্ষিত লোক। বিকানেরের লাইব্রেরি আপনাদের সব চেয়ে ভাল লাগবে। সেখানে সংস্কৃত ও পার্সী বই বহু আছে।

শেষের কথাকটির ভিতর কিছু বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল মনে হল। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই বললেন: বড় মূর্খ আমরা। দূর থেকেই আমরা লাইব্রেরি দেখি।

তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললুম: কাছ থেকে দেখেই বা আমরা কী করছি!

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: তা বটে!

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: এ দেশে বুঝি লাইব্রেরি নেই?

ভদ্রলোক নিজেকে তখন সামলে নিয়েছেন। বললেন: আমাদের জন্যে লাইব্রেরি রেখে কী হবে! তবে দেখবার মতো লাইব্রেরি দেখেছিলুম জয়সলমেরে। একবার একটা কাজ নিয়ে সেখানে গিয়েছিলুম। দুর্গম জায়গা বলব না। যোধপুর ছাড়িয়ে পোকারন তখন রেলের শেষ স্টেশন। তারপর মোটরে প্রায় সত্তর মাইলেরও বেশি পথ। তবে এখন শুনছি ট্রেনেই জয়সলমের যাওয়া যাচ্ছে।

ভদ্রলোক বোধহয় পথে কষ্ট পেয়েছিলেন। সে কথা এখনও ভুলতে পারেন নি। আমি তাঁকে ভোলাতে চেষ্টা করে বললুম: লাইব্রেরি কেমন দেখলেন?

লাইব্রেরি! ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন: জিনভদ্র জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আমরা লাইব্রেরিই বলব। জৈন মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত এই ভাণ্ডারে প্রায় হাজার দেড়েক পুঁথি আছে। তার ভিতর শ চারেকের বেশি হবে তালপাতার পুঁথি। দশম শতাব্দীর আগেরও পুঁথি আছে অনেক।

একই নিঃশ্বাসে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: এক একখানা পুঁথি কত বড় আকারের জানেন?

জানি নে তো!

প্রায় দু হাত লম্বা। এই সব তালপাতা আসত ইন্দোনেশিয়া থেকে। কালো কালিতে নাগরী অক্ষরে লেখা হত।

এ সবই কি জৈন ধর্মের বই?

তা কেন হবে! সব রকমেরই বই আছে, সব শাস্ত্রের। কিন্তু এর চেয়ে বেশি আমি বলতে পারব না।

কেন বলুন তো!

ভদ্রলোক হেসে বললেন: আমি ব্যবসাদার মানুষ, শাস্ত্রের খবর আমি কতটুকু রাখি!

মনে হল যে আমি তাঁর কোন ক্ষত স্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি বললুম: শহরে আর কিছু দেখবার নেই?

ভদ্রলোক বললেন: তেমন কিছু মনে পড়ছে না। আট শো বছর আগে এই শহরের পত্তন করেন রাওল জয়সল। অল্প উঁচু এক পাহাড়ের ওপর শহর আর দুর্গ। মহারাওয়ালের প্রাসাদ এই দুর্গের ভেতর। বাইরে দু একজন ধনীর হাভেলি আছে, তাও দেখবার মতন।

একই নিঃশ্বাসে বললেন: মরুভূমির মধ্যে শহর দেখতে হয় তো যোধপুরে যান। যোধপুরের ওপর দিয়েই তো জয়সলমের যেতে হয়, একদিন থাকবেন যোধপুরে। রাজস্থানের সবচেয়ে বড় রাজ্য মারবাড়ের রাজধানী এই যোধপুর। রাজ্য বড় হলে কী হবে, বেশির ভাগই মরুভূমি আর বালির পাহাড়! এক সময় মণ্ডরে ছিল মার-বাড়ের রাজধানী। পাঁচ শো বছর আগে রাও যোধা তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন যোধপুরে, মাত্র মাইল পাঁচেক দক্ষিণে। যোধপুরে গেলে পুরনো মণ্ডর দেখতেও ভুলবেন না। অমন সুন্দর বাগান ভারতবর্ষে কম আছে।

ভদ্রলোক থামলেন। কিন্তু আমি থামতে দিলুম না, বললুম: মণ্ডরে কী আছে দেখবার?

দেখবার অনেক কিছুই আছে। রাজাদের সমাধি-স্থান, বিশেষ করে মহারাজ অজিত সিংহের সমাধি ঠিক মন্দিরের মতো দেখতে। পুরনো একটা ভাঙা দুর্গ। শোনা যায়, কোন বৌদ্ধ শিল্পী এই দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু ও সবের চেয়ে আপনার ভাল লাগবে তেত্রিশ কোটি দেবতার মন্দির। সাহেবরা বলেন, হল অব হিরোজ। একখানি পাথর থেকে খোদাই করা বিরাট মূর্তি, ষোলটি রাজপুত বীর।

ভদ্রলোক আমাকে যোধপুরের গল্পও শোনালেন। বললেন: যোধপুরের দুর্গ হল রাজস্থানের ভেতর সেরা। ছোট একটা খাড়া পাহাড়ের ওপর দুর্গ, তার ভেতর রাজার প্রাসাদ। রাস্তা উঠেছে ঘুরে ঘুরে। সাতটা বড় বড় গেট, তার মধ্যে প্রধান হল জয় পোল

আর ফতে পোল। জলাশয়ও আছে অনেক। গুলাব সাগর, পদম সাগর, রাণী সাগর।

ভদ্রলোক আমাকে বিমানঘাঁটির কথাও বললেন। কিন্তু বললেন না দেশের মানুষদের কথা। জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলুম যে মানুষের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তিনি পান নি। আমার মনে হল যে ভদ্রলোক আমার মনের কথাই প্রকাশ করলেন: ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। মানুষ না দেখলে কি দেশ দেখা হয়! ভাল করে দেশ দেখতে হলে কেবল দুর্গ আর রাজার প্রাসাদ দেখলে চলে না। যেতে হয় বাজারে, মন্দিরে আর প্রমোদ ভবনে—যেখানে মানুষের মিছিল। জাদুঘরে বা চিড়িয়াখানায় কোন দেশের পরিচয় থাকে না, থাকে মানুষের ভিড়ের ভিতর। মানুষকে এড়িয়ে গিয়ে আমি অভিজ্ঞতাকে দূরে ঠেলে রেখেছি'।

শান্তিদির গলা শুনতে পেয়ে চমকে উঠলুম। শান্তিদি বললেন: উদয়পুরে কোথায় উঠবেন?

বললুম: আমরা স্টেশনেই থাকব।

শান্তিদি আর কোন কথা বললেন না।

আমি বললুম: আপনি?

শান্তিদি হেসে উত্তর দিলেন: জানি নে।

তাঁর উত্তর শুনে আমি লজ্জা পেলুম। প্রশ্নটা করাই আমার উচিত হয় নি। আমার মনের ভাব লক্ষ্য করে শান্তিদি বললেন: ওই কচি বউটা চিতোরে একা রয়ে গেল, আর আমি একটা রাত একা কাটাতে পারব না!

কেন পারবেন না!

কিন্তু সেই বউটির কথায় আমার আর একটা কথা মনে পড়ল। তার পোড়া মুখ আর পোড়া হাত পায়ের কথা। সেই সঙ্গেই শান্তিদির পায়ের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি চমকে উঠলুম। শান্তিদির সাদা ধবধবে দু পায়ে সাদা রবারের চটি। কিন্তু ওকি! পায়ের চামড়া কেন অমন টেনে আছে! ওটা কি পোড়ার দাগ নয়!

২৬

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, শান্তিদি তাঁর পা-দুখানা বেঞ্চির নিচে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। কী করে তাঁর পা পুড়ল তা জানতে চাইবার সুযোগ তিনি দিলেন না। বললেন: জানেন গোপালবাবু, শুনেছি চিতোর গড়ের মতো হামির গড় নামেও একটা জায়গা আছে।

হামির গড়ের নাম আমি শুনি নি তো!

সেই বউটিই বলছিল। হামিরের নামে হামির গড়। আর সব কী বললে, বুঝতেই পারলাম না।

রাণা কুম্ভ নাকি মেবার রাজ্যে চুরাশিটা গড় নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাদের সবগুলোর নাম আমি শুনি নি। কুম্ভল গড়ের খুব নাম শুনেছি। উদয়পুরের মাইল চল্লিশেক উত্তরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর এই দুর্গটি। এক ধারে তরঙ্গায়িত আরাবল্লী পাহাড়, অন্য ধারে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। চিতোরের পরেই কুম্ভল গড়ের নাম। আরও দু একটা নাম শুনেছি—মণ্ডল গড়, ভঁয়সারোদা গড়! কিন্তু হামির গড়ের নাম শুনি নি। পাশের ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখে আমি বললুম: আপনি শুনেছেন হামির গড়ের নাম?

ভদ্রলোক বললেন: হামির গড় নামে একটা স্টেশনের নাম জানি। আজমীর থেকে চিতোরে আসবার পথে ছোট স্টেশন। চিতোর থেকে কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে হবে।

খুব বড় গড় বুঝি!

কোন গড় আছে কিনা তা জানি নে। তবে হামির যে একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন সে কথা মানি।

হামিরের নাম আমারও জানা। তাঁর জন্মবৃত্তান্তের জন্যই ও নাম আমার চির দিন মনে থাকবে, মনে থাকবে তাঁর বিবাহের জন্যও। ঐতিহাসিক তাঁর নাম মনে রেখেছে অন্য কারণে। সে হল চিতোর উদ্ধার। রাণা বংশ মেবারে প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম চিতোর হারালেন রাণা লক্ষ্মণ সিংহ। সাড়ে ছ শো বছর আগের ঘটনা। দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীন খিলজীর সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। চিতোরে চিন্তাক্লিষ্ট রাণা দুঃস্বপ্ন দেখলেন। চতুর্ভুজা দেবী করালীমূর্তি ধারণ করে রাজরক্ত চাইছেনঃ ম্যয় ভুখা হুঁ। রাণার বারোটি ছেলে। অরি সিংহ বড়, ছোট অজিত সিংহ। স্থির হল যে অজিত সিংহ সপরিবারে কৈলবারার দুর্গে আশ্রয় নেবেন বংশরক্ষার জন্য, আর বাকি সবাই রাজরক্ত দিয়ে দেবীর ক্ষুধা পূরণ করবেন। প্রথম দিন যুদ্ধে যাবার আগে অরি সিংহ একটি চামড়ার থলি দিয়ে গেলেন অজিত সিংহের হাতে। তার ভিতর একখানি ছোরা ও একটি পত্র। অরি সিংহ বললেন, প্রয়োজন হলে খুলো। দীর্ঘ দিন পরে কৈলবারার দুর্গে এই থলি খোলবার প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল। সেদিন তাঁব চিঠিখানিও পড়া হয়েছিল রাজসভায়। উজলা গ্রাম থেকে হামির নামে এক তরুণ তার মাকে নিয়ে এসেছিল কৈলবারার দুর্গে। রাজপুত চাষার মেয়ে লছমী নাকি রাণী আর তার ছেলে হামির রাজপুত্র। যুবরাজ অরি সিংহের ছেলে।

সত্য কথা। সহচর নিয়ে অরি সিংহ মৃগয়ায় গেছেন। ক্লান্ত হয়েছেন বুনো শুয়োরের পিছনে ছুটোছুটি করে। কিন্তু মারতে পারেন নি। সেই শুয়োরকে মেরে আনল একটি রাজপুত চাষার মেয়ে। নাম লছমী। মেয়েটির হাতে জনারের শীষ দেখে যুবরাজ জানতে চাইলেন, কী দিয়ে মারলো শুয়োরটা! মেয়েটি হেসে তার বল্লম দেখাল, সেই জনারের শীষ।

উজলা গ্রামের আমবাগানে তাঁর তাঁবু পড়েছে। এক সময়

হঠাৎ একটা ঘোড়া আর্তনাদ করে বসে পড়ল। সবাই দেখল, সেই মেয়েটা ক্ষেতের ভিতর থেকে ঢিল ছুঁড়ে পশু পাখি তাড়াচ্ছে। তারই একটা ঢিল এসে ঘোড়ার পায়ে লেগেছে।

তারপর আর একটি ঘটনা। যুবরাজ যখন চিতোরে ফিরছেন, তখন আবার সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা। মাথায় দুধের কলসী আর দু হাতে দুটি মোষের গলার দড়ি ধরে মেয়েটি চলেছে। এক অনুচরের খেয়াল হল, মেয়েটিকে জব্দ করা চাই। এমন ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল যেন তার মাথার কলসী যায় পড়ে। মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল। তাই তার মাথার কলসী পড়ল না, পথের উপর গড়িয়ে পড়ল সেই অনুচর নিজেই। কায়দা করে মোষের গলার দড়ি ঘোড়ার পায়ে বাধিয়ে দিয়েছে।

এই সমস্ত ঘটনার ফল হল সুদূরপ্রসারী। যুবরাজ অরি সিংহ মুগ্ধ হয়েছিলেন লছমীর তেজস্বিতা দেখে। এবারে তার পাণিপ্রার্থী হলেন। বৃদ্ধ চাষা প্রথমে রাজী হয় নি। চন্দাসো বংশের সেই চৌহান রাজপুত তার কন্যাকে কোন দরিদ্র রাজপুতের ঘরে সর্বময় কর্ত্রী দেখতে চেয়েছিল, রাওয়ালায় রাণীর ভিড় বাড়াতে চায় নি। কিন্তু গৃহিণীর কথায় আর প্রতিবেশীদের উসকানিতে শেষ পর্যন্ত তাকে সংকল্প বদলাতে হল। লছমীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মেবারের যুবরাজ অরি সিংহের।

আলাউদ্দীন পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যেদিন অরি সিংহ প্রাণ দিলেন, হামিরের বয়স সেদিন এক বছর। নিশ্চিন্তে সে তার মায়ের কাছে দাদামশায়ের আশ্রয়ে মানুষ হচ্ছে। সেই হামির মাকে নিয়ে তার কাকার কাছে এসেছে। কাকা তাকে দাদার দেওয়া চামড়ার থলি দিলেন, সেই ছোরা আর সেই চিঠি। চিঠি পড়ে দেখা গেল যে অরি সিংহ লিখেছেন মেবারের উত্তরাধিকারের কথা। অজিত সিংহের পর হামির যদি মেবারের সিংহাসন প্রত্যাশা করে তা হলে সর্দাররা যোগ্য রাজকুমারকেই যেন নির্বাচন করেন।

ভীল সর্দার মুঞ্জের অত্যাচারে মেবার তখন জর্জরিত। মুঞ্জ ডাকাত। কৈলবারার দুর্গ থেকে রাজমুকুট কেড়ে নিয়ে গেছে ডাকাতি করে। অজিত সিংহ বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর বড় ছেলে আজিম সিংহ মারা গেছেন, সুজন সিংহ ছোট ছেলে। শক্তিমান, কিন্তু নেশাখোর। মুঞ্জকে শাসন করতে অসমর্থ হয়েছেন। রাণা বললেন, রাজমুকুটসুদ্ধ মুঞ্জর মাথা যে কেটে আনতে পারবে, তাকেই তিনি রাণা বলে স্বীকার করবেন।

হামির সেই অসাধ্যসাধন করলেন। মুঞ্জর তাজা রক্তে তিলক পরিয়ে দিয়ে অজিত সিংহ হামিরকে রাণা বলে বরণ করলেন।

তারপর হামিরের বিবাহ। সেও এক অদ্ভুত ঘটনা। মালদেব নামে এক রাজপুতকে চিতোরে বসিয়ে আলাউদ্দীন খিলজী দিল্লীতে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনিই তখন মেবার শাসন করছেন। এক দেওয়ালীর দিনে তাঁর দূত এল হামিরের কাছে নারিকেল নিয়ে। নারিকেল মানেই বিয়ের সম্বন্ধ। মালদেব তাঁর কন্যা কমলকুমারীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। হামির তখনই রাজী হয়ে গেলেন। পাত্রমিত্র ও সর্দাররা ভয় দেখালেন শত্রুর কন্যা বলে। কিন্তু হামির অন্য কথা ভাবলেন, তাঁর চিতোর উদ্ধারের পথ তৈরি হচ্ছে।

নির্দিষ্ট দিনে হামির বর সাজলেন। হলদে রঙের বীর বেশ, মাথায় মুকুট, তার উপর কলগি। পাঁচ শো সৈন্য নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বিয়ে করতে চললেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! চিতোরের দরজায় কোন বিয়ের আয়োজন দেখলেন না। শঙ্খ নেই, শানাই নেই, নেই তোরণ-প্রহরারত তরুণীরা। কাঠের খুঁটিতে রেশমী কাপড় আর ফুল পাতা জড়িয়ে ত্রিভুজের মতো তোরণ কেউ তৈরি করে রাখে নি। পলাশফুলের রেণু নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে নি বর্ণালী লেহঙ্গা আর চোলি কুর্তি পরা চিতোরের ওড়না ঢাকা সুন্দরীরা। হেসে হেসে গান গাইল না:

তোরণ আয়া রহে বর।

থারা রারা কাঁপে রাজ।

নেগাঁকা নেগ্‌চুকাসা।

তব্‌ ম্যয় আগ আসাঁ।

মেয়েদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোরণ ভেঙে হামিরকে ভিতরে আসতে হল না। সোজা এলেন ফটক পেরিয়ে। হামিরের বুড়ো মন্ত্রী দাড়ি চুলকে বললেন, ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। নির্ভীক হামির বললেন, হোক গোলমেলে। ভয় পেলে আমার বাপোতার ইজ্জত নষ্ট হবে।

সেই রাজস্থানী ভদ্রলোক আমাদের গল্প বলছিলেন। হামিরের বিয়ের গল্প। বললেন: বাপোতার মানে হল বাপের দেশের।

একটু আগে তিনি যে ছড়াটি শুনিয়েছিলেন, তারও মানে বুঝি নি। পাছে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলেন, সেই ভয়ে মানে জানতে চাইনি। এইবারে সুযোগ পেয়ে বললুম: তোরণ আয়া রহে বরের মানে বললেন না?

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন: মানে বুঝতে পারেন নি বুঝি! এ তো একেবারে হিন্দীর মতো।

হিন্দী যে বাঙলার বাঙালীর কাছে সোজা নয়, ভারত সরকারের মতো এ ভদ্রলোকও দেখলুম তা বোঝেন না। ভারত সরকারের এই অজ্ঞতার কথা শুনে এক ভদ্রলোক সেদিন বলেছিলেন, বোঝেন না নয়, বুঝেও না বোঝার ভান করেন। আমাদের সঙ্গী ভদ্রলোক যে ভান করেন নি, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। বললেন: এই গানের মানে হল, তোরণে বর এসেছে, কিন্তু ভয়ে রাজা থরথর কাঁপছে। আমাদের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়েছে বলেই আমরা এগিয়ে এসেছি।

একটু থেকে ভদ্রলোক বললেন: এ হল রাজস্থানী রাজপুতের বিয়ে। উদয়পুরে এ বিয়ে অনেক দেখবেন। আমাদের বিয়ে অন্য রকম।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : আপনি রাজপুত নন ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : আমরা মারওয়াড়ী। আমার নাম ভীম সিংহ নয়, ভীমরাজ।

মারওয়াড়ীরা কি রাজপুত নয়!

ভীমরাজ বড় কৌতুক বোধ করলেন। বললেন : বাঙালীরা তাই ভাবেন বটে, মারওয়াড়ী মানেই রাজপুত।

তারপর বুঝিয়ে বললেন : আমরা মারবাড়ের লোক বলে মারওয়াড়ী। রাজস্থানবাসী বলে রাজস্থানী। কিন্তু রাজপুত হল সূর্য বংশের ক্ষত্রিয়, রামচন্দ্রের বংশধর। তারাও রাজস্থানী, কিন্তু আমাদের মতো—

বলেই ভীমরাজ থেমে গেলেন। বাকিটুকু আর বললেন না।

আমি বললুম : তারপর হামিরের কী হল বলুন।

ভীমরাজ বললেন : কমলকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে কমলকুমারী। পরনে কুসুম্বী ফুলের রঙে রাঙানো চুনরি চোলি আর লেহঙ্গা। মাথায় বেঁদী আর গলায় হার, হাতে ফুলের কাঁকন আর চূড়, চুলে ফুলের লটকন আর চরণে সোনার ঘুংঘট। সুর্মাটানা ভীরু চাহনি নিয়ে কমলকুমারী এলেন বাসরে হামিরের কাছে। হামির দেখতে পেলেন, ভয়ে নববধূ থরথর কাঁপছে। তাকে কাছে ডেকে হামির বললেন, ভয় কিসের ?

ভয় কিসের!

কমলকুমারী ক্রমেই যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেক অনুনয়ে হামির জানতে পারলেন, তিনি কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন নি, করেছেন বিধবার। কমলকুমারী বালবিধবা। ক্রোধে হামির উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি শান্ত হলেন। চিতোর উদ্ধারে কমলকুমারী তাঁকে সাহায্য করবে।

স্ত্রীর পরামর্শে হামির তাঁর শ্বশুরের নিকট জাল নামে এক ধূর্ত

ব্যক্তিকে যৌতুকস্বরূপ প্রার্থনা করলেন। এই জন্যই হামিরের চিতোর অধিকারে সহায় হল। হামির চিতোর উদ্ধার করলেন।

বনবীর মালদেবের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে সে চিতোরের রাণা হবার স্বপ্ন দেখত। সে গিয়ে শরণ নিল দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ খিলজীর। সসৈন্যে বাদশাহ এলেন যুদ্ধ করতে, সঙ্গে সপুত্র মালদেব। চম্বল নদীর কাছে সিঙ্গোলিতে যুদ্ধ হল। বাদশাহ বন্দী হলেন, মালদেব ও বনবীর পালিয়ে বাঁচলেন।

শান্তিদিও এই গল্প শুনছিলেন সাগ্রহে। বললেন: তারপর বাদশাহর কী হল?

ভীমরাজ হেসে বললেন: নাকে খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে আর কখনও চিতোরমুখো হবেন না, কয়েক লক্ষস্ব র্ণমুদ্রা দিলেন, আর নিজের রাজ্যের কিছু অংশ ছেড়েও দিলেন। তারপরে মুক্তি পেলেন হামিরের হাত থেকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্তিদি বললেন: হিন্দুরা বড় বোকা দেখছি।

কেন বলুন তো?

মুসলমান হলে কি ছেড়ে দিত! নিজে গিয়ে দিল্লীর তখ্‌তে বসত।

তা সত্যি!

আমার হঠাৎ মনে পড়ল ভদ্রলোকের আর একটি কথা। বলেছিলেন যে তাঁদের বিয়ে অন্য রকম। আমি সেই গল্প শুনতে চাইলুম।

ভদ্রলোক বললেন: শুরুটা আপনাদের মতোই। বাপ মায়েই বিয়ে ঠিক করেন। কখনও ছেলেমেয়েদেরও দেখা সাক্ষাৎ হয়, তবে একটা ব্যাপার খুবই প্রচলিত। সেটা হচ্ছে, বর কনের বাড়ি সাধারণত কাছাকাছি হয়। সেইজন্যে বিয়ের রাতেই কনে খানিকক্ষণের জন্যে বরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর

এক বছর পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে যাতায়াত চলে। বছর পূর্ণ হলে কনে বরের বাড়ি যায় পাকাপাকি ভাবে সংসার করতে।

বাধা দিয়ে আমি বললুম ঃ নারকেলের গল্প থেকে বলুন।

ভীমরাজ হেসে বললেনঃ আমাদের মধ্যে নারকেল নেই। পাকা দেখার দিন বরের বাড়ি থেকে ফল মিষ্টির সঙ্গে একটি আংটি যায় কনের বাড়ি রূপোর থালায় করে। কনে আংটি পরবে আর একুশটি টাকা দিয়ে সেই থালা ফেরত পাঠাবে। এই ঘটনার ছ মাস কিংবা বছরখানেক পরে বিয়ে। বিয়ের দশ পনরো দিন আগে ভানা নামে একটি উৎসবের পর পালা করে নেমন্তন্ন। এক একদিন এক একজনের বাড়ি বর ও কনে এক সঙ্গে নেমন্তন্ন খাবে। সঙ্গে নিয়ে যাবে পান সুপুরী এলাচ ও কিছু শুকনো ফল। বিয়ের তিন দিন আগে কনের বাপ মিষ্টি পাঠাবেন বরের বাপের কাছে, আত্মীয়স্বজনকে বিতরণের জন্যে। দুদিন আগে ডোরা বা পালডার অনুষ্ঠান। তাতে দুপক্ষেরই খরচ। মিষ্টি কাপড় জামা গয়নাগাটি—সব পাঠাতে হবে।

ভীমরাজ হেসে বললেন ঃ কলকাতার রাস্তায় আমাদের বরযাত্রা নিশ্চয়ই দেখেছেন। এখনও আমাদের বর যায় ঘোড়ায় চেপে, হাতে খোলা তলোয়ার, মাথায় ছাতা। বরযাত্রীরা সব পায়ে হেঁটে চলে। বিয়ে হয় বৈদিক মন্ত্রে। বর কনে মণ্ডপে বসে কনের বাপ মায়ের পাশে। আগে ঘাগরা চোলি ওড়না পরে বিয়ে হত, আজকাল লাল শাড়িও চলেছে। ঘণ্টা দুয়েক লাগে বিয়ে সম্পূর্ণ হতে।

শুনে আশ্চর্য হবেন ঃ ভীমরাজ বললেন ঃ বিয়ের রাতে আমাদের ভোজ হয় না। ভোজ হয় দু এক রাত পরে। একেবারে নিরামিষ ব্যাপার।

বলতে যাচ্ছিলুম যে আপনাদের জাতটাই তো নিরামিষাশী। কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

বললুম ঃ হাসলেন যে!

ভদ্রলোক বললেন ঃ একটা মজার কথা মনে পড়ল।

প্রশ্ন না করে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। ভদ্রলোক বললেন ঃ ছেলেবেলায় আমরা এই সব ভোজে ঘি খেতে দেখেছি। কানা উঁচু থালা নিয়ে আমরা খেতে বসতাম। আর প্রথমেই পাতে ঘি পড়ত। বদনার মতো নল লাগানো পাত্র দিয়ে ঘি পরিবেশন হত। আপত্তি না করা পর্যন্ত ঢেলেই যেত। প্রাচীনেরা থালায় চুমুক দিয়ে সেই ঘি খেতেন। আবার নিতেন।

বিস্ময়ে আমার দু চোখ বিস্ফারিত হয়েছিল। ভদ্রলোক হেসে বললেন ঃ প্রথা রক্ষায় আমাদের এখনও দু এক চুমুক খেতে হয়।

এখনও খান!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভীমরাজ বললেন ঃ ভারতবর্ষে আজ ঘি কোথায়!

সেই সঙ্গে যোগ করলেন ঃ স্বাধীন ভারতে কি খাঁটি জিনিস কিছু আছে!

ট্রেনের চাকায় ঠক ঠক করে শব্দ উঠছে। মনে হল, সবাই আমাদের ঠকাচ্ছে।

চিতোর আর উদয়পুরের মাঝামাঝি একটা জংসন স্টেশন আছে। তার নাম মাভ্‌লি। ঠিক মাঝামাঝি নয়। চিতোর থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল আর উদয়পুর থেকে চব্বিশ। মাভ্‌লি থেকে তৃতীয় পথ গেছে মারবাড় জংসনের দিকে। দিল্লী-আহ্মেদাবাদ লাইনে মারবাড় একটা বড় জংসন। সেখান থেকে চতুর্থ লাইন গেছে পশ্চিম রাজস্থানে, মানে যোধপুর বিকানীর ও জয়সলমের রাজ্যে।

মাভ্‌লিতে রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে। মামা চা খাবেন। সেজন্য ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। তাঁর আরও একটা দুর্ভাবনা আছে। সেটা তাঁর গাড়ির। কে একজন তাঁকে জানিয়েছে যে তাঁদের ছোট চার চাকার গাড়িটা মাভ্‌লি পর্যন্তই যাবে, উদয়পুর যাবে না। কাজেই মাভ্‌লিতে আমাকে নামতে হল।

গাড়ি কাটল না। চাও পাওয়া গেল। মামা হঠাৎ বললেন: তুমি ছিলে বলেই এ সব হল গোপাল, তুমি না থাকলে—

স্বাতি হাসল মামার কথা শুনে।

বললুম: উদয়পুরে একটা আশ্রয় পেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

মামা বললেন: আশ্রয় একটা পাওয়া যাবেই। ব্যবস্থা তো করা আছেই।

বললুম: কপাল খারাপ থাকলে ভাল ব্যবস্থাও অব্যবস্থা হয়ে যায়।

মামা মেনে নিয়ে বললেন: তা বটে।

তারপরেই বললেন: রেলের রিটায়ারিং রুম রিজার্ভ করেছ, দুখানা ঘর খালি পাওয়া যাবে তো!

একখানা পেলেও চলবে। একটা রাত আমি ওয়েটিং রুমেই কাটিয়ে দেব।

মামা বললেনঃ ওয়েটিং রুমে কেন রাত কাটাবে ওই ভিড়ের ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ করে! তেমন অসুবিধে দেখি তো কোন হোটেলে চলে যাব।

চা খাওয়া আমাদের হয়ে গিয়েছিল! আমি উঠে দাঁড়াতেই মামা বললেনঃ আবার নামছ কেন!

থেকেই বা কী করব!

মামা বোধ হয় আমার উত্তর শুনে আহত হলেন, বললেনঃ হুঁ।

বাধা না পেয়ে আমি নেমে গেলুম।

স্বাতি প্ল্যাটফর্মের দিকেই বসে ছিল। মনে হল, লোহার গরাদে মুখ রেখে সে আমায় দেখবার চেষ্টা করছে। আমি আর তার দিকে তাকালুম না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নিজের কামরায় ফিরে গেলুম।

শান্তিদি হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ বাঁচালেন।

কেন বলুন তো!

তাও কি বলতে হবে!

বুঝতে পারলুম যে সঙ্গী হিসেবে তিনিও আমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন। আমি তাই চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করলুম। কিন্তু শান্তিদি আমাকে নীরব থাকতে দিলেন না, বললেনঃ নতুন দেশে একা ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনার কোন ভাবনা হয় না?

লজ্জিত ভাবে আমি বললুমঃ তা হয় বইকি!

তবে!

তাইতেই তো চলে এলুম।

এ আপনার ভদ্রতার কথা।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে দিনের আলো কখন নিবে গেছে, দিগন্তের ছায়া পড়েছে পৃথিবীর উপর। অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকারে সব একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু গাড়িতে অন্ধকার হবে না। গাড়িতে আলো জ্বলছে। আমার মনে হল যে আমরা এই কৃত্রিম আলো নিয়েই পরিতৃপ্ত আছি। নিজের চারিধারটা আলোকিত দেখলেই অন্ধকারের কথা ভুলে যাই। বাহিরের বিরাট অন্ধকারকে অস্বীকার করি দু চোখ বন্ধ করে।

এক সময় মনে হল যে দূরে বহু দূরে এক জায়গায় যেন অনেকগুলি আলো দেখতে পাচ্ছি। আলোকমালা। আমার একটি ভ্রমণ কাহিনীর কথা মনে পড়ল। দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় ভারত প্রদক্ষিণ নামে একখানি বই লিখেছিলেন অর্ধ শতাব্দী পূর্বে। তাতে রাজপুতানার সাঁঝি নামে এক উৎসবের উল্লেখ করেছিলেন। প্রত্যেক পল্লীতে একটি চন্দ্রাতপ চিত্রশোভিত ও আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। নানা বর্ণের চূর্ণ দিয়ে তারা ভূমিতে মণ্ডল আঁকে। কিন্তু এ কিসের অনুষ্ঠান তার কোন উত্তর তিনি পান নি।

ভীমরাজ আমার পাশে বসে ঢুলছিলেন। তাঁকে জাগিয়ে আমি এই প্রশ্ন করলুম। তিনি আলো দেখতে পান নি। সাঁঝি মানেও বুঝতে পারলেন না। উৎসবের হিন্দী আমি জানি নে, আর ইংরেজীতে দখল নেই ভীমরাজের। কাজেই আমি হেরে গেলুম। ভারতে কবে এক ভাষা হবে, সেই দিনের অপেক্ষা করে থাকতে হবে ভারতবাসীকে।

শান্তিদির হাসিতে হঠাৎ চমকে উঠলুম। চকিতে চারি দিকে চেয়েই বুঝতে পারলুম যে আমার অবস্থা দেখেই হাসছেন। কারণ বুঝতে না পেরে বললুম: হাসলেন যে!

আপনার কাণ্ড দেখে হাসছি।

আমি আবার কী করলুম।

তেমনই হাসতে হাসতে শান্তিদি বললেন: আমি যখন সেই

মারওয়াড়ী বউটির কথা বুঝতে পারি নি বলেছিলাম, তখন আপনি উপভোগ করেছিলেন আমার দৈন্যটা। এবারে কী হল!

আমিও হেসে বললুম: দৈন্য আমার একার হলে আমি লজ্জা পেতুম। এ অভাব যে দেশজোড়া। বিদেশী শাসকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এ দিকে। ছোট গণ্ডির ভেতর আরও ছোট গণ্ডি টেনে তাঁরা আমাদের ভেদবুদ্ধি দিনে দিনে বাড়িয়ে দিতেন। ভারত বিভক্ত করে ধর্মের ভেদ মিটিয়ে গেছেন, আর ভাষার ভেদকে সযত্নে লালন করে দেশের মানুষগুলোকে পঙ্গু করে রেখে গেছেন।

শান্তিদির মন যে আমার কথার দিকে ছিল না, সে কথা বুঝতে পেরে আমি লজ্জা পেলুম। কিন্তু আশ্চর্য হলুম তাঁর কথা শুনে। বললেন: আপনার কথায় মন নেই ভাববেন না।

তাই তো দেখছি। কিন্তু সে কথা বলবার আগেই তিনি বললেন: শুধু দৃষ্টি গেছে অন্য দিকে।

আমি তাঁর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। গাড়ির আর একটা কোণে একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ গল্পে মত্ত হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ তাদের দেখতে পাই নি ভেবেই বিস্ময় জাগল। শান্তিদি বললেন: মাভ্‌লি থেকে উঠেছে।

বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হল না যে এরা ভীল জাতির বংশধর। দ্রাবিড়দের মতো এরাও ভারতের আদিবাসী কি না, সে তর্ক পণ্ডিতরা করবেন। কিন্তু এখনও এরা রাজস্থান ও পশ্চিম ভারতে সরকারের খাতায় আদিবাসী নামে পরিচিত। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এদের ভিন্ন নাম, জাতে অন্ত্যজ। কিন্তু মহাভারতে এদের নাম দেখা যায় আভীর। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁর রাণীদের নিয়ে দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরছেন, তখন এই আভীরদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তীর ধনুক হাতে এই বন্য পার্বত্য প্রদেশেই তারা অর্জুনকে আক্রমণ করেছিল। আশ্চর্য হয়ে অর্জুন দেখলেন যে তিনি তাঁর গাণ্ডীব ব্যবহার করতে পারলেন না। তাঁর শক্তি

নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ তখন দেহত্যাগ করেছেন। আভীর দস্যুরা কেড়ে নিয়ে গেল দ্বারকার সহস্র পুরনারী।

এইবারে তর্কের কথা। আহীর নামে গোয়ালাদের যে জাতকে অনেকে আভীরদের বংশধর মনে করেন, তাঁরা বোধ হয় ভুল করেন। সাহিত্যদর্পণে আছে, আভীরী 'শাবরীচাপি কাষ্ঠপাত্রোপজীবিষু'। গোয়ালারা কোন দিন বনের কাঠ কেটে জীবিকা অর্জন করে নি, ভীলেরা এখনও করে।

আমাদের কৌতূহল লক্ষ্য করে ভীমরাজ বললেন: ভীলদের দেখছেন বুঝি!

তাতে আর সন্দেহ কি!

এরা দেখছি শহুরে ভীল। শহরের আশেপাশেই হয়তো থাকে।

এই কি শহরের নমুনা! শান্তিদি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

অদ্ভুত তাদের পোশাক, অদ্ভুত অলঙ্কার। পোশাকটা অদ্ভুত বলব না। গাঁয়ের লোকদেরও বোধ হয় এমনই পোশাকে দেখেছি এ দেশের রাস্তায়। অলঙ্কারটা অদ্ভুতই বটে। পুরুষটির কানে মাকড়ি আর হাতে বালা, মালা পরেছে গলায়। মেয়েটির দেখছি পায়ের আঙুল থেকে প্রায় হাঁটু অবধি গয়না, হাতেও তেমনি কব্জি থেকে কাঁধ পর্যন্ত। তার উপর গলায় মোটা হাঁসুলি। কত ওজন যে বইছে এরাই তা জানে। তবু আমি কিছু বললুম না।

ভদ্রলোক আবার বললেন: আমার এক বন্ধু একবার বুনো ভীলদের সঙ্গে কিছু দিন কাটিয়ে এসেছিল। সে বলল যে এরা নাকি নিজেদের মহাদেবের চোর বলে। গল্পটা এই রকম।

একদা মহাদেব নাকি অরণ্যে ঘুরে ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় এক রূপসী কন্যা তাঁর সামনে এল। তাকে দেখেই মহাদেব সুস্থ হয়ে উঠলেন। কালক্রমে এঁদের যে সন্তানাদি হয়, তার মধ্যে এক পুত্র ছিল অতি কুদর্শন। সে আবার মহাদেবের

বাহনটিকে এক দিন মেরে ফেলে। মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে সেই পুত্রকে এই অরণ্যে নির্বাসন দিলেন। আজকের এই ভীল জাতি তারই বংশধর।

ভীমরাজ যোগ করলেন: এদের শিব ও গৌরীপূজার বহর দেখলে তাদের বিশ্বাসে আপনারও বিশ্বাস হবে।

গৌরীপূজার নামে আমার গৌরীনৃত্যের কথা মনে হল। শুনেছিলুম যে ভীলেরা গোটা ভাদ্র মাস ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। গৌরীনৃত্য নাকি গৌরীপূজারই নামান্তর। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই দেখলুম, ভীমরাজবাবু আমাকে ভীলদের গল্প শোনাতে লেগেছেন। বলছিলেন: এদের পুরুষ আর মেয়েদের ভেতর প্রভেদটা আকাশ আর পাতালের মতো।

বাধা দিয়ে আমি বললুম: শরীরের প্রভেদ বলছেন?

না, না, শরীরের নয়। আমি প্রকৃতির প্রভেদের কথা বলছি।

শান্তিদি আর আমি এক সঙ্গে তাকিয়ে ছিলুম ওই দুটি মানুষের দিকে। ময়লা রঙ, শক্ত পেটা শরীর দুজনেরই। মেয়েটি খর্বাকৃতি। কোন বিচারেই এদের সুশ্রী বলা চলে না। ছেলেটি ধুতির উপর কুঁচি দেওয়া খাটো ফতুয়া পরেছে, মাথায় পাগড়ি। বড় লাঠিগাছটা রেখেছে পাশে। মেয়েটির পরনে রঙীন ঘাগরা, গায় আঁটসাট খাটো চোলি। দেহের অনাবৃত অংশ উড়ুনি দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেছে। লক্ষণীয় কোন প্রভেদ না দেখে আমরা চিন্তিত হয়েছিলুম। ভীমরাজবাবুর উত্তর শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলুম। তিনি বললেন: পুরুষেরা দুঃসাহসী, পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়ায় নির্ভয়ে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, ডাকাতি করে নির্দয় ভাবে। হিংসা এদের নেকড়ের মতো।

কথার মাঝখানেই আমি বললুম: ইতিহাসে এদের প্রভুভক্তির কথা পড়েছি।

ভদ্রলোক মেনে নিয়ে বললেন: ঠিক বলেছেন। রাজার জন্যে

বা সর্দারদের জন্যে এমন কি প্রতিবেশীর মর্যাদার জন্যেও এরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করে।

আর মেয়েরা ?

ভীমরাজবাবু বললেন: তার আগে এদের আর একটা গুণের কথা বলি। যেমন আশ্রয়দাতাদের জন্যে তেমনি শরণাগতের জন্যেও এরা প্রাণ দিতে দ্বিধা করে না। এরা হামলা করেছে বণিকদের ওপর, ডাকাতি করেছে ধনীর গৃহে। কিন্তু দরিদ্রের জন্য ব্যয় করেছে মুক্ত হস্তে।

এ তো আগামী যুগের ধর্ম হবে। যার বেশি আছে, তার কাছ থেকে কেড়ে যার নেই তাকে দেওয়া। ভীলেরা দেখছি, অনেক আগে থেকেই নতুন সভ্যতার ধারা পেয়েছে।

ভীমরাজবাবু এবারে এদের মেয়েদের কথা বললেন: এদের মেয়েদের বড় দয়া মায়া, বড় পরোপকারী এরা। এই সব ঘন অরণ্যের ভেতর পথিক যখন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, মেয়েরা এসে তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে, পথ বলে দিয়েছে পালাবার।

শান্তিদি আমায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন: স্বামী স্ত্রী বুঝি!

বয়সে তরুণ বটে, কিন্তু সম্বন্ধ তো বোঝবার উপায় নেই। আমি সেই কথাই শান্তিদিকে বললুম: বোঝা মুশকিল।

ভীমরাজবাবু কিছু শুনতে পেয়েছিলেন, বুঝতেও পেরেছিলেন কিছু। বললেন: কী বলছেন?

বললুম: এদের মধ্যে সম্বন্ধটা কী, তা কি বোঝবার উপায় আছে।

গম্ভীর ভাবে ভদ্রলোক বললেন: কঠিন প্রশ্ন, তবে আমার মনে হয়—

ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ বললেন: এরা স্বামী স্ত্রী নয়।

তবে!

ভীমরাজবাবু বললেন: এদের মেয়েদের সাধারণত একটু বেশি

বয়সে বিয়ে হয় বলে শুনেছি। বিশ পঁচিশ এদের কাছে বেশি বয়স নয়। কেন এমন হয়, তাও শুনেছি। মেয়ের বাপ বিয়ের প্রস্তাব করতে পারেন না। তা হলেই লোকে ভাববে যে মেয়ের চরিত্রে কিছু কালি পড়েছে।

শান্তিদি বলে উঠলেন: ভারি বিপদ তো!

ভীমরাজবাবু খুশী হয়ে বললেন: তবেই দেখুন, কবে কোন্ ছেলের বাপ সম্বন্ধ নিয়ে আসবে, তার জন্য মেয়ের বাপকে বসে থাকতে হবে। আর তা না হলে বন্ধু বান্ধবের শরণ। তাঁরা ঘটকালি করবেন।

বিয়ের কথায় শান্তিদির আগ্রহ দেখলুম। বললেন: এদের বিয়ে কি আমাদের মতো?

ভীমরাজবাবু আমাদের বিয়ের খবর রাখেন না। কিন্তু এদের বিয়ের গল্প বললেন অনায়াসে: নিয়মকানুন বেশ সরল। বরপক্ষ সম্বন্ধ আনবে, আর সম্মতি দেবে কন্যাপক্ষ। তারপরেই বরের বাপ দু কলসী মদ নিয়ে পাকা দেখায় বসবেন। তার নাম সগরি। পাঁচজনে মিলে গ্রামের কোন শীতল জায়গায় বা গাছের নিচে এসে বসবে। বরের বাপ কনের বাপকে তিরিশ টাকা, না ষাট টাকা পণ দেবে, তা স্থির হবে। তারপরেই বরের বাপ খাওয়াবে সেই কলসীর মদ, আর কনের বাপ কাটবে ছাগল।

বিয়ে হবে পাঁচ ছ মাস পরে। বরের বাপ কনের জন্য একখানি শাড়ি, একটি অঙ্গরাখা ও একটি কোমরবন্ধ পাঠিয়ে দেবে। আর কনের বাপ সবাইকে তখন ভোজ খাওয়াবে। ব্রাহ্মণ এসে বিয়ের দিন স্থির করবে। এই সঙ্গে বরের বাপ চুক্তির টাকার অর্ধেক নগদ ও বাকিটার জন্যে একটা বলদ আর কিছু দিয়ে যাবে কনের বাপকে।

বিয়ের দিন হলুদ রঙে ছোপানো কাপড় পরে বর আসবে কনের বাড়ি। কনের বাপও বাড়িতে বসে থাকবে না। বাজনা বাদ্যি

আত্মীয় স্বজন নিয়ে গ্রামের সীমানা থেকে সবাইকে অভ্যর্থনা করে ঘরে আনবে। বরের কপালে সেখানেই দেবে কুঙ্কুমের তিলক। সন্ধ্যা বেলায় ভোজ, মদের ছড়াছড়ি। দুপক্ষের সব লোক মাতাল হয়ে গড়াগড়ি দেবে। আর এ দিকে বর কনে রাত কাটাবে একটা নির্দিষ্ট ঘরে। পর দিন সকাল বেলায় কনের বাপ মেয়েকে একটি বলদ আর বরের বাপকে একটি পাগড়ি দিয়ে সবাইকে বিদায় দেবে।

এই সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও কি এদের বিয়ে হয়?

শুনেছি, এদের ভেতর শ্রেণী আছে গোটা ষাটেক। নিজের শ্রেণীতে নাকি বিবাহে বাধা আছে।

শান্তিদি আবার তাঁর পুরনো কথায় ফিরে গেলেন। বললেন : ওই মেয়েটি কি তা হলে কুমারী?

তা হলে বিপদের কথা।

কেন?

এদের সমাজে পালানো কিছুতেই চলবে না। মেয়ের বাপ তার আত্মীয়স্বজন নিয়ে ছেলেকে নিশ্চয় পাকড়াবে। তার ঘর পোড়াবে, প্রয়োজন হলে তার প্রতিবেশীদের ঘরও জ্বালাবে। গৃহ-যুদ্ধ চলবে দীর্ঘ দিন ধরে। শেষ পর্যন্ত দুপক্ষেই জ্বালাতন হয়ে পঞ্চায়েত বসাবে। মেয়ের বাপ জরিমানা আদায় করবে অন্তত এক শো টাকা আর পঞ্চায়েত সেই ছেলের পয়সায় মদ গিলবে গলা পর্যন্ত তবে ছুটি।

সাংঘাতিক ব্যবস্থা।

শুনুন তারপর। এই মেয়ে যদি আবার বাগ্‌দত্ত মেয়ে হয়, তা হলে বিপদ আরও বেশি। যার সঙ্গে বিয়ে হবে, সেই ছোকরা তীর ধনুক নিয়ে বেরবে। আর পারলে মেরেই ফেলবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষকে।

বলে ভীল যুবককে দেখিয়ে দিলেন। বললেন : সেখানেই

নিষ্পত্তি নয়। ওই মেয়েটার বাপের ঘর জ্বালাবে। তারপর দুই গ্রামের লোক যুদ্ধ করে জনকয়েক মরবার পর সন্ধি করবে।

মেয়েটা যদি কারও বিবাহিত স্ত্রী হয়?

তার স্বামী তাকে ছাড়বে না। বউ যে গ্রামে গেছে, সেখানকার সব ঘরে আগুন দেবে। পঞ্চায়েত ডাকবে। পঞ্চায়েত প্রথমেই সেই চোর ছোকরার কাছ থেকে আকণ্ঠ মদ খাবে, আর যার বউ তাকেই ফিরিয়ে দেবে।

বউ যদি ফিরতে না চায়? কিংবা ছোকরা তাকে ফেরত দিতে রাজী না হয়?

তা হলেও ব্যবস্থা সহজ। দু শো টাকা দণ্ড দিয়ে ইচ্ছে মতো সংসার কর।

শান্তিদি হেসে উঠেছিলেন খিল্‌খিল করে। তারপরেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি আস্তে আস্তে বিধবা বিবাহের কথা জিজ্ঞসা করলুম।

ভীমরাজবাবু একবার শান্তিদির দিকে তাকালেন। তারপর জবাব দিলেন আস্তে আস্তেঃ খুব প্রচলিত। তার নাম নাৎরা। মৃত স্বামীর সৎকার করে আগেই আত্মীয়স্বজন সেই বিধবা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবে, এবার কী করবে! নাৎরার ইচ্ছা থাকলে সে মেয়ে বলবে, বাপের বাড়ি যাব। এ হল ভদ্র ভাবে বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করা। আর কথা নেই, স্বামীর ছোট ভাই থাকলে সে তখুনি ছুটে এসে নিজের কাপড় দিয়ে বউদির মাথা ঢেকে দেবে। তার মানে, তুমি আমার সম্পত্তি হলে। তারপর আদর করে ঘরে নিয়ে যাবে। আট দিন পর অশৌচ গত হলে বিধবা তার পুরনো বালা ভেঙে নতুন বালা পরবে। তবেই নাৎরা পাকা হবে।

ভীমরাজবাবু বললেনঃ এ বড় সম্মানের কাজ। তাই দেবর কখনও বয়সের প্রভেদ দেখবে না। মায়ের বয়সী বউদিকেও আদর করে ঘরে নিয়ে তুলবে।

তারপর বললেন : কিন্তু যুদ্ধ বাধবে দেবর না থাকলে। অশৌচ গত হলে বিধবা যাবে তার বাপের কাছে। বাপ যদি নিজের চেষ্টায় বিয়ে দেয়, তা হলে মেয়ের বংশধররা ছুটে এসে বাপের ঘর পুড়িয়ে দেবে। পঞ্চায়েত বসিয়ে পঞ্চাশ থেকে শ দুই টাকা আদায় না করে কিছুতেই ছাড়বে না। বাপ আবার নতুন জামাইয়ের কাছে সেই টাকা আদায় করবে। না দিলেই লাঠালাঠি, ঘর পোড়ানো।

একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক আবার বললেন : এ সব হাঙ্গামা থেকে বাপ বেচারা রেহাই পায় মেয়ে নিজে ব্যবস্থা করলে। সমাজে এরও প্রচলন আছে। মেয়ে পালিয়ে গিয়ে কোন পুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধল। পুরুষের না বলার উপায় নেই। সসম্মানে সেই বিধবাকে তাকে গ্রহণ করতেই হবে। তার ঘর পুড়বে, জরিমানা হবে, এ সব জেনেও তাকে আশ্রয় দিতে হবে।

মনে হল যে শান্তিদি আমাদের আলাপের বিষয়বস্তু সবই বুঝতে পেরেছেন। তাই কোন প্রশ্ন করলেন না। আমি বললুম : স্বামী মরতে না মরতেই এ সব ব্যবস্থা হয়, কিছু দিন অপেক্ষা করতে কি তারা পারে না!

কী দরকার তার! সামান্য কারণেই যখন তীর ধনুকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে হয়, তখন সস্তা শোক দেখিয়ে কেন দেরি করবে!

তা ঠিক!

বলে আমি চুপ করে গেলুম।

ভীমরাজবাবু বললেন : কাট্ না হওয়া পর্যন্ত এরা অপেক্ষা করে বইকি!

কাট্ আবার কী?

কাট্ মানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। দ্বাদশ দিনে এরা কাঁধকাটাদের খাওয়ায় বলে এই নাম।

এই সঙ্গে যোগ করলেন : ব্যাপারটা খুলে বলি। হিন্দুদের মতো

শব এরা দাহ করে, কিন্তু স্মৃতিফলক তোলে খ্রীষ্টান বা মুসলমানের মতো। সব চেয়ে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে ভোপাকে নিয়ে।

ভোপা আমি জানি নে। সে কথা ভীমরাজবাবুও বুঝলেন। বললেন: ভোপা এদের ভূত ঝাড়া ওঝা। অরদের দিন তাকে নিয়েই সারা দিন কাটে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: অরদ মানেও বুঝি বোঝেন না! শ্রাদ্ধকে এরা অরদ বলে।

বললুম: বুঝেছি। এবারে ভোপার গল্প বলুন।

ভীমরাজবাবু একটু নড়ে চড়ে নিয়ে গল্প শুরু করলেন: ভোপা এসে একখানি পিঁড়িতে জাঁকিয়ে বসবে। তার সামনে একটা মাটির হাঁড়ি দুজন লোক বাজাতে থাকবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রেতাত্মা এসে ভোপার ওপর ভর করবেন। তখন সে পাগলের মতো চিৎকার করবে আর ছুটোছুটি করবে। প্রথমেই ভোপা প্রকাশ করে দেবে, মৃত ব্যক্তি মরবার আগে শেষ কথা কী বলে গেছে। তারপর জিনিস পত্র চাইবে। স্বাভাবিক মৃত্যু হলে ঘি দুধ, আর অপঘাতে মৃত্যু হলে তীর ধনুক বন্দুক। মৃতের পূর্বপুরুষদেরও আহ্বান করবে একে একে, তাদের জন্যও নানা উপহার।

ভদ্রলোক বলে চললেন: সারা দিন পরে ভোপার কাজ শেষ হলে আসবে ভীল যোগী। তারও চাই বারো সের আটা আর পাঁচ সের জনারের ময়দা। পিতলের ঘোড়া, শূন্য কলসী, আর গোটাকয়েক তীর নিয়ে নানা তুকতাক। নানা উপহার। যোগী নিজেই একটি গরু পাবে। সারা দিন ধরে প্রচুর মদ, প্রচুর মাংস। খাবার জিনিস জোগাবে আত্মীয় স্বজন, জামাই বা শালা যোগাবে একটা মোষ। এও যেন একটা উৎসব। বিধবার ব্যবস্থাও হবে এই দিনে।

শেষের কথাটি ভদ্রলোক অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন।

ভীলদের সম্বন্ধে আরও হয়তো অনেক কিছু জানবার আছে।

কিন্তু গৌরীনৃত্যের কথা শোনবার জন্য মনে মনে আমি ব্যস্ত হচ্ছিলুম। বললুম: এবার এদের গৌরী নাচের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ভদ্রলোক বললেন: নাচ-গান আমরা ভাল বুঝি না। বাংলা দেশে আপনি নিজেও আমাদের রসজ্ঞান দেখে থাকবেন।

ভাবলুম যে ভদ্রলোক বুঝি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দেখলুম তা নয়। বললেন: আর্টের কথা যদি জিজ্ঞাসা না করেন, তা হলে কিছু বলতে পারি।

বেশ তো, যা জানেন তাই বলুন।

ভীমরাজবাবু একটু স্মরণ করে বললেন: অনেক দিন আগে আমি একবার গৌরী নাচ দেখেছিলুম। এর নাম নাচ কেন হল, তা আমি বুঝতে পারলুম না। একে যাত্রা গান বলা উচিত, যা কলকাতায় কালী পূজোর সময় হয়। তার সঙ্গেও তফাত আছে। যাত্রা গান আরম্ভ হয় সন্ধ্যার পর থেকে। অনেক সময় সারা রাত ধরে চলে। এদের পালা শুরু হয় সকাল বেলায়, শেষ হয় সন্ধ্যায়।

বোধ হয় আলোর অভাবে এমন নিয়ম হয়েছে।

তা হবে। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম যে দলের অধিকারীর নাম রাইবুড়িয়া। মানুষটার নাম নয়, পদের নাম। গ্রামের দল নিয়ে বেরবার আগে সে মোড়লের কাছ থেকে গ্রামের সমস্ত বিবাহিতা মেয়েদের নাম ঠিকানা জেনে নেবে। বাপ মা ভাইদের কাছ থেকে সেই সব মেয়েদের জন্য উপহার সংগ্রহ করবে। তারপর বেরবে নাচের দল নিয়ে। এ হল ভাদ্র মাসের কথা। মাঠভর্তি সবুজ শস্য। পুরুষদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন তাদের ছুটির দিন। তাদের ব্রতের দিন। ব্রতের দিন এই জন্য যে তারা সারা মাসটা সংযম করবে। মদ ছোঁবে না, নিরামিষ খাবে। সারা দিন ধরে পথ চলবে, আর সন্ধ্যার সময় গ্রামে পৌঁছে এক একজন এক একজনের বাড়িতে আশ্রয় নেবে। নিজেদের গ্রামের মেয়ের বাপ ভাই সঙ্গে থাকলে সে আশ্রয় পাবে সেই মেয়ের বাড়িতেই। এ তাদের

সামাজিক প্রথা। বউ তো একটা বাড়ির নয়, বউ সারা গ্রামের। গাঁয়ের সমস্ত মানুষ তাদের আদর আপ্যায়ন করবে। উপহার দেবে রাইবুড়িয়াকে, গ্রাম সমৃদ্ধ হলে দলের সবাইকে। পাগড়ি চাদর চাঁদা করে কেনে, কিন্তু হাতে করে উপহার দেয় গ্রামের সেই বউটি।

আমার মনে হল যে এই সব নিয়মকানুনের ভিতর দিয়ে আমি তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটা অস্পষ্ট চিত্র দেখতে পাচ্ছি। সরকার আজ সমবায় প্রথা প্রবর্তনের জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এও তো এক ধরনের সমবায় প্রথা! উপার্জনের বেলাতে এমনই কোন পন্থা অবলম্বন করলে তাদের সমাজ জীবন আরও সহজ হয়ে যেত। সুখী হত।

ভীমরাজবাবু বললেন: যে নাটকটি আমি দেখেছিলুম, এবারে তার গল্প বলি। সবটা ভাল মনে নেই, যেটুকু আছে তাতেই আপনার একটা ধারণা হবে।

গল্প শোনবার আগ্রহে আমি ভীমরাজবাবুর দিকে ফিরে বসলুম। ভদ্রলোক বললেন: বণিক আর ডাকুর গল্প। বণিকের ব্যবসায় বুদ্ধি প্রখর। ভীলদের ঠকিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে খাচ্ছে। দুই স্ত্রী তার। তাদের কাছে তার প্রতাপের অন্ত নেই। এ দিকে ডাকু অসীম সাহসী। কিন্তু মদে একেবারে ডুবে আছে। এক দিন রাতে বণিকের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে গেল। কিন্তু বণিকের বড় বউ ধরা পড়ল লোকের হাতে। বণিক আর তাকে ঘরে নিল না। জেল থেকে বেরিয়ে ডাকু মর্মাহত হল সেই বউটার দুর্গতি দেখে। কৌশলে তাদের মিলন ঘটিয়ে দিল বণিকের সঙ্গে। কিন্তু কলহ শুরু হল দুই সতীনে। ডাকু এরই অপেক্ষা করছিল। সুযোগ বুঝে বণিককে যুদ্ধে হত্যা করে ডাকু তার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হল।

আদিবাসীদের এমন সামাজিক নাটক অভিনয়ের গল্প আমি আগে কখনও শুনি নি। শুনেছি পৌরাণিক নাটকের কথা, রামায়ণ

ও মহাভারতের গল্প। তাই আশ্চর্য হয়ে বললুম: নাটকে এদের দেবদেবী নেই?

সামাজিক নাটকেই আছে। কোন মরা মানুষকে বাঁচাবার দরকার হলে কখনও গৌরী আসেন, কখনও শিব আসেন গৌরীর অনুরোধে। ওই পর্যন্তই। তার বেশি কিছু নয়।

বলে ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন।

ভাঁড় নেই?

আছে বইকি। ভাঁড় না থাকলে কি নাটক জমে!

স্টেজ?

খোলা আকাশের নিচে মাঝখানে একটুখানি জায়গা ছেড়ে গোল হয়ে সবাই বসবে। বাজিয়েরা মাদল নিয়ে মাঝখানে বসবে একটা ত্রিশূল ঘিরে। সব শুদ্ধ বিশ পঁচিশজন লোক। সবাই পুরুষ, মেয়ের ভূমিকাও করে পুরুষরা। কখনও কখনও এক সঙ্গে দুটো দৃশ্যের অভিনয় হতেও দেখেছি।

একটু থেমে বললেন: নাচ গান যে একেবারে নেই, তা নয়। শিবের নাচ, গৌরীর নাচ, ত্রিশূল হাতে নেচে নেচে যুদ্ধ—সবই আছে। এ যুগের উপযোগী অভিনয়ের কোন কিছুই বাদ পড়ে না।

আমি কিছু বলবার আগে ভদ্রলোক আবার বললেন: আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। ডাকু তাদের স্বজাতের বীর, তাদের আদর্শ পুরুষ। সে ও তার দলের লোকজনেরা কথা বলে সাধারণ কথ্য ভাষায় সহজ ভাবে। কিন্তু বণিক ও তার পরিবারের লোকেরা টেনে টেনে সুর করে কথা বলে, কবিতা পড়ার মতো। সাজপোশাকেরও পার্থক্য আছে। ডাকুর কালিমাখা দেহ, মাথায় পাখির পালক। আর বণিকের লম্বা জামা আর জরির পাগড়ি। যেমন সাজ তেমনই ভাষা।

শান্তিদি হঠাৎ হেসে উঠলেন খিলখিল করে। চমকে উঠে আমি বললুম: কী হল শান্তিদি?

হাসি থামলে শান্তিদি বললেন : সামান্য একটি প্রশ্নের জবাব দিতে আপনারা দেখছি মহাভারত গড়ে তুললেন।

তাঁর রহস্যটা আমি বুঝতে পারি। তিনি ওই ভীলদের দেখিয়ে জানতে চেয়েছিলেন তারা স্বামী স্ত্রী কিনা। সে কথার উত্তর দিতে গিয়ে এত কথা, কিন্তু শান্তিদি তাঁর প্রশ্নের জবাব এখনও পান নি। আমি বেশ লজ্জা পেলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। গল্পে গল্পে সমস্ত পথটা যে ফুরিয়ে গেছে, তা বুঝতে পেরেই আমরা আবার সচেতন হয়ে উঠলুম। পথের দুধারে পাহাড়, আরাবল্লীর শ্রেণী। তারই এক ফাঁক দিয়ে আমরা উদয়পুরে ঢুকে পড়লুম।

ভীমরাজবাবু আমায় একখানি কার্ড দিলেন। তাতে তাঁর কলকাতার দোকানের ঠিকানা। বড়বাজারের বড় ব্যবসাদার সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বদেশে তৃতীয় শ্রেণীতেই বসেছেন সকলের সঙ্গে। বড়মানুষির পরিচয় শুধু ফরসা চিকন ধুতি আর মলমলের পাঞ্জাবীতে। গাড়ি থেকে নামবার সময় ভাঙা বাঙলায় অনুরোধ করে গেলেন তাঁর কলকাতার গদিতে পায়ের ধুলো দিতে।

জুতোর ধুলো নয়, পায়ের ধুলো। জুতো কেনবার পয়সা আমরা তাঁদের পায়েই ধরে দিচ্ছি।

১৮

ঘুম থেকে উঠে উদয়পুরের প্রভাতটি মামার মধুর মনে হল। পাইপ ধরাবার সময় কথাটি তিনি বলেই ফেললেন। স্বাতি শুধু হাসল। আর মামা বললেন: হাসলি যে!

স্বাতি উত্তর দিতে দ্বিধা করল না। বলল: কাল রাতে তুমি বলছিলে যে এমন বিপদে তুমি জীবনে পড় নি।

বিপদ নয়!

আমি তাঁকে শান্ত রাখবার জন্য বললুম: বিপদ তো বটেই। বাড়ির বাইরে বেরলেই বিপদ।

শান্তিদি কথা কইলেন না। শুধু একটুখানি হাসলেন।

কাল বিপদের সময় তিনিও আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে গেছেন। বিপদ না বলে উপায় কী! সকাল বেলাতেই মামাকে চটিয়ে দিলে নতুন বিপদ ডাকা হবে। ঘটনাটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। উদয়পুরে পৌঁছে দেখা গেল যে স্টেশনে কোন রিটায়ারিং রুম নেই। না জানার জন্য আমার লজ্জা নেই, লজ্জা টাইম টেবল না দেখার জন্য। তার চেয়েও বেশি লজ্জা চিতোরের সেই রেল কর্মচারীর, যিনি আমাদের নাম ধাম লিখে নিয়েছিলেন ব্যবস্থা করবার জন্যে। মামার মতে এমন অপদার্থ কর্মচারীকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। ভুলে গিয়েছিলেন যে কয়েক ঘণ্টা আগেই তার তৎপরতা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এ সবে কিছুতেই ক্ষতি হত না। গাড়ি থেকে নামতেই হোটেলের এক গাইড আমাদের ধরে ফেলেছিল। মামা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে বেচারা পালিয়ে গিয়ে বাহির থেকে একটা দল পাকড়াও করে। চিতোরের সেই দলটি, যাদের অনেকগুলো টাঙ্গা লেগেছিল, আর কয়েকজন আঘাত পেয়েছিলেন

টাঙ্গা থেকে ছিটকে পড়ে। স্টেশনে রিটায়ারিং রুম নেই শুনেই আমি ছুটে গিয়েছিলুম তার কাছে। গম্ভীর ভাবে সে বললে, দুঃখিত, তার বিরাট ফতে মেমোরিয়াল হোটেলে আর একখানিও ঘর খালি নেই। গাইড বই খুলে আমি আরও কয়েকটা নাম বার করলুম। সার্কিট হাউস, আনন্দ ভবন, স্টেট গেস্ট হাউস ও স্টেট হোটেল। রেলের কর্মচারীরা আমাদের বারণ করলেন। বললেন, দূর অনেক, আর আগে থেকে রিজার্ভ করে না রাখলে জায়গা সচরাচর পাওয়া যায় না। তার চেয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুম ভাল হবে। মেয়েদেরটা তো খালি আছেই, পুরুষদেরটাতেও জায়গা অনেক। মেয়েদের আলাদা রাখতে মামার যত আপত্তি, মামীর আলাদা থাকতে তার চেয়ে আপত্তি বেশি। তাঁরা বললেন, আলাদা কেন থাকবেন! কিন্তু রামখেলাওন আর আমাকে আলাদা ঘরেই থাকতে হল। মেয়েদের ঘরটায় জায়গা কম। শান্তিদি স্থান পেলেন মামীর পাশে।

খাওয়া নিয়েও বিপদ হয়েছিল। পাশে একটা রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে। কিছু সময় নিয়ে তারা আমাদের খাবার দেবে। কিন্তু শান্তিদির কী ব্যবস্থা হবে! তিনি তো এ সব খাবেন না। শান্তিদি বললেন: আমার জন্য কেন ভাবছেন! আমি তো এক বেলা খাই।

মামী বললেন: তাও কি হয় মা! আমরা গোগ্রাসে গিলব, আর তুমি থাকবে উপবাসী!

মামীর এইখানেই আপত্তি তা জানি। কিন্তু তবু ভাল লাগল যে এত অল্প সময়ে এমন আপন করে নিতে পেরেছেন। শান্তিদির বয়স আর কতই বা হবে। তাঁর নিজের মেয়েও হয়তো হতে পারতেন। আমি বললুম: দিদির ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি, আপনারা মুখ হাত ধুয়ে নিন।

বাজার থেকে আমি দই আর মিষ্টি কিনে এনেছিলুম। ফল পেয়েছিলুম কলা আর মসম্বি। শান্তিদি লজ্জা পেয়ে বলেছিলেন: এত সব আমার জন্যে! আমি কি রাক্ষস!

সকাল বেলায় তাড়াতাড়ি করে আমরা চা খেয়ে নিলুম। শান্তিদি খেলেন না। বললেন: ওতে আমার অম্বল হয়।

তবে!

মামী বড় বিব্রত বোধ করলেন।

শান্তিদি হেসে বললেন: আমার জন্যে কেন ভাবছেন! কালকের মিষ্টি ছিল, আমি সাত সকালে তাই খেয়ে নিয়েছি।

তারপর!

মামীর চোখ জোড়া হঠাৎ ছলছল করে উঠল। কিন্তু শান্তিদি হেসে উঠলেন খিলখিল করে। তাঁর কাপড়ের ঝোলাটা দেখালেন। বললেন: এর ভেতর চিঁড়ে আর গুড় আছে। একটুখানি ছায়া আর এক আঁজলা জল পেলেই আমার চলে যাবে।

মামী তাঁর মুখখানা হঠাৎ ঘুরিয়ে নিলেন।

আমরা দুখানা টাঙ্গা নিলুম। মামা স্বাতিকে নিয়ে একখানায় বসলেন। দ্বিতীয়খানায় বসলেন মামী আর শান্তিদি। স্বাতির ইচ্ছা ছিল শান্তিদির সঙ্গে বসবার, কিন্তু মামার পাশে বসতে মামী কিছুতেই রাজী হলেন না। বাকি ছিলুম আমি আর রামখেলাওন। মামী আমাকে ডাকলেন তাঁর টাঙ্গার সামনে বসতে।

কেন জানি না আমার মনে হল যে মামী আমাকে তাঁর নিজের প্রয়োজনে ডাকেন নি। রামখেলাওন সামনে বসলেও চলত। তিনি বোধ হয় অন্য কথা ভাবছেন। ভাবছেন স্বাতির কথা। মেয়েটা বেশি ছেলেমানুষ। নিজের ভাল এখনও ভাল করে বুঝতে শেখে নি। তা না হলে আমার সঙ্গে এমন মাখামাখি করে! উদয়পুরের পরেই তো মাউণ্ট আবু। রাণা সেখানে স্বাতির অপেক্ষা করে আছে।

মামীর দুর্বলতার কথা আমি জানি। মামিও। এ খুবই স্বাভাবিক। ভাল পাত্রের হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করতে কোন্ মা চায় না! কিন্তু এ যুগের মেয়েরা সে কথা বোঝে না যে!

তাদের ভাল মন্দর বিচার অন্য রকম। মামী তাঁর নিজের বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে কোন সমর্থন খুঁজে পান না। কী করে পাবেন। মানুষের মন যদি যুক্তি মেনে চলত, তা হলে সবই তো সহজ হয়ে যেত। পৃথিবীটাই হত অন্য রকম। আমি নিঃশব্দে টাঙ্গার সামনে উঠে বললুম। পরিষ্কার বাঁধানো রাস্তা ধরে ঘোড়া ছুটল খট খট শব্দ তুলে।

উদয়পুর খুব প্রাচীন শহর নয়। চার শো বছর আগে রাণা উদয় এই শহর পত্তন করেন। মোগল বাদশাহ আকবর চিতোর গড় ধ্বংস না করলে এ শহরের জন্ম হয়তো হত না। চিতোর গড় রাণাদের হাতছাড়া হয়েছিল তিন বার। প্রথম বার রাণা রতনসিংহের সময়। হামির তাঁর কৌশলে ও বাহুবলে পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয় বার হাতছাড়া হয়েছিল উদয়সিংহের ভাই বিক্রমের সময়। সেবারে রাণী কর্ণবতীর রাখিবন্ধ ভাই হুমায়ুন গুজরাটের বাহাদুর শাহকে হারিয়ে বিক্রমকে চিতোর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয় বার চিতোর হারালেন উদয়সিংহ নিজে। কোন রকমে পালিয়ে এসে এই উদয়পুরে নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন।

পিছন থেকে শান্তিদি বললেন : কী কী দেখাবেন ভাই ?

আমি এই সম্বোধন শুনে আশ্চর্য হলুম। কিন্তু তা প্রকাশ করে তাঁকে লজ্জা দেবার চেষ্টা করলুম না। বললুম : উদয়পুরে দেখবার জিনিসের অভাব নেই। অনেকের মতে এমন সুন্দর শহর নাকি ভারতে কম আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানে পাহাড় আর হ্রদ উদয়পুরকে অভূতপূর্ব করেছে।

মামী বললেন : সেবারে উদয়পুরে আমরা বোধ হয় আসি নি। চিতোর থেকেই ফিরে গিয়েছিলুম।

মামা থাকলে সঠিক খবর বলতে পারতেন। আমি কিছুই জানি না, তবু বললুম : এবারে তা হলে নতুন জায়গা দেখা হল।

শান্তিদি বললেন : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

বললুম ঃ সোজা সজ্জননিবাস বাগে। সেখানে জু দেখব, জাত্বঘর দেখব, তারপর যাব রাজবাড়ি।

শান্তিদি খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন ঃ আমাদের কি ছেলেমানুষ পেয়েছেন যে প্রথমেই চিড়িয়াখানা দেখাচ্ছেন!

তাঁর এই দমকা হাসিতে মামী বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। তাড়াতাড়ি বললেন ঃ জাত্বঘর কি এত সকালে খোলা পাবে!

সে কথা আমি ভাবি নি। টাঙ্গাওয়ালাও কিছু বলে নি। তার আর ভাবনা কী! একবারের বদলে তুবার যাবে, পয়সা বেশি নেবে। কিন্তু আমাদের সময় নষ্ট। কষ্টও বটে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দ্বিতীয়বার আসাই হবে না। টাঙ্গাওয়ালাকে তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, জাত্বঘর খোলা পাব কি না।

সে লোকটা ঠিক খবর রাখে না, বলল ঃ জানি নে।

জাত্বঘরে আমার আরও একটু কাজ ছিল। আজমীর মিউজিয়মের মিস্টার ভট্টাচার্য আমাকে এখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নাম বলেছিলেন মিস্টার আগরওয়াল। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে সযত্নে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেবেন। জাত্বঘরে এত জিনিস যে এই বুঝিয়ে দেবার বড় প্রয়োজন। কেউ না বোঝালে বোঝা বুঝি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিশেষ ভাবে দেখবার জিনিসও হারিয়ে যায় ভিড়ের ভিতর।

জাত্বঘরের দিকে না গিয়ে আর উপায় নেই। বাজার পেরিয়ে মোড় ফিরে আমরা সজ্জননিবাস গার্ডেনের পথ ধরেছিলুম। অল্পক্ষণেই সেখানে পৌঁছে গেলুম। মস্ত বড় গেট পেরিয়ে বিরাট বাগান। প্রথমেই পেয়ারার বন চোখে পড়ল। জাল দিয়ে পেয়ারা রক্ষা করা হচ্ছে পাখির হাত থেকে।

মামী ঠিকই বলেছিলেন। জাত্বঘরের দরজা বন্ধ। বাড়িটি শুধু দেখতে পাওয়া গেল। আর তার সামনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

এক মর্মর মূর্তি। টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে তার মানে বুঝিয়ে দিল। মহারাণীর স্বর্ণজুবিলীর সময় এই জাতুঘর প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সময় আমি একটু অভাব বোধ করছিলুম। শহরের দ্রষ্টব্য জিনিস সম্বন্ধে ভাল করে কিছু জেনে আসি নি। তাই টাঙ্গা-ওয়ালাকে নানান প্রশ্ন করতে লাগলুম। এরা অনেক কিছুই জানে। কেউ স্বেচ্ছায় বলে, কেউ না জিজ্ঞাসা করলে বলে না। আমার আগ্রহ জেনে টাঙ্গাওয়ালা বলতে শুরু করল। বলল: আমরা এই বাগকে গুলাব বাগ বলি, কিন্তু সরকারী নাম সজ্জননিবাস গার্ডেন। মহারাণা সজ্জনসিংহের নামে এই নাম। এক শো একর জমি জুড়ে আছে।

ততক্ষণে আরও একটু এগিয়ে টাঙ্গাওয়ালা আমাদের চিড়িয়া-খানার সামনে এনে হাজির করেছে। বিশেষ কিছুই নেই। অল্পক্ষণেই আমাদের দেখা হয়ে গেল। টাঙ্গায় আবার উঠবার সময় স্বাতি বলল: টাঙ্গা থেকে নামার মজুরি পোষাল না।

আমাদের টাঙ্গাওয়ালা বলল: জন্তু-জানোয়ার সম্প্রতি অনেক মরে গেছে। তা না হলে—

তাদের কাছে হয়তো একটা বড় দ্রষ্টব্য ছিল।

আমরা এগিয়েই গেলুম। বড় বড় গাছে ঢাকা ছায়াশীতল বাগানটির হয়তো একটা আকর্ষণ আছে। আমাদের মতো এক দিনের যাত্রীর কাছে তা অর্থহীন। শান্তিদি তবু বললেন: তুপুরগুলো নিশ্চয়ই ভারি মিষ্টি হবে।

মামী কোন উত্তর দিলেন না।

বাহিরের রাস্তায় পড়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলুম। টাঙ্গা আমাদের টেনে টেনে উপরে তুলছে। বললুম: এবারে কোথায় যাচ্ছি?

সংক্ষেপে টাঙ্গাওয়ালা বলল: প্যালেস।

একটা বড় ফটকের সামনে টাঙ্গাওয়ালা আমাদের নামিয়ে দিল।

বলল : আপনারা এই পথে ভেতরে যান। আমরা ঘুরে গিয়ে সিংদরজায় অপেক্ষা করব।

মামা একবার রাজবাড়ির দিকে তাকালেন। বিরাট ব্যাপার। গ্র্যানাইট আর মার্বল পাথরের তৈরি এই জনমানবহীন সৌধটির দিকে তাকিয়ে মামা চিন্তিত হলেন। বললেন : নিজেদের দেখতে হবে!

টাঙ্গাওয়ালা বোধ হয় তাঁর দুর্ভাবনার কারণ বুঝতে পেরেছিল। বলল : ভাল গাইড আছে। আমরা ও দরজায় পৌঁছেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলেই তারা টাঙ্গা ছুটিয়ে দিল। আমরা অগ্রসর হলুম ধীরে ধীরে। অনেকটা এগিয়ে ভাবছিলুম, এবারে কোন্ দিকে যাওয়া যায়। একদল মেয়ে পুরুষ আসছিলেন উল্টো দিক থেকে। তাঁরা বললেন : এই দিকে চলে যান।

গাইড এসে একটু পরেই ধরে ফেলল।

তার মুখে অনেক গল্প শোনা গেল। উদয়পুরের বর্তমান রাণা স্বর্গত রাণার পোষ্যপুত্র। এই বিরাট রাজপ্রাসাদের অনেকটাই এখন ভারত সরকারের হাতে গেছে। সরকার নাকি একটা জাদুঘর খুলবেন এই প্রাসাদের এক অংশে। বাকিটা আমরা দেখতে পাব। রাজপরিবার যে মহলে আছেন, সে মহল আমরা পেরিয়ে এসেছি। এবারে আমরা ভিতরটা দেখতে উপরে উঠলুম।

মধ্যযুগের পরিকল্পনা। গাইড বলল : বিলেতের উইণ্ডসর কাস্‌লের সঙ্গে নাকি এই প্রাসাদের অনেক মিল আছে। রাণা উদয়সিংহ এই প্রাসাদ তৈরি শুরু করেন। তারপরের রাণারা মহলের পর মহল যোগ করে যান মিল রেখে। বাঁদি মহল দিলখুসা মহল মতি মহল মানক মহল, যশমন্দির সূর্যপ্রকাশ ভীমবিলাস স্বরূপবিলাস করণবিলাস ও প্রিতমনিবাস। প্রাসাদের এক স্থানে সেই ছায়াশীতল মর্মর মহলটিও আমরা দেখলুম। বড় বড় গাছ আকাশকে আবৃত

করে আছে। সূর্যের আলো কোন রকমে এসে স্থানে স্থানে লুটিয়ে পড়ছে। গাইড বলল: হোলির সময় এখানে রঙের খেলা হত। তার জন্যে এই বাঁধানো জলাশয়।

আর এক স্থানে গিয়ে আমরা বিখ্যাত হ্রদ পিছোলা দেখতে পেলুম। কী অপূর্ব দৃশ্য! সুদূর প্রসারিত নীল জল পাহাড়ের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। তারই মাঝে দুটো প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। গাইড বলল: একটা জগমন্দির আর দ্বিতীয়টা জগনিবাস। এ সমস্তই মানুষের তৈরি হ্রদ। ছোট একটা নদী আগাদা নদীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বয়ে যাচ্ছিল। একটা বাঁধ দিয়ে তার গতিপথ রুদ্ধ করে দেওয়া হল। দেখতে দেখতে জল জমে সৃষ্টি হল এই বিরাট হ্রদের। লম্বায় আড়াই মাইল, আর প্রস্থে প্রায় মাইল দেড়েক। মাঝে মাঝে যে দ্বীপের মতো স্থান ছিল, তারই উপর প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। পাঁচ শো বছরের পুরনো হ্রদ। কিন্তু প্রাসাদ দুটোর বয়স অনেক কম। জগমন্দিরের বয়স হবে তিন শো বছরের বেশি। বাদশাহজাদা খুরম তখনও শাহজাহান হন নি। বাপ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই প্রাসাদেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। জগনিবাস পারের কাছে। বয়সে মাত্র দু শো বছর। চার একর জমির উপর সমস্ত প্রাসাদটিই সাদা মার্বল পাথরে তৈরি।

ছোট নৌকোয় চড়ে আমরা সেই প্রাসাদ দেখতে গেলুম। এঞ্জিন লাগানো নৌকো আছে। তার ভাড়া বেশি, আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু আমরা যে নৌকোয় গেলুম, তার সামান্য ভাড়া। মাথা পিছু কয়েক আনা মাত্র।

কিছু জিনিস স্বাতির ভাল লেগেছিল। তার এক নম্বর হল, বেলজিয়ান কাচের এক সেট আসবাব—খাট পালঙ্ক থেকে চেয়ার টেবিল পর্যন্ত। স্বর্গত রাণা নাকি শিকারের জন্য সফরে যাবার সময়েও এই সব আসবাব সঙ্গে নিতেন। দু নম্বর হল ফুলের

বাগান। এক জায়গায় গোলকধাঁধার মতো জলের নালা কাটা। মাঝে মাঝে ফুলের চাষ। সেখানে রাণার প্রিয় খেলা ছিল শহরের আমীর ওমরাহদের নিয়ে। বাজী রেখে খেলা।

অনেক দূরে জলের ভিতর গাইড একটা স্তম্ভ দেখাল। বলল: একটি মেয়ের স্মৃতিস্তম্ভ। মেয়েটি নাকি দড়ির উপর নাচতে পারত। স্থির হয়েছিল যে এই প্রাসাদ থেকে পাহাড় পর্যন্ত একটা দড়ি ঝোলানো হবে। তার উপর দিয়ে নেচে নেচে সেই মেয়ে গিয়ে পাহাড়ে পৌঁছবে। সফল হলে রাণা তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন। মেয়েটি যখন প্রায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তখন মন্ত্রী ভাবলেন, মুশকিল হল। রাণার অর্ধেক রাজত্ব বুঝি যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি দড়িটা কেটে দিলেন। মেয়েটি জলে পড়ে ডুবে মারা গেল। তারই স্মৃতিস্তম্ভ। এ গল্প শুনে স্বাতি আমার দিকে চাইল অবিশ্বাসের চোখে। আমি কোন মন্তব্য করলুম না।

দূরে পাহাড়ের উপর একটা গড়ের মতো দেখতে পাচ্ছিলুম। তার নাম শুনলুম সজ্জন গড়। শহর থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে রাণা সজ্জনসিংহের তৈরি গড়। পাহাড়ের নিচে থেকে উপর পর্যন্ত প্রায় মাইল দুই রাস্তা।

ফেরার পথে মামা বললেন: জায়গাটি নিতান্ত মন্দ নয়, কী বল গোপাল?

বললুম: প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারতবর্ষে এসে কী বলেছিলেন, আপনার বোধ হয় মনে আছে!

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: অনেক কিছুই হয়তো বলেছিলেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল! বললুম: বলেছিলেন, উদয়পুরের মতো জায়গা আর একটি নেই। উদয়পুর আগে দেখার মানে হল, নিমন্ত্রণ খেতে বসে সেরা খাবারটি আগে খেয়ে ফেলার মতন। পরে আর কোন খাবার মুখে রুচবে না।

স্বাতি বলল: এই বাড়িতে বোধ হয় দিন কয়েক কাটিয়েছিলেন!

সরস্বতী ভাণ্ডার আমাদের দেখা হল না। আমরা অনুমতি নিই নি। প্রায় তিন শো বছরের পুরনো লাইব্রেরি। সংস্কৃত প্রাকৃত হিন্দী রাজস্থানী এমন কি উর্দু ও ফার্সী ভাষারও অসংখ্য পুঁথি আছে। সাড়ে পাঁচ শো বছরের প্রাচীন পুঁথিও আছে। রাজস্থানের ইতিহাস লেখবার সময় কর্নেল টড এই লাইব্রেরির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

রাজবাড়ি থেকে আমরা দেবমন্দিরে গেলুম। জগদীশ মন্দির। আমাদের টাঙ্গা দুখানা প্রাসাদের সিংহদ্বারে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তাতে উঠবার দরকার হল না। অল্প পথ, হেঁটেই আমরা মন্দিরে পৌঁছে গেলুম। রাস্তা থেকে বত্রিশটা ধাপ উঠেছে মন্দিরের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত। তিনতলা বিষ্ণুর মন্দির। তিন শো বছরের পুরনো। সামনে পিতলের গরুড় মূর্তি। প্রাঙ্গণের চার কোণে ছোট ছোট আরও চারটি মন্দির। দেবতা হলেন শিব শক্তি সূর্য ও গণেশ। মামী খেয়ে বেরিয়েছিলেন। তাই পুজোর জন্য দেরি করলেন না, শুধু শান্তিদি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন অল্পক্ষণের জন্য।

মধ্যাহ্নের রোদ ক্রমেই তীক্ষ্ণ হচ্ছিল। মামা বললেন: আর কী দেখবার আছে তাড়াতাড়ি দেখে নাও।

টাঙ্গাওয়ালা আর দেরি না করে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। বাজারের ভিতর দিয়ে পোলের তলা দিয়ে মোড় পেরিয়ে একেবারে ফতে-সাগরের দিকে। পোল পেরিয়ে যাবার সময় টাঙ্গাওয়ালা বলল: উদয়পুরে পোল আছে এগারটা, তার ভেতর এমনি বড় বড় পোল চারদিকে চারটে। উত্তরে হাতি পোল, দক্ষিণে কিশান পোল, পূর্বে সূর্য পোল আর পশ্চিমে ব্রহ্মা পোল।

শহরেরও একটু বর্ণনা দিল। বলল: দক্ষিণ পশ্চিমে পিছোলা আর তিন দিক দেওয়ালে ঘেরা।

মনে পড়ল, কে একজন এই শহরকে বলে গেছেন ভেনিস অব দি ইস্ট। ফার্গুসন সাহেব এর বর্ণনায় চতুর্মুখ হয়েছিলেন

জগমন্দির আর জগনিবাসের কথায় বলেছিলেন যে এমন সুন্দর জিনিসের তুলনা ইউরোপেও মিলবে না।

রাজসরকারের বড় বড় হোটেল আর গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে আমরা ফতেসাগরের তীরে এসে পৌঁছলুম। রাণা ফতেসিংহের তৈরি বলে এই নাম। এক মাইল চওড়া আর লম্বায় মাইল দেড়েক। বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়েছে। তারপর খাল কেটে নেওয়া হয়েছে চাষের জন্য। পিছোলা থেকেও খাল আছে।

মেবার রাজ্যে এমনই নকল হ্রদের অভাব নেই একেবারে। সমুদ্রের মতো বড় বড় হ্রদ, নামও সমুদ্র। জয়সমন্দ রাজসমন্দ উদয়সাগর জয়সাগর। জয়সমন্দের মতো বড় নকল হ্রদ পৃথিবীতে কোথাও আছে কিনা জানা নেই। তিরিশ মাইল তার পরিধি। উদয়পুর থেকে মোটরে বত্রিশ মাইল পথ। সুন্দর পথ। তেমনই সুন্দর হ্রদ। বাঁধের উপরেও অনেক কিছু দেখবার আছে। মাঝখানে শিবের মন্দির, ছত্রি আর প্রাসাদ। পাহাড়ের উপরেও প্রাসাদ।

দেড় কোটি টাকা ব্যয় করে রাজসমন্দ নির্মাণ করেছিলেন রাণা রাজসিংহ। মাইল চারেক লম্বা হ্রদের উপর ধনুকের মতো বাঁকা বাঁধটি মাইল তিনেক হবে। এক সময় শুধু জলই জমত, এখন খাল কেটে চাষের জল নেওয়া হয়। বাঁধের এক দিকে একটা ছোট দুর্গ, তার ভিতর জৈন মন্দির। অন্য দিকে রাণার মর্মর প্রাসাদ। কিন্তু এই বাঁধের উপরেই এমন আর একটি জিনিস আছে যা ভারতের আর কোথাও নেই। রণছোড় ভাট্টের লেখা সংস্কৃত কাব্য রাজ-প্রশস্তি, রাণা জয়সিংহের রাজত্বকালে লেখা মেবারের ইতিহাস। এই কাব্যের চব্বিশটা সর্গ, সেগুলি পাথরে লিখে বাঁধের শোভা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পঁচিশখানা পাথরে এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এত বড় শিলালিপির সন্ধান আজও কোথাও মেলে নি।

উদয়সাগর শহরের কাছে, মাইল আষ্টেক দূর হবে। রাণা

উদয়ের তৈরি বলেই এর উদয়সাগর নাম। আহাদা নদী এখানে বাঁধা পড়েছে। লোকে বলে, এরই বাঁধের উপর মানসিংহের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল রাণা প্রতাপের। তারপরেই হলদিঘাটের যুদ্ধ।

জনসাগরকে লোকে এখন বাড়ি কা তালাও বলে। শহর থেকে দূর হবে মাইল পাঁচেক। শান্ত শীতল জায়গা। বেড়াবার উপযুক্ত বটে।

এ সব গল্প কোন লোকের মুখে শুনি নি। একটা গাইড বইয়ে দেখেছিলুম। সেই সঙ্গে আরও দুটো দ্রষ্টব্য স্থানের নাম পেয়েছি। একটা আহাদা গ্রাম, উদয়পুরের দু মাইল পূর্বে প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। জৈন সাহিত্যে এর নাম পাওয়া যায় আঘাতপুর বা আতপুর। মালবের পরমার রাজা মুঞ্জ এই শহর ধ্বংস করেন দশম শতাব্দীতে। আবার গড়ে উঠছিল, কিন্তু ভূমিকম্পে শেষ হয়ে যায়। আহাদার কাছেই যে ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, লোকে বলে বিক্রমাদিত্যের পূর্বপুরুষেরা সেখানে বাস করেছেন। উজ্জয়িনী প্রতিষ্ঠার পূর্বে আশাদিত্য এখানে তম্বাবতী নগরী স্থাপন করেছিলেন। এখন লোকে আহাদায় যায় রাণাদের সমাধি দেখতে, আর কুণ্ডে স্নান করতে। এখানকার কুণ্ড স্নানে নাকি গঙ্গা স্নানের পুণ্য। কাছে শিব মন্দির আছে, জৈন মন্দিরও আছে গোটাকয়েক। ভীলদেরও বড় তীর্থ।

দ্বিতীয় স্থান হল খাস ওড়ি। পিছোলার দক্ষিণ প্রান্তে একটি ছোট প্রাসাদ। নৌকোয় গেলেই ভাল, কিন্তু ফিরতে হবে রাস্তা ধরে। সন্ধ্যে বেলায় এই পথে অসংখ্য বুনো শুয়োর খেতে আসে।

এই কথায় আর একটি গল্প মনে পড়ল। রেলের একখানা গাইড বইয়ে অনেক দিন আগে দেখেছিলুম যে জয়সমন্দ থেকে ফেরার পথে নাকি বুনো শুয়োর দেখতে পাওয়া যায় অগণিত। কাছের ও দূরের পাহাড় থেকে পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে তারা খেতে আসে। রাণার খরচে ভোজ, রোজ একই সময়। অদ্ভুত সে দৃশ্য। এই বুনো

শুয়োরগুলো গরিব প্রজাদের ক্ষেতে অনেক ক্ষতি করত। প্রজাদের রক্ষার জন্যেই নাকি রাণা এই ব্যবস্থা করেছেন।

টাঙ্গাওয়ালাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল না যে তারা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মামার টাঙ্গা আগে, পিছনে আমাদের। মামা পিছনে বসেছেন, আমি বসেছি সামনে। দুজনে মুখোমুখি। স্বাতিকেও দেখতে পাচ্ছি। মামা বললেন: এরা আবার কোথায় চলল?

আমার টাঙ্গাওয়ালা বোধ হয় প্রশ্নটা বুঝেছিল, বলল: শাহেলিয়োঁ কি বাড়ি।

বিরক্ত ভাবে মামা বললেন: নিজেদের বাড়ি কখন যাব, সেই কথা জিজ্ঞেস কর।

বেলা বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা ও উত্তাপ। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগে টাঙ্গাওয়ালা বলল: বাঁদীদের বাড়ি নাম হতে পারে, কিন্তু এমন সুন্দর জায়গা উদয়পুরে আর নেই।

ফতেসাগরের বাঁধ ছাড়িয়ে এ একটি সুন্দর বাগান। বড় বড় গাছে ঢাকা, ছায়াশীতল সুন্দর স্থান। মাঝখানে একটি ছোট প্রাসাদ। রাণা ফতে সিংহের তৈরি। তারই অঙ্গনে বাঁধানো স্নানের জায়গা। চারি দিকে অসংখ্য ফোয়ারা। কিছু দক্ষিণা জমা করে সেই সব ফোয়ারা থেকে জলের উৎক্ষেপ দেখতে হয়। আমরাও দেখলুম। ভিতরে বাহিরে নানা স্থানে ফোয়ারা আছে। কিন্তু ফুল সব শুকিয়ে গেছে। নতুন চারায় ফুল এখনও ফোটে নি।

মাথার উপরে মধ্যাহ্নের তীব্র রোদ। তবু আমাদের শরীর জুড়িয়ে গেল। মামা মেনে নিলেন, বললেন: বাঁদীরা সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল।

স্বাতি বলল: এরা কি আমাদের বাঁদী?

টাঙ্গায় উঠতে উঠতে মামা বললেন: তা বটে।

এবারে আর কোথাও নয়। মামার আদেশ মতো সোজা নিজেদের বাড়ি। টাঙ্গাওয়ালারা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সবাই আমরা চুপ করে ছিলুম। হঠাৎ মামী কথা কইলেন, বললেন: তোমার পায়ে ও কিসের দাগ মা?

আমি পিছন ফিরে শান্তিদির মুখের দিকে তাকালুম। দেখলুম যে তিনি বড় অস্বস্তি বোধ করছেন। এমন একটা প্রশ্নের উত্তর যে সহসা তাঁকে দিতে হবে, তা তিনি কল্পনাও করেন নি। তবু হঠাৎ হেসে উঠলেন খিলখিল করে।

তাঁর হাসি শুনে মামী অপ্রতিভ হলেন। কিন্তু শান্তিদি তাঁকে অপ্রতিভ থাকতে দিলেন না। বললেন: ও আমার গিন্নীপনার চেষ্টা।

মামী আশ্বস্ত হলেন অপরিমিত। বললেন: ওমা, রাঁধতে গিয়ে অমন করে পুড়িয়ে ফেলেছ!

শান্তিদি হাসতে লাগলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

উদয়পুর থেকে একখানা কোচ আহমেদাবাদ যায়। তিন শ্রেণীর যাত্রীই তাতে যেতে পারে। মামার খুব সুবিধে হয়েছে। তাঁর নামে একখানি গোটা কম্পার্টমেন্ট। চারখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। আমাদের ব্যবস্থা বড় কাঁচা। আমার আর শান্তিদির। শান্তিদিকে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় একা তুলে দিয়ে আমি মামার সঙ্গে নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারব না। কাজেই আমাকে শান্তিদির সঙ্গেই থাকতে হবে। রাত সাড়ে বারোটায় আমরা মারবাড় জংসনে পৌঁছব, দিল্লী এক্সপ্রেস আসবে রাত দেড়টায়। শান্তিদিকে তাঁর দলের সঙ্গে তুলে দিয়ে আমার ছুটি। অত রাত্রে মামার গাড়িতে আর আসা যায় না। তাতেও ক্ষতি নেই। ভোর সাড়ে পাঁচটায় তো আবু রোড পৌঁছব। রাতটা কোন মতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছিলুম মামার জন্য। তিনি আমাকে তাঁরই সঙ্গে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন। শান্তিদির কথা তুললে তাঁকেও সঙ্গে যাবার জন্য বলবেন। আমি জানি, শান্তিদি এ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হবেন না। তার পরে কী হবে!

চারটে চল্লিশ মিনিটে আমাদের ট্রেন ছাড়বে। তার দেরি আছে। মামী একখানা বেঞ্চির উপর চোখ বুজে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়েছেন বললে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। মামা কাত হয়ে আছেন একখানা আরাম চৌকির উপর। তাঁর নাক ডাকছে। স্বাতি বলল: চল না গোপালদা, বাইরেটা একটু ঘুরে দেখি।

ঘুরে দেখার মতো বড় স্টেশন নয়। একটিই প্ল্যাটফর্ম। এক দিকেই ট্রেন যায়। আমাদের ট্রেনখানি খালি দাঁড়িয়ে আছে।

দরজার কাছে এসে স্বাতি দাঁড়িয়ে গেল। বলল: দিদি আসবেন না?

শান্তিদি একখানা চেয়ারে বসে ছিলেন অলস ভাবে। উত্তরে শুধু হাসলেন একটুখানি। সেই হাসিতে কী ছিল জানি নে, স্বাতি লজ্জা পেল। আমার দিকে ফিরে বলল: চল গোপালদা।

বেশি দূর যাবার আগেই একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। একখানা গাড়ির ছাদ থেকে শামিয়ানার মত বড় একখানা সাদা কাপড় প্ল্যাটফর্মের মাঝখান পর্যন্ত ঢেকে আছে। গাড়ির ছাদের উপর কয়েকজন লোক এই কাপড় ধরে আছে। নিচেও কয়েকজন লোক। আর সব চেয়ে আশ্চর্য লাগল এই সন্দেহ করে যে ঢাকার ভিতর কিছু কাজ হচ্ছে। জনকয়েক দর্শকও দেখতে পেলুম। স্বাতি বলল: কী হচ্ছে বল তো?

স্বাতির প্রশ্ন শুনে আমি পাশের এক দর্শককে এই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। ভদ্রলোক জানতেন। বললেন: রাণীসাহেবা যাচ্ছেন।

স্বাতি বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে তার বিহ্বলতা। এই বিংশ শতাব্দীতেও রাণীসাহেবা এমনই করে যাচ্ছেন!

ভদ্রলোককে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: উদয়পুরের?

উত্তরে ভদ্রলোক এমন একটা নাম করলেন, ভাল বুঝতে পারলুম না।

স্বতিকে আমি লক্ষ্য করছিলুম। তার বিস্ময়ের যেন সীমা নেই। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল: বাঙলা গল্পের বই তুমি পড় গোপালদা?

কেন বল তো!

স্বাতি বলল: স্কুলের বইয়ে অনেক রাজপুত কাহিনী পড়েছি, কিন্তু সে সব বীরত্বের আর মহত্বের কাহিনী। কিন্তু এ কালের

বাঙলা বইয়ে যে সব রাজপুত কাহিনী পড়ছি, তা পড়ে গা ঘিন ঘিন করে। সভ্য সমাজে এমন নোংরামির কথা কখনও শুনি নি।

আমি কোন উত্তর দিলুম না। বাধা দিতে পারতুম, কিন্তু তাতে লাভ কী! তার চেয়ে যতটুকু তার বলবার আর যতটুকু বলা যায়, তাই সে বলুক। সে থামলে তখন কথা বলা যাবে। স্বাতি বলল : এই সব গল্প পড়ে রাজস্থানের লোকের সম্বন্ধে আমার অন্য ধারণা হয়েছে।

স্বাতি খুব আস্তে আস্তেই কথা বলছিল। তবুও আমি খানিকটা পিছিয়ে এলুম। চারি দিকে যে রাজস্থানেরই লোক। দেশটাও রাজস্থান। স্বাতিও পিছিয়ে এল, কিন্তু বলল সহজ ভাবে : বাঙলায় গল্প উপন্যাস পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে এ দেশে দু রকমের লোক আছে। যারা বাইরে এসেছে, তাদের পরিচয় তুমি কলকাতার বড়বাজারে পেয়েছ। আর যারা দেশে আছে, তারাই দিনের বেলায় অকর্মণ্য অলস, আর রাতে কুৎসিত মাতাল। নরকের মতো বীভৎস তাদের অন্তঃপুর। যত কড়াকড়ি তত অসংযম। মধ্যযুগের বর্বরতা থেকে এখনও এরা মুক্ত হতে পারে নি।

আমি হাসছিলুম তার কথা শুনে। স্বাতি ক্ষেপে গেল। বলল : হাসছ যে!

এ সবই তো তোমার গল্প-পড়া বিদ্যে, তাই না!

ভুল বলেছি!

ভুল বল নি, ভুল জেনেছ।

কেন!

তোমার গল্পের লেখকরা বেশ জমিয়ে লিখেছে। জাতে বাঙালী তো, বাঙালী পাঠকের রুচি জানে। যে যত বেশি জানে, সে তত বড় লেখক।

মানে!

এমন গল্প বাঙালীদের নিয়েও অনেক আছে। বেশি আছে। এক একখানা বই পড়লে তোমার মনে হবে যে বাঙালী জাত এখনও

জানোয়ারের পর্যায়েই পড়ে আছে, লেখাপড়া শিখেও সভ্য হয় নি। কবে হবে, তাও অনুমান করা যায় না।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বললুম : অন্য জাত সম্বন্ধে লিখলে বেশি সত্যি মনে হয় কিনা, তাই বেশি মুখরোচক লাগে।

স্বাতি একটু ক্ষুণ্ন ভাবে বলল : তা হলে এ সব গল্প তুমি বিশ্বাস কর না ?

করি বইকি !

কর !

কিন্তু একটা লোক দিয়ে একটা জাতের বিচার করি না। রাজা আর আমীর ওমরাহ রাজস্থানে কটা আছে ! দেশের সমস্ত লোকই তো নেংটে উপবাসী। মাটি খুঁড়ে জল পায় না, শস্য পায় না চাষ করে এরা যে পেটের ভাবনাতেই খুন হচ্ছে ! অলস বিলাসী হবার সুযোগ এদের কোথায় !

হয়তো আরও কিছু বলতে পারতুম। কিন্তু সে সুযোগ পেলুম না। ছাদের উপর যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সেই বিরাট কাপড়খানা ছেড়ে দিল। নিচের লোকেরা নিল টেনে। ভিতর থেকে একখানা ঝকঝকে মোটর বেরিয়ে পড়ল। বিরাট নতুন গাড়ি। রাণীসাহেবের যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই।

ড্রাইভার যে এতক্ষণ বাহিরে ছিল তা লক্ষ্য করি নি। এবারে গাড়িতে উঠে খানিকটা পিছিয়ে এল। তারপর বাঁ দিকে ফিরে বেরিয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম থেকে। স্টেশনের বেড়ার সঙ্গে এ দরজাটা মিলে ছিল, সকালে তাই লক্ষ্য করি নি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। আমি তাকাতেই বলল : আমার নতুন অভিজ্ঞতা হল গোপালদা !

কী রকম !

অসূর্যম্পশ্যা কথাটা বই পড়ে শিখেছিলাম। ভাবতাম, এটাও

বোধ হয় সেই আকাশচুম্বী শব্দের মতো বাড়িয়ে বলা। কথাটা যে কত বড় সত্য, আজ তা দেখতে পেলাম।

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

স্বাতি বলল: পৃথিবীটাকে স্বাধীন ভাবে দেখবার অধিকার কি এদের নেই!

বললুম: এ কথার উত্তর আমার জানা নেই। তবে কিছু দিন আগে একটি মারওয়াড়ী বউকে দেখেছিলুম। সে তার স্বামীর সঙ্গে দেশে ফিরছিল। ঘোমটায় সমস্ত আবৃত করে গাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল। তারপর তার স্বামী একখানা রঙীন শাড়ি টাঙিয়ে দিয়েছিল। তার একটা কোণা জানলার সঙ্গে আর একটা দেওয়ালের হুকে বেঁধে বউকে আড়াল করে দিল। কিন্তু শাড়িটা পাতলা বলে আমরা সবই দেখতে পাচ্ছিলুম।

স্বাতির বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার কথা। তাই বললুম: গল্প এইখানেই শেষ নয়। তবে বাকিটুকু না বললেই ভাল।

স্বাতির চোখ দেখে মনে হল যে সে এবারে কৌতূহলী হয়েছে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। বললুম: বউএর কোলে একটা বাচ্চা ছেলে ছিল।

বাকিটুকু স্বাতি আর বলতে দিল না। জিজ্ঞাসা করল: এই সব মেয়েরা সময় কী করে কাটায় গোপালদা?

অন্তঃপুরে বাঘবন্দী খেলে।

তুমি ঠাট্টা করছ!

তা হলে বল যে নিজেরাই বন্দী হয়ে আছে।

কিন্তু কী করে থাকে!

কষ্ট কেন হবে! সকাল বেলা তো ওঠবার তাড়া নেই। কোন রকমে খানিকটা সময় কাটাতে পারলেই স্নান খাওয়া। তারপর ঘুম। বিকেল বেলায় প্রসাধন শেষ করতে না করতেই কর্তাদের

মজলিশ গরম। থা-তেই-ই-তা শুরু হয়ে গেছে। পরদার পেছনে কান পেতে যত রাত ইচ্ছে জাগো।

স্বাতি বোধ হয় সবটুকু বুঝতে পারল না। বলল : থা-তেই-ই-তা কী?

থর্‌র্‌ ছ্যাক্‌।

কী বলছ!

এ সব আমার কথা নয়। রাজোয়াড়া পড়। কথক নাচ কাকে বলে জানতে পারবে।

কথক নাচ তো উত্তর ভারতের নাচ। এই রাজস্থানে কেন আসবে!

মন্দির থেকে যে ভাবে এ নাচ দিল্লীর দরবারে গেছে, ঠিক সেই ভাবেই এসেছে রাজস্থানের রাজবাড়িতে আর আমীর ওমরাহের বৈঠকখানায়।

স্বাতি আশ্চর্য হল আমার কথা শুনে, বলল : কথক নাচের জন্ম কি মন্দিরের ভেতর!

কথা মানে গল্প, আর যারা গল্প বলে তাদেরই আমরা কথক বলি। বাঙলা দেশে কথক ঠাকুর। একটা সময় এল যখন কথক ঠাকুর হাত নেড়ে গল্প শুরু করলেন। লোকে খুশী হচ্ছে দেখে অঙ্গভঙ্গিও করলেন। সকলের শেষে পা। দু পায়ে ঘুঙুর বাঁধলেন। ইয়ার দোস্তের মুখে গল্প শুনে বাদশাহ ভাবলেন, ভারি মজা তো! ধরে আন কথক ঠাকুরকে। কথক ঠাকুর আর কী করবেন! মন্দির ছেড়ে দরবারে এলেন, আদব কায়দা শিখলেন, শিখলেন নাচের কায়দাও। কিছু দিন যেতে না যেতেই কথক হল সরকারী নাচ।

তারপর?

রাজস্থানের রাজা আর রাওয়াল রাজারা দিল্লীর দরবারে উপভোগ করতে শিখলেন কথক। বাইরে এসে গোঁফ চোমরালেন বার কয়েক। তারপরেই রাজস্থানে এই নাচ রপ্তানী করে দিলেন।

রপ্তানী মানে তো বিদেয় করা!

দিল্লী থেকে রপ্তানী করা মানেই রাজস্থানে আমদানী। এক দিন দেখবে নাকি?

তবলার তালের সঙ্গে ঠক ঠক করে পা ঠোকা তো! ও আমার ভাল লাগে না।

ওর আর্ট জান না বলেই ভাল লাগে না। যদি ওর লহরা ঠাট জানতে, সালামি তোড়া গৎ, ঠুংরী ভাব আর জয়পুর ঘরানা, তা হলে পছন্দ না করে পারতে না।

কী বলছ এসব!

তাও তো সব বলছি না। বই পড়ে শিল্পে অধিকার জন্মায় না। তা হলে আমিও হয়তো নাচতে পারতুম। কথক নাচের ওপর ভাল প্রবন্ধ আমি পড়েছি।

কেন জানি না স্বাতি এবারে কৌতূহলী হল, বলল: তা হলে আরও কিছু বল।

ওই তোড়া আর সালামি তোমাকে বোঝাতে পারব না। যা বোঝাতে পারব সেটা এই নাচের ইতিহাস।

ইতিহাসের নামেই স্বাতি নাক সিঁটকাবে জানি। তাই তাড়াতাড়ি বললুম: ইতিহাস মানে, কথক ঠাকুর থেকে নাচওয়ালী এল কখন আর নৃত্য কেমন করে অভিনয় হয়ে দাঁড়াল।

স্বাতি হেসে বলল: ভয় পেয়ো না, এ ইতিহাসে আমার অরুচি নেই।

নোটবুকে টুকে রাখব!

তোমার নোটবুক আছে কি!

বলে স্বাতি হাসল। আর আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: সেই হয়েছে মুশকিল।

স্বাতি বলল: এইবারে বল।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলুম। মাথার উপর খোলা আকাশ। প্রখর রোদ। কিন্তু আমাদের আলোচনায় তাতে ব্যাঘাত হল না। বললুম: রঙীন কাপড় পরে কথক ঠাকুররা নাচতেন মন্দিরে। দরবারে এসেই তাঁদের পোশাক বদলাল। পরলেন চুড়িদার পাজামা আর লম্বা অঙ্গরাখা। দুদিন যেতে না যেতেই বাদশাহ বললেন, এ সব কেঠো পুরুষের নাচ ভাল লাগে না। বোলাও নাচওয়ালী। দেখতে দেখতে নাচওয়ালী এল দলে দলে। পুরুষদের কাছেই নাচ শিখল। সেই চুড়িদার পাজামা আর অঙ্গরাখা। কেউ ঘাগরা চোলি আর ওড়নি। আজকের দিনে শাড়ি আর ব্লাউজ পরেও নাচছে কেউ কেউ।

একটু দম নিয়ে বললুম: এবারে অভিনয়ের কথা বলি। একদা এক রসিক বললেন, এমন নৃত্যপরা বিম্বাধরা সুন্দরী, এদের পদপল্লবমুদারমের দিকে সারাক্ষণ চেয়ে থাকতে পারি নে। রসসৃষ্টির জন্যে তো পা নয়, তার জন্যে ওপরের দিকে তাকানো দরকার। সত্যি কথা। হাত মুখ না নাড়লে চলবে কেন! দেহটাও দোলাতে হবে পল্লবিনী লতেব। যন্ত্রসঙ্গীতেরও পরিবর্তন হল। সারেঙ্গীর সঙ্গে বেহালা দিলরুবা এল, এখন অর্কেস্ট্রা বাজছে। নর্তকী নিজে গানও গাইছে। এ সবের নাম হল ঠুংরী ভাব। ঠুংরী বোঝ তো!

স্বাতি বলল: একটা বিশেষ ঢঙের গান।

সাধারণত প্রেমের গান। কাজেই নাচটা জমে ভাল। একই পদ বারে বারে গাইলে ক্ষতি নেই, অঙ্গভঙ্গিটা প্রতিবারেই বদলাও। কিন্তু জয়পুরের শিল্পীরা এতে চটে গেল। বললে, এ কী অলক্ষণে ব্যাপার! নাচের ভেতর আবার অভিনয় কেন! লক্ষ্ণৌয়ে যারা অভিনয় শুরু করেছে পুরোদমে, তারা বললে, নাচ কি কলের! নাচে দরদ মেলালেই তো অভিনয় হল। এক সময় এই জয়পুরের ঘরানা আর লক্ষ্ণৌয়ের ঘরানায় তফাত ছিল অনেক। দিনে দিনে এই তফাত আজকাল মিলিয়ে যাচ্ছে।

স্বাতি বলল : দক্ষিণে নৃত্যশিল্পীর যেমন বড় বড় নাম শুনেছি, কথকের তেমন শুনি নি।

আমি শুনেছি। জয়পুরের জয়লাল ও তাঁর মেয়ে জয়কুমারীর নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে পিতার মৃত্যুর পরে কন্যা আর নাচেন না। লক্ষ্মৌয়ে তেমনি ঠাকুরপ্রসাদ আর তাঁর দুই ছেলে কালকাদীন আর বিন্দাদীন। অচ্ছন মহারাজ শম্ভু মহারাজ ও লাচ্ছু মহারাজ হলেন কালকাদীনের বংশধর। অচ্ছন মহারাজের চেহারা দেখে কেউ বিশ্বাস করত না যে তিনি নাচতে পারেন। এমন ভারি চেহারা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই শূন্য স্থান আজও পূর্ণ হয় নি। শম্ভু ও লাচ্ছু দুই মহারাজই সরকারী পুরস্কার পেয়েছেন।

প্ল্যাটফর্মের শেষ পর্যন্ত গিয়ে আমরা ফিরে এসেছিলুম। ছাদের নিচে বইয়ের দোকানটার কাছে পৌঁছতেই শান্তিদির মুখ দেখতে পেলুম। তিনি ওয়েটিং রুমের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বুঝি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। দেখতে পেয়েই বললেন : এই দুপুর রোদে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : দুপুর রোদ কোথায় শান্তিদি, জয়পুরের দরবারে যে আমরা কথক নাচ দেখছিলুম।

শান্তিদি ফ্যাল ফ্যাল করে চাইলেন আমার মুখের দিকে।

স্বাতি বলল : আর পাথরের জালের ফাঁক দিয়ে অন্তঃপুরের মেয়েরাও দেখছিল নাচ।

আমি হেসে ফেললুম। বললুম : স্বাতি স্বপ্ন দেখছিল।

শান্তিদি হেসে উঠলেন খিলখিল করে। বললেন : উৎসবটা কিসের জন্যে তা তো জানলুম না।

চট করে এ কথার উত্তর স্বাতি দিতে পারল না।

৩০

ওয়েটিং রুমের ভিতর মামার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম না। এইবারে তাঁর ডাক শুনলুম : গোপাল কোথায়!

এই যে!

বলে আমি এগিয়ে গেলুম।

মামীও উঠে বসেছিলেন। ঘড়ি দেখে মামা বললেন : গাড়িতে ওঠবার আগে একটুখানি চা খেয়ে নিলে কেমন হয়!

মামী বললেন : এই তো ভাত খেলে!

দেরিতে ভাত খেয়েছি বলে কি চা-ও দেরিতে খাব!

বাদানুবাদের অপেক্ষা না করে আমি চায়ের জন্য বলে এলুম। ফিরে এসে দেখলুম যে মামা পাইপ ধরাচ্ছেন। স্বাতি আর শান্তিদিও এসে কাছে বসেছেন। মামা বললেন : রাজস্থান দেখা আমাদের মোটামুটি শেষ হয়েছে, কী বল!

স্বাতি বলে উঠল : বুঁদির কেল্লাই তো এখনও দেখি নি! বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে থাকবে যতক্ষণ!

হেসে বললুম : কোটা বুঁদির অন্য পথ। দিল্লী থেকে ফ্রন্টিয়ার মেলে বম্বে যাবার পথে কোটায় নেমে মোটরে বুঁদি যেয়ো। পথ তিরিশ মাইলের কম।

উদয়পুরের চেয়েও কি ভাল জায়গা!

পাহাড়ের মাঝখানে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা শহর। রাজপ্রাসাদ একটা হ্রদের ধারে, মাঝে কয়েকটি মন্দির। সুন্দর বই কি!

এ সবই আমার রাস্তায় শোনা কথা। সেই সঙ্গে যোগ করলুম : বাঘ শিকারের শখ যদি থাকে তো নিশ্চয়ই সেখানে যেয়ো।

আর কোটা!

চম্বল নদীর ধারে শহর। একটি হ্রদের ধারে বাগান, পুরনো প্রাসাদ একটি, রাজাদের সমাধি আর নতুন প্রাসাদ।

স্বাতি বলল: রাজস্থানে হ্রদ না থাকলে শহর হয় না দেখছি।

মামী হঠাৎ কথা কইলেন, বললেন: কিন্তু ভাল মন্দির দেখলুম না কোথাও।

মামা তখনই সমর্থন করে বললেন: খুব খাঁটি কথা বলেছ!

কিন্তু প্রতিবাদ করল স্বাতি, বলল: কেন, পুষ্করে!

মামী বললেন: তীর্থস্থান বড়। কিন্তু ব্রহ্মার মন্দিরে কি মন ভরে! রামেশ্বরের মতো মন্দির এ দিকে নেই।

বলতে যাচ্ছিলুম যে তেমন মন্দির দেখতে তো আমরা সোমনাথ যাচ্ছি। কিন্তু তার আগেই শাস্তিদি বললেন: দ্বারকায় আমাদের মন ভরবে।

আমি জানি দ্বারকার চেয়েও মামীর সোমনাথ ভাল লাগবে। শ্রীরঙ্গমের চেয়ে রামেশ্বর তাঁর ভাল লেগেছিল। মামী নিজেই সে কথা বললেন: সে দেশে তো সোমনাথও আছেন।

বললুম: এ দেশে একলিঙ্গজী আছেন মামীমা, একটা দিন বেশি থাকলে দুটো ভাল তীর্থস্থান দেখা হত। একলিঙ্গ শিব আর শ্রীনাথ বিষ্ণু।

মামী বললেন: নাম দুটো যেন শোনা মনে হচ্ছে!

পাইপ মুখে মামা একটু হাসলেন। আমি বললুম: উদয়পুর থেকে চোদ্দ মাইল উত্তরে কৈলাসপুরী গ্রাম, সেইখানে একলিঙ্গের মন্দির। সাদা মার্বল পাথরেরই সুন্দর মন্দির, কালো পাথরের চতুর্মুখ শিব। মেবারের রাণারা একলিঙ্গের দেওয়ান হিসেবে রাজ্য শাসন করেন। কেন করেন, তার একটা গল্প আছে।

স্বাতি বলল: গল্প মানেই তো ইতিহাস!

আজকের গল্পই কাল ইতিহাস হবে, তারপর পুরাণ। যেমন গত

কালের ভাবনা আজ উপলব্ধি হয়েছে। তারপরেই হেসে বললুম: দিল্লীর রাণার গল্প আমরা আগ্রহ করে শুনব, কিন্তু মেবারের রাণার গল্প সারা ভারতের লোক পড়বে।

শান্তিদি যে আমার রহস্যটা বুঝতে পারেন নি, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। তাই বললুম: দিল্লীর এক রাণাবাবুর সঙ্গে আমাদের স্বাতির বিয়ে পাকা হয়ে আছে। আবু পাহাড়ে সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাইতেই বাদ দিতে হল তীর্থস্থান দুটো।

তাই নাকি!

শান্তিদির আনন্দ সহসা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু কেউ তা দেখতে পেলো না।

মামা তাড়া দিয়ে বললেন: তোমার গল্পটা বল।

তাড়াতাড়ি বললুম: সূর্যবংশের গুহিলোট কুলের অনাথ ছেলে বাপ্পা। রাজ্য হারিয়ে ব্রাহ্মণদের ঘরে মানুষ হলেন তাঁদের গরু চরিয়ে। একটি ভাল গরু দুধ দিত না। ব্রাহ্মণ ভাবতেন বাপ্পা খেয়ে ফেলে। এ কথা জেনে বাপ্পার বড় লজ্জা হল। পরদিনই গরু ছেড়ে দিয়ে খেলতে না গিয়ে সেই গরুটিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখলেন যে গরুটা পাহাড় বন পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সোজা গিয়ে এক ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছল। তাঁর সামনে একটি শিবলিঙ্গ। গরুটা তার দুধ দিয়ে শিবের স্নান করিয়ে দিল। বাপ্পা দেখলেন, এ এক অলৌকিক ব্যাপার। আর যায় কোথা! ব্রাহ্মণের বাড়ি না ফিরে সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে বাপ্পা একলিঙ্গের সেবা শুরু করলেন। সন্ন্যাসীর দেহরক্ষার পরে লোকে তাঁকেই বলত একলিঙ্গের দেওয়ান। ইতিহাসে এই বাপ্পা হলেন মেবারের রাণা বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

গরু চরানো রাখাল হল রাণা বংশের প্রতিষ্ঠাতা!

কিছু দিন আগে জন্মালে এ সব গল্প স্কুলের বইয়ে পড়তে হত। চিতোরের রাজা তখন মৌর্য বংশের মানসিংহ। সম্বন্ধে বাপ্পার মামা,

কিছু শক্তি সঞ্চয় করে বাপ্পা মামার দরবারে গিয়ে সেনাপতি হয়েছিলেন। পথে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথের। বাপ্পার সুলক্ষণ দেখে তিনি একখানা তলোয়ার দিয়েছিলেন, তার দু দিকে ধার। সে তলোয়ার আজও মেবার দরবারে আছে।

স্বাতি বলল : তারপর মামাকে মেরে ভাগনেই তো রাজা হলেন!

কতকটা তাই। বাপ্পার বীরত্বের তুলনা ছিল না, কিন্তু তাঁর নেমকহারামির কলঙ্ক ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। বাপ্পা তাঁর স্নেহশীল মামাকে রাজ্যচ্যুত করেন।

রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারা চা এনে হাজির করেছিল। প্রথম পেয়ালা চা মামী শান্তিদিকে দিতে যাচ্ছিলেন। শান্তিদি হাত গুটিয়ে বললেন : ও আমি খাই নে।

মামী বুঝতে পেরেই বললেন : তেষ্টায় তো বড় কষ্ট হয় তোমার!

হাসতে হাসতে শান্তিদি বললেন : কষ্ট কিসের!

বলেই তাঁর ঝোলা থেকে একটা জলের বোতল বার করে দেখালেন। মামী হাসলেন, কিন্তু আমি তাঁর এমন শুকনো হাসি কখনও দেখি নি। মামী আমাকে দিলেন সেই চায়ের পেয়ালা। কিন্তু এই চা আমার ভাল লাগল না, স্বাতিরও না। বলল : বিশ্রী চা দিয়েছে।

নিজের জন্যে মামী চা নিলেন না। মামা লক্ষ্য করে বললেন : তুমি নিলে না?

সংক্ষেপে মামী বললেন : বড্ড গরম।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : এবারে শ্রীনাথজীর কথা বল।

নাথদ্বার স্টেশন আমাদের পথে পড়বে। মাভলির পরের স্টেশন। এখান থেকে মোটরে মাইল তিরিশেক উত্তরে, একলিঙ্গজী ছাড়িয়ে ষোল মাইল। নাথদ্বার স্টেশনে নেমেও খুব লাভ নেই, মাইল সাতেক বাসে ঠেঙাতে হবে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : এ সব খবর তুমি পাও কোথায় গোপালদা ?

আগ্রহ করে জানতে চাইলেই লোকে বলে। যেমন বিদ্যে লাভ হয় গুরুকে খুশী করে।

মামী বিরক্ত হচ্ছিলেন। তাই আর সময় নষ্ট না করে বললুম : নাথদ্বারে শ্রীনাথজী কৃষ্ণের মন্দির।

দেওয়ালের ধারে একখানা বেঞ্চির উপর একজন বুড়ো ভদ্রলোক এতক্ষণ ঘুমচ্ছিলেন। তাঁকে হঠাৎ উঠে বসতে দেখে মনে হল যে তিনি এতক্ষণ জেগেই ছিলেন। আমাদের কথাও কিছু কানে গেছে। ভদ্রলোকের ফতুয়া আর তুলসীর মালা দেখে সন্দেহ রইল না যে তিনি বাঙালী বৈষ্ণব। কিন্তু মেজাজটা দেখলুম কিছু উগ্র। বললেন : উদয়পুরে এসে নাথের দুয়ার না দেখে ফিরে যাচ্ছেন !

ব্যস্ত ভাবে আমি বললুম : সময় থাকলে নিশ্চয়ই দেখে যেতুম।

দেখে যেতেন !

বলে ভদ্রলোক যেন একটা ভেংচি কাটলেন।

হঠাৎ আমার শ্রীবাসবাবুর কথা মনে পড়ল। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় গাড়িতে আলাপ হয়েছিল সেই বৈষ্ণব দলটির সঙ্গে। করতাল বাজিয়ে তাঁরা গৌরাঙ্গের নামগান করছিলেন। শ্রীবাসবাবু আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলেন। অমন মিষ্টভাষী সজ্জন মানুষ আমি দেখেছি কি না চট করে মনে পড়ে না। তাঁকে দেখে বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছিল, তা অন্য রকম। এই ভদ্রলোকের ভেংচি কাটা দেখে কেমন একটু বিব্রত বোধ করলুম। কিন্তু কিছু বলবার আগে তিনি নিজেই বললেন : চিড়িয়াখানা, না জাদুঘর, যে দেখে যেতেন !

স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে বেশ খুশী হয়েছে। ভদ্রলোকের দূরত্বটা একবার দেখে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল : গুরু ভালই পেয়েছ !

লজ্জা পেয়ে আমি উত্তর দিলুম: আমরা তো দেখেই যাই! আমরা কি পাই কিছু, না কিছু নিয়ে যাই!

ভদ্রলোক কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি জোর করে বললুম: ওই কালো মূর্তির আড়ালে যা আছে, সে কি আমাদের জন্যে! না আমরা চোখ মেলে চেয়ে থাকলেই তার বেশি কিছু দেখতে পাব! যাঁরা পান, তাঁরা বলবেন দর্শন পেতে যাচ্ছি। নিজেরা দর্শন পেয়ে অন্যকে দর্শন দিতে বসবেন। তাঁকেও আমরা দেখতে যাব।

ভদ্রলোক কী বুঝলেন জানি না, হঠাৎ নরম হয়ে গেলেন। বললেন: নাথের দুয়ারের ওপর দিয়ে কিছুতেই আপনারা যেতে পারবেন না। শ্রীকৃষ্ণের এমন প্রাচীন মূর্তি ভারতে কটা আছে! দ্বাদশ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের মূর্তি, মথুরার বল্লভাচার্য স্বয়ং এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেখান থেকে গিরিগোবর্ধনে সরানো হয় চব্বিশ বৎসর পর। তার প্রায় দেড় শো বছর পর দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব সমস্ত মন্দির ধ্বংস করতে শুরু করলেন। সেই দুদিনে মেবারের রাণা রাজসিংহ তাঁর নিজের রাজ্যে শ্রীনাথজীকে গ্রহণ করলেন।

শুনে আশ্চর্য হবেন: ভদ্রলোক বলতে লাগলেন: শ্রীনাথজী নিজে এই স্থান পছন্দ করেছেন। রথে করে যখন তাঁকে মেবারে আনা হচ্ছে, এইখানে রথের চাকা মাটিতে বসে গেল। রথ আর চলে না। দৈবজ্ঞরা শুনে বললেন যে শ্রীনাথজী এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হতে চান। রাণা রাজসিংহ এইখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু মন্দির করে দিলেন নিতান্ত সাধারণ একখানা বাসগৃহের মতো। দুরাচার ঔরঙ্গজেবের কোপদৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি চান নি।

ভদ্রলোক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন: কত দূর যাবেন আপনারা?

বললুম: দ্বারকা।

ভদ্রলোক আদেশ করলেন: তা হলে বেট দ্বারকা না দেখে যেন

ফিরবেন না। সেখানকার মন্দিরও বাইরে থেকে মন্দির মনে হয় না। ভেতরে গিয়ে মন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আমরা চুপ করে ছিলুম, ভদ্রলোক বললেন: রাজসমন্দের ধারে কাঁকরোলির মন্দির দেখেছেন?

অকপটে স্বীকার করলুম: দেখি নি।

উদয়পুরে এসে ছাই দেখেছেন তা হলে। কেন যে আপনারা আসেন, তা বুঝি না।

কেন বোঝেন না!

সে কথার উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক বললেন: পিছোলা লেকে নৌকোয় উঠেই পিছলে গেলেন! উদয়পুরে যে কিছু দেখবার আছে, সে কথা আর মনেই রইল না। চারভুজজী রূপাজী পরশুরামজী দুর্গাজী রিখবদেবজী—এ সব নামই বোধ হয় শোনেন নি।

তাঁকে চটাবার জন্য বললুম: কেন, শাহেলিয়োঁ কি বাড়ি দেখেছি, ফতেসিং রাণা যার প্রাঙ্গণে বসে কথক নাচ দেখতেন। কী সুন্দর জায়গা! উঠে আসতেই ইচ্ছে করে না।

ভদ্রলোক এমন একটা হুঙ্কার দিলেন যে মনে হল বুঝি ঘরের ভিতর একটা বোমা ফাটল। প্রথমটায় সবাই চমকে উঠেছিলেন। পরক্ষণেই স্বাতিকে হাসতে দেখলুম। মামা ধমক দিয়ে বললেন: কী করছ গোপাল!

আবার আমার শ্রীবাসবাবুর কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর মিষ্টি নামগান। আমিও সুর করে বলে উঠলুম:

কহ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

দাঁতে দাঁত চেপে ভদ্রলোক বললেন: ভণ্ড!

রাগ না করে আমি বললুম: আপনি তো বৈষ্ণব। বল্লভ সম্প্রদায়ের!

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন: কী করে জানলেন!

সে কথার উত্তর না দিয়ে বললুম: উদয়পুরে কেন এসেছিলেন?

ভদ্রলোক শিষ্ট ছেলের মতো উত্তর দিলেন : জগদীশজীর দর্শনে।

নাথের দুয়ারে ধর্মশালায় উঠেছেন তো !

ঠিক বলেছেন।

বলেই ভদ্রলোক বেঞ্চির উপর পা ঝুলিয়ে বসলেন। দেখলুম যে তাঁর সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে আমার মুখের উপর। বললুম : পুষ্টিমার্গ তো সুখী লোকের জন্যে, ধনীর জন্যে। আপনার জন্যে তো নয়।

মানে !

ভদ্রলোক আরও একটু এগিয়ে এলেন।

বললুম : আপনার নিজের ধর্মমত আমার চেয়ে আপনি নিশ্চয়ই বেশি জানেন। যে মতের প্রসার হল না বাঙলা দেশে, রাজপুতানা আর সৌরাষ্ট্রে যা টিকে রইল, সে কি কখনও নিঃসম্বল বাঙালীর হতে পারে! এ মত বেঁচে থাক ব্যবসায়পটু সোনার বেনেদের ভেতর সগৌরবে। বাঙালীর জন্যে আছেন গৌরাঙ্গ—

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে !

ভদ্রলোক কথা কইলেন না। কিন্তু আমি দমলুম না। বললুম : এ দেশের জন্যে এই মতের প্রয়োজন ছিল। দরিদ্রের জন্যে যে ধর্ম সে তো মনের। অনুষ্ঠান হল ধনীদের। তার জন্যে পয়সার দরকার। আর যারা সেই পয়সা দেবে, তারা কৃচ্ছ্রসাধন করবে না। বল্লভাচার্যের ধর্মমত হল ধনী ও বিলাসী গৃহস্থের জন্যে। ভারতবর্ষে এমন গৃহস্থ মিলবে শুধু রাজস্থান আর সৌরাষ্ট্রে।

কুলিরা ওয়েটিং রুমে ঢুকে মালপত্র সংগ্রহ করছিল। মামার দৃষ্টি সে দিকে যেতেই প্রথমে ঘড়ি দেখলেন, তারপরেই অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন : আর নয় গোপাল, এবারে উঠতে হবে।

বলে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন।

সেই ভদ্রলোক হঠাৎ অভিভূতের মতো বলে উঠলেন : আপনার গোপাল নাম !

হেসে বললুম : হ্যাঁ।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি একখানা নোটবুক বার করে বললেন : আপনার ঠিকানাটা যদি দিয়ে যান, দেশে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

আমার উত্তরপাড়ার ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বললুম : হঠাৎ এ শখ কেন বলুন তো!

ভদ্রলোক গদগদ ভাবে বললেন : বয়সে আপনি আমার অনেক ছোট। কিন্তু পনের দিন মঠে থেকে আমি যা সন্দেহ করেছি, আপনি সেখানে না গিয়ে তা বলে দিলেন! ক জায়গায় দান করতে হয় জানেন! বিগ্রহের কাছে, প্রবর্তকের গদিতে, আর শ্রীনাথদ্বারের বাক্সে। তার ওপর গোসাঁই বিদেয়। একবার না এলে ধর্ম থাকে না, তাই আসা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম।

মালপত্র নিয়ে ওয়েটিং রুম থেকে বেরবার সময় ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম : ফিরবেন না নাথদ্বারে?

ভদ্রলোক কাতর স্বরে বললেন : এবারে ঘরে ফিরতে দিন।

শান্তিদি আগেই বেরিয়েছিলেন। বাহির থেকে তাঁর হাসির শব্দ ভেসে এল। ভদ্রলোক নিজেও সেই হাসি শুনতে পেয়েছিলেন। কিন্তু আর চটে উঠলেন না, বললেন : একটা কথা বলে যাবেন গোপালবাবু?

আমি ফিরে দাঁড়ালুম।

আমাকে আপনি চিনলেন কী করে!

যাঁরা নিজে জ্ঞানী, তাঁরা অজ্ঞানকে ক্ষমা করেন, দয়াও করেন। এইটুকুর অভাব দেখলেই আমার সন্দেহ হয়। আপনার ভর্ৎসনার আড়ালে আমি বেদনা দেখেছি।

ভদ্রলোক মাথা নিচু করে আমায় নমস্কার করলেন। আমার মনে হল যে তিনি কায়দা করে তাঁর মুখ লুকোলেন।

৩১

বাহিরে বেরিয়ে শান্তিদিকে আর দেখ্‌তে পেলুম না। স্বাতিও চারি দিকে দেখছিল। বলল: কোন্ গাড়িতে যে উঠে পড়লেন, দেখতে পেলুম না।

মামা চুপ করে রইলেন। তাঁর কামরা রিজার্ভ করা ছিল। দরজার উপর টিকিট লাগানো। সেই গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে দিয়ে আমি শান্তিদিকে খুঁজতে গেলুম। বেশি সময় লাগল না। জানতুম যে একটা খোলামেলা বড় গাড়িতেই তাঁকে দেখতে পাব। বললুম: আমিও আসব।

সে কি! আপনি কেন আসবেন! আপনি ওঁদের সঙ্গেই যান।

হেসে বললুম: সে আমি বুঝব।

মামা আমায় ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। তাঁর নানা ভয়, নানা ভাবনা। মামী স্বীকার করলেন যে শান্তিদিরও একা যাওয়া ঠিক হয় না। স্বাতি বলল: এই গাড়িতেই আন না তাঁকে।

সেই ভাল। টিকিট তার বদলে নাও।

বলে মামা পকেটে হাত দিলেন।

তিনি আসবেন কেন!

কেন আসবেন না?

মামা যেন রুখে উঠলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনতেও পারলেন না। হাসি মুখে শান্তিদি সবাইকে ফিরিয়ে দিলেন।

শান্তিদির কথা আমি তাঁর দলের লোকের মুখে শুনেছিলুম। বড় ঘরের মেয়ে, বউ ছিলেন বড় ঘরের। এখনও কোন অভাব নেই। ইচ্ছে করলে নাকি নিজের লোকজন নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসে

চড়ে তীর্থ করতে পারেন। কিন্তু তা করেন না, বলেন, এক সময় পায়ে হেঁটে তীর্থভ্রমণের রীতি ছিল। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে! শান্তিদি নাকি এ কথাও বলেছেন যে ধর্মে মতি থাকলে তাঁর জীবনটা পুড়ে যেত না।

মামা বললেন: ওখান থেকে তোমার কখন ছুটি হবে?

তখন আর গাড়ি বদল করা যাবে না।

কেন?

মারবাড়ে দিল্লী এক্সপ্রেস আসবে রাত দেড়টায়, সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছব আবু রোড। গাড়ি বদলের চেষ্টা করলে আপনাদের আর ঘুম হবে না।

হুঁ।

বলে মামা চুপ করে গেলেন। স্বাতিও কিছু বলল না। আমি একখানা চাদর আর একটা বালিশ নিয়ে শান্তিদির গাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

শান্তিদি বললেন: কথা শুনলেন না তো!

হেসে বললুম: শান্তিদিকে ফেলে অশান্তিতে যে ঘুমতে পারব না।

শান্তিদি খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

মেবারের একখানা গাইড বই কিনেছিলুম বাজারে। এবারে পকেট থেকে তা বার করলুম। সব কিছু দেখা হয়েছে কিনা, তা মিলিয়ে নেবার ইচ্ছা ছিল। শেষের দিকে দেখলুম মেবারের কয়েকটি প্রাচীন স্থানের নাম। শান্তিদি বললেন: ও আবার কী দেখছেন?

চোখে যা দেখা হল না, বইয়ের পাতায় তা দেখে নিচ্ছি।

যদি না দেখলেই নয় তো জোরে জোরে দেখুন।

প্রথমেই বাদলি নাম। প্রাচীন নাম নাকি ভদ্রাবতী, হুনদের শহর। ভয়ঁসারোদা গড়ের ভিতরেও তার ধ্বংসাবশেষ আছে। নবম ও দশম শতাব্দীর কয়েকটি হিন্দুমন্দির দেখবার মতো—ঘণ্টেশ্বর মহাদেব, অষ্টভুজী মাতা, ত্রিমূর্তি, গণেশ ও নারদের মন্দির।

নারদের মন্দির তো কোথাও দেখি নি!

সত্যি কথা।

কতকটা এই সময়েরই শহর বিন্ধ্যবল্লী। বর্তমান নাম বিজলিয়ান। কিছু পুরনো স্মৃতি আর কয়েকটি মন্দির আছে। কাছেই কয়েকটি জৈন মন্দির। জাহাজপুরের পুরনো নাম যজ্ঞপুর। লোকে বলে যুধিষ্ঠিরের নাতি জনমেজয় এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। কাছেই কয়েকটি শিব মন্দির আছে। আর পাহাড়ের উপর রাণা কুম্ভের তৈরি একটি ছোট দুর্গ। এ সমস্তই উদয়পুর থেকে অনেক দূরে। যা কাছে, তার মধ্যে নাগাদার নাম সকলের আগে করা উচিত। নাগাদিত্যের নামে নাগাদা। এক সময় মেবারের রাজধানী ছিল। বার বার মুসলমানেরা আক্রমণ করেছে। ইলতুৎমিশের সময়েই বোধ হয় ধ্বংস হয়েছে। লোকে এখনও শাস-বহুর বিষ্ণু মন্দির দেখতে যায়। শাস বহু মানে শাশুড়ি বউ। একলিঙ্গজীর খুব কাছে বলে ভিড় লেগেই থাকে। জয়ার, মৈনাল, ডেলওয়াড়া—এ সমস্ত জায়গা উদয়পুরের কাছে। কোথাও হিন্দু, কোথাও জৈন প্রভাব। কোথাও বা দুই-ই আছে।

এই সময় একজন ভদ্রলোক এসে আমার পাশে বসলেন। বয়স আমার চেয়ে খুব বেশি হবে না। কিন্তু চোখে পুরু কাচের চশমা, মাথার চুল অবিন্যস্ত। গায়ে আমার মতোই খদ্দরের জামাকাপড়। লক্ষ্য করে দেখলুম তাঁর বাঁ হাতে একটা কাগজের মোড়ক, খুব যত্ন করে সেটা কোলের উপর রাখলেন। আমি আমার গাইড বই মুড়ে শান্তিদির দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক যেন লজ্জিত হয়ে উঠলেন। হিন্দীতে বললেন: আমি কি আপনাদের বিরক্ত করলুম?

তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে আমি বললুম: বিরক্ত কিসের! আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসুন না।

ভদ্রলোক হাসলেন বটে, কিন্তু সহজ হতে পারলেন না।

গাড়ি ছাড়তেই বইখানা পকেটে পুরে আমি তাঁর সঙ্গেই গল্প শুরু করলুম, বললুম: ভালই হল, আপনি আমার পাশে এসে বসেছেন।

কেন বলুন তো?

আপনার কাছে আমার অনেক জানবার কথা আছে। এই ভ্রমণের পথে সঙ্গী অনেক পেয়েছি, কিন্তু আপনার মতো একজনও পাই নি।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললুম: ঠিকই বলছি। যাঁদের পেয়েছি, তাঁরা সোনা রূপোর দর বলতে পারতেন নির্ভুল ভাবে। তা জেনে আমার কোন লাভ নেই। আমার দরকার অন্য জিনিস।

কিশনগড়ের ডাক্তার বসুর কথা আমার মনে পড়ল। তাঁকে আমি নানান কথা জিজ্ঞাসা করে অনেক জ্বালাতন করেছি। একটা বিষয়ে তিনি আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে পারেন নি। সে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয়। বলেছিলেন, আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর কী রাখি। তবু তিনি আমাকে একেবারে নিরাশ করেন নি। ডিঙ্গল ভাষা ও চারণদের গল্প শুনিয়েছিলেন আমাকে। পরে লিখেও জানিয়েছিলেন। রাজস্থানের চারণরা যে ভাষায় ছড়া কাটতেন, তারই নাম ডিঙ্গল। লোকে এঁদের ভাট কবিও বলে। এঁদের সম্মানের বহর শুনে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলুম। কবিদের সম্মান দেখিয়ে রাজারা নিজে সম্মানিত বোধ করতেন। কোন কবিকে লাখ পশাও দান করা যে কোন রাজার একটা গর্বের বিষয়। লাখ পশাও মানে লাখ টাকার সম্পত্তি দান। কবির জন্য অলঙ্কার, হাতি ঘোড়া উট, নগদ টাকা, তারপর হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তি। রাজা গজসিংহ রাঠোর চোদ্দজন কবিকে চোদ্দ লাখ পশাও দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মহারাজা মানসিংহের গল্প বলেছিলেন ডাক্তার বসু।

মানসিংহ বিকানীরের রাজা রাজসিংহের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এক দিন এক জলসায় রাণীকে বড় প্রফুল্ল দেখলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে তাঁর পিতা সম্প্রতি এমন কাজ করেছেন, যা আর কোন রাজা কখনও করেন নি। এক কবিকে এক ক্রোড় টাকার পশাও দান করেছেন। মানসিংহ সে রাত্রে উত্তর দিলেন না। কিন্তু পরদিনই ছ জন কবিকে ডেকে ছ ক্রোড় টাকার পশাও দান করলেন।

খানিকক্ষণ আমার প্রশ্নের অপেক্ষা করে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কী দরকার?

বুঝতে পারি নি যে নিজের চিন্তার ভিতর আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম। এবারে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললুম: রাজস্থানী সাহিত্যের কথা জানবার দরকার আছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন: তবে আপনি নিরাশ হবেন। আমি আগ্রার মানুষ, নাম শুক্লা। রাজস্থানী সাহিত্যে আমার দখল নেই। এ দেশে সাহিত্য বলে যে কিছু আছে, তাই আমার জানা নেই।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: এ দেশের কবিরা যত রাজসম্মান পেয়েছেন, কোন দেশের কোনও কবির ভাগ্যে তা জুটেছে বলে শুনি নি। বিক্রমাদিত্য বা আকবর ভারতবর্ষে বেশি ছিলেন না।

ভদ্রলোক আমার কথা তখুনি মেনে নিলেন বললেন: রাজস্থানে সত্যিই কবির সম্মান ছিল!

বলেই তাঁর বাঁ হাতের মোড়কটি খুলতে লাগলেন। আমি উৎসুক ভাবে তাঁর হাতের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলুম। এক গোছা ছবির ভিতর থেকে ভদ্রলোক একখানা ছবি বার করলেন। সম্পূর্ণ রাজস্থানী শৈলীতে আঁকা ছবি। বললেন: এই দেখুন রাণা রাজসিংহকে। আর তাঁর সামনে কবি করণীদান। রাণা তাঁর গ্রন্থকে গ্রন্থসাহেবের মতো ভক্তিভরে পূজো করছেন।

কেন বলুন তো!

শুক্লা বললেন: বীর বীনোদে এই গল্পটি আছে। কবি তাঁর স্বরচিত পাঁচখানি গান রাণাকে শুনিয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়ে রাণা বললেন তুমি লাখ পশাও চাও, না চাও তোমার গ্রন্থের পূজা? কবি পয়সার বদলে সম্মান বেছে নিলেন। কিন্তু রাণা দুইই দিলেন।

আর একখানা ছবি দেখবেন?

আমি তাঁর হাতের দিকে চেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলুম। শুক্লা আর একখানি ছবি বার করে বললেন: এই দেখুন রাজস্থানের একটি কবি সম্মেলন। এই চারণ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছিলেন বিকানীর রাজভ্রাতা পৃথ্বীরাজ। এঁকে আমরা অন্য কারণে ভুলব না। একদা তিনি তাঁর কলম দিয়ে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন, রাণা প্রতাপকে বাঁচিয়ে ছিলেন আত্মসমর্পণের হাত থেকে।

রাণা প্রতাপের নাম বাঙলা দেশে কে না জানে! ডি. এল. রায় তাঁকে বাঙলার সম্পদ করে গেছেন। স্বদেশের জন্য এমন আত্মোৎসর্গ পৃথিবীর ইতিহাসে বুঝি কম আছে। রাণা প্রতাপ আজ শুধু রাজস্থানের আদর্শ নন। সারা ভারতের সারা পৃথিবীর আদর্শ। তাঁর পরম শত্রু আকবর তাঁকে নমস্কার করেছেন, আজ বিশ্ববাসী তাঁকে নমস্কার করছে।

শুক্লা আমাকে আবার জাগিয়ে দিলেন। বললেন: কী ভাবছেন!

ভাবছি রাণা প্রতাপের কথা। হলদিঘাট আমাদের দেখা হল না।

হলদিঘাটে দেখবার আর কী আছে! ইচ্ছা থাকলে নাথদোয়ারায় নেমে দেখে যেতে পারেন। সেখান থেকে এগারো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে আরাবল্লী পাহাড়ে একটি সুন্দর জায়গা। মাটির রঙ হলদে বলে নাম হলদিঘাট।

শান্তিদি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: চারণদের এত সম্মান কেন ছিল বলতে পারেন?

তিনি সেই প্রশ্ন বাঙলায় করেছিলেন, আমি হিন্দীতে জানালুম শুক্লাকে। শুক্লা বললেন : শুনেছি এই কবিরা বড় স্পষ্টবাদী ছিলেন।

এই স্পষ্টবাদিতার একটি গল্প আমি টড সাহেবের বইয়ে পড়েছি। যোধপুররাজ অভয় সিংহ ও অম্বরপতি জয় সিংহ তখন পুষ্কর তীর্থে সামন্তদের সঙ্গে সন্ধ্যা উপভোগ করছেন। অভয় সিংহের হঠাৎ কবিতা শোনবার শখ হল। কবি কর্ণকে বললেন সময়োচিত কিছু শোনাবার জন্য। কবি তখন বললেন,

যোধপুর অউর অম্বর, তুনো থাপ উথাপ ;
কূর্মমারা দিকরো, কামধ্বজ মারা বাপ।

ডাক্তার বসু আমায় অন্য পাঠ বলেছিলেন :

চাঁদ সূরয ভেরা হুয়া, দোনো থাপোথাপ।
কুরব মারো ডিকবো, কমধ্বজ মারো বাপ।

মানে অবশ্য একই। চন্দ্র ও সূর্যবংশের রাজারা একত্র হয়েছেন। তুজনেই মহৎ। অম্বর মেরেছেন পুত্র, আর বাপকে মেরেছেন যোধপুর। এমন সময়োচিত প্রশস্তি আর কী হতে পারে!

শুক্লা যোগ করলেন : তুঃসময়ে মন্ত্রণাও দিতেন রাজাদের।

এ গল্পও আমি ডাক্তার বসুর কাছে শুনেছি। একবার অম্বররাজ জয় সিংহ যোধপুরের অজিত সিংহ ও মেবারের রাণা অমর সিংহ ঠিক করলেন যে মোগলদের তাড়িয়ে দিল্লীর তখ্‌ৎ দখল করবেন। কিন্তু বাদশাহ কে হবেন! কঠিন সমস্যা! শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে রাজারা তাঁদের রিয়াসতের শ্রেষ্ঠ কবিদের নিয়ে কিশনগড়ের নিকট হাড়মারা গ্রামে মিলিত হবেন। জয়পুর থেকে কবি এলেন দেবীদান গাড়ন, যোধপুর থেকে দ্বারিক দাস দধিবাড়িয়া, আর মেবার থেকে ঈশ্বরদাস ভাদা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল যোধপুরের সঙ্গে মেবারের। যোধপুরের কবি দ্বারিকাদাস বললেন,

ব্রজ দেশা চন্দন বড়াঁ মেরু পাহাড়াঁ গৌড়।
গরুড় খগাঁ লঙ্কা গড়াঁ রাজকুলাঁ রাঠোর॥

মানে, যেমন দেশের ভিতর ব্রজ, গাছের ভিতর চন্দন, পাহাড়ের ভিতর সুমেরু, পাখির ভিতর গরুড়, আর গড়ের ভিতর লঙ্কা, তেমনই রাজকুলের ভিতর রাঠোর।

. এ কথা শুনেই মেবারের ঈশ্বরদাস জবাব দিলেন,

ব্রজ বসাওন গিরণখধরণ চন্দনদিয়ন সুগন্ধ।

গরুড় চড়ন লঙ্কা লিয়ন রঘুবংশী রাজন্দ॥

মানে, ব্রজভূমি যাঁর সৃষ্টি, পর্বতকে নখাগ্রে যিনি ধারণ করে আছেন, চন্দনে সুগন্ধি যিনি দিয়েছেন, আর জয় করেছেন লঙ্কা, গরুড়বাহন সেই রঘুবংশী আমার রাজেন্দ্র। তাঁরই জন্যে দিল্লীর তখ্‌ৎ-ই-তাউশ। রাণা অমর সিংহ স্বেচ্ছায় তাঁর দাবি ছেড়ে দিলেন। নইলে কবিরা তো ফয়সালা করেই দিয়েছিলেন।

এ সব গল্প বোধ হয় শাস্তিদির ভাল লাগছিল না। বললেন: আজ আপনার একটা কথায় আমি দুঃখ পেয়েছি।

আমি যেন চমকে উঠলুম: আমার কথায়!

ওয়েটিং রুমের ওই বুড়ো ভদ্রলোকটির কাছে আপনি তাঁর ধর্মকে বড় ছোট করে দিয়েছেন।

খানিকটা আশ্বস্ত হলুম আমি। এ কথার জবাব আমার ছিল। বললুম: আমি ছোট করলেই কি ধর্ম ছোট হয়! ধর্ম বলব না। যে সম্প্রদায় আজ পাঁচ শো বছর ধরে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছে, সে আজ আমার কথায় ছোট হয়ে যাবে! ভদ্রলোককে বড় অহঙ্কারী মনে হয়েছিল। তাই তাঁকে আঘাত করেছিলুম। তারপরেই বুঝতে পারলুম যে যা অহঙ্কার বলে ভেবেছি, সে তাঁর বেদনা। তাই তাঁকে পরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাই করেছি।

শুক্লা আমাদের বাঙলা কথা বুঝতে পারছিলেন না। তাই চুপচাপ তাকিয়ে ছিলেন মুখের দিকে। হেসে বললুম: বলছিলুম আচার্য বল্লভাচার্যের ধর্মের কথা।

শুক্লা বললেন: ধর্ম আমি বুঝি নে। কিন্তু শুনেছি যে

রাজস্থানী কাব্য আর চিত্রশিল্পের পেছনে আছে বল্লভাচার্যের প্রভাব।

সব দেশেই তাই হয়। বাঙলা দেশেও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সময় থেকেই বাঙলা সাহিত্যের নতুন যুগ।

আপনি রাজস্থানী ভাষার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলতে লজ্জা নেই, এ সব আলোচনা আমি কখনও করি নি। তবে দু রকম হিন্দীর কথা শুনেছি। পূর্বের ও পশ্চিমের। পূর্বের দৃষ্টান্ত হলেন কবীর ও তুলসীদাস। আর পশ্চিমের হলেন সূরদাস। পশ্চিমের আরও কয়েকজন কবির নাম শুনেছি। কেশব লাল যশবন্ত সিং চতুর্ভুজ মিশ্র ও বিহারী লাল। এঁদের সবার লেখার মূলেই খানিকটা বৈষ্ণব ভাব আছে। কেশব লালের রসিকপ্রিয়া পড়লে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

ভদ্রলোক তাঁর হাতের ছবিগুলি আবার বেঁধে রাখছিলেন। আমি বাধা দিয়ে বললুম : ওগুলো কি আপনার নিজের আঁকা?

শুক্লা মোড়কটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : একটা কিউরিওর দোকান থেকে কিনে আনলুম। পুরনো ছবি বলে দাম বেশি নিয়ে নিল।

ততক্ষণে ছবিগুলো আমি দেখতে শুরু করেছি। বললুম : সত্যিই কি পুরনো ছবি!

আমারও মনে এই সন্দেহ আছে।

তবে কিনলেন কেন?

নেশার জন্যে। পুরনো ছবি বলে বিশেষ মূল্য না থাক্, রাজস্থানী শিল্প বলে একটা সাধারণ মূল্য আছে।

আপনি নিজেও কি ছবি আঁকেন?

উত্তরে ভদ্রলোক হাসলেন।

আমি খুশী হয়ে বললুম : তবে বলুন না কিছু।

শুক্লাও হেসে বললেন : সম্প্রতি ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামীর

একখানা মূল্যবান বই পড়লুম। ছবিও দেখলুম অনেকগুলো তার দুটো ভাগ। একটা রাজস্থানী আর একটা কাঙ্গরা। কিন্তু এই দুটোর ওপরেই বৈষ্ণব প্রভাব। বৈষ্ণব ভাবটি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে নানা বিচিত্র রঙে শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন—রাসলীলা বংশীবাদন কালীয়দমন। এ ছবির উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার নয়, যে রূপ ফুটে উঠেছে তার নাম কৃষ্ণ প্রেম। রাসলীলা তো শুধু ছবি নয়, তার আড়ালে আছে জীবনের শাশ্বত সত্য, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সনাতন সম্বন্ধ।

জানি না, কেন এক রকমের অদ্ভুত আনন্দ আমার মনকে নাড়া দিয়ে উঠল। শুক্লা বললেন: রাজস্থানী শিল্প সম্বন্ধে আমি আপনাকে কিছুই বলতে পারব না। আমি অল্প দিন হল এ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছি। এ সম্বন্ধে কুমারস্বামী কি বলেন জানেন! বলেন, এই ছবি দেখে মনে হয় যে যা আমার ঘরের ভেতর আমাদের প্রতি দিনের ঘটনার ভেতর দেখতে পাই নে, তার সন্ধান আমরা কোথাও পাব না। আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎই তো আমাদের স্বর্গ। বেশি জানার মধ্যে যদি সৌন্দর্য না দেখি, তা হলে কি দূরের অজানা জিনিসে সেই সৌন্দর্য আমরা খুঁজে পাব!

মনে হল, এত বড় সত্য কথা বুঝি আগে কখনও শুনিনি। এই তো ধর্ম!

নাথদ্বারে শুক্লা নেমে গেলেন। মনে হল যে কোন আপন জন বুঝি হারালুম। আমাদের সঙ্গে তাঁর কতটুকু পরিচয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ এক সঙ্গে অতিক্রম করেছি, এই তো! কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এত নিকটে এলুম কী করে! এ কি শিল্পী মনের আত্মিক আকর্ষণ! কিন্তু আমি তো শিল্পী নই! আমার সঙ্গে বন্ধন কেন নিবিড় হবে! এই সব দেখেই মনে হয় যে রক্তের চেয়ে আত্মার সম্বন্ধ বুঝি বড়। রক্তের সম্বন্ধে আছে সঙ্কীর্ণতা, প্রসার আছে আত্মার সম্বন্ধে। সংসারের মোহে স্বার্থপরতা আছে, মোহভঙ্গে উদার মুক্তি। নিজের মনটাকে কি সকলের জন্য বিলিয়ে দেওয়া যায় না! সারা পৃথিবীর মানুষকে কি নেওয়া যায় না আত্মীয় করে!

আমি শান্তিদির পানে চেয়ে দেখলুম। তিনিও আমার কেউ নন। কেউ ছিলেন না, কেউ হবেনও না। তবু তাঁকে ছেড়ে দিতে কষ্ট হবে। মুখ বুজে সইতে হবে এ কষ্ট। কাউকে বলতে পারব না, বলা উচিত হবে না। লোকে কদর্থ করবে।

কিন্তু কেন করবে! মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ লোকে কেন সহজ ভাবে নেয় না! নিলে ক্ষতি হত না কিন্তু না নিলে বুঝি লাভ হয়! নোংরামি আমাদের ভাল লাগে। সেই নোংরামির খোরাক মেলে সম্বন্ধকে বিকৃত করে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ যে বহুরূপী।

শান্তিদি হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করে বসলেন: অমন গম্ভীর মুখে কী ভাবছেন বলুন তো?

কিছু ভাবছি বুঝি!

খাবার কথা?

আমি জানি যে তিনি আমাকে ভোলাতে চাইছেন। ভাবনার

জগৎ থেকে আমায় ট্রেনের কামরার ভিতর ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। বললুম: খাবার তো কপালে আজ জুটবে না!

কেন বলুন তো?

খাবার জায়গা নেই বলে। মাভ্‌লি নাথদ্বারের পর আর কোন স্টেশনে কি খাবার পাওয়া যাবে!

তবে কি সবাই আপনারা না খেয়ে থাকবেন!

ও গাড়িতে পাঁউরুটি মাখন আছে, মিষ্টি আছে, ফলও আছে। আমি আজ কিছু খাব না। আমার ক্ষিধে নেই।

গম্ভীর ভাবে শান্তিদি বললেন: রাগটা কার ওপর?

রাগের কথা তো নয়। খেলেই আবার জলের জন্য ছুটোছুটি করতে হবে।

তা হলে কুঁড়েমি বলুন।

মেনে নিলুম হ্যাঁ বলে। কিন্তু বলতে পারলুম না যে একা খেতে আমার মন উঠবে না। শান্তিদি কী বুঝলেন জানি না, মিষ্টি করে একটুখানি হাসলেন।

অনেক দিন আগে কে একজন আমায় বলেছিলেন যে এ পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা নেই। বার বার আমি বাহিরে তাকাচ্ছিলুম। কিন্তু গভীর অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যাচ্ছিল না। আরও একটু রাত হলে বুঝি জ্যোৎস্না হবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর শান্তিদি বললেন: কয়েকটা কথার উত্তর দেবেন?

সব কথারই তো উত্তর দিচ্ছি।

বলুন এটারও দেবেন!

নিশ্চয় দেব।

ওঁদের সঙ্গে আপনার কী রকম সম্বন্ধ?

কেমন মনে হয়?

একটু সন্দেহ জেগেছে বলেই প্রশ্ন করছি।

সন্দেহটা তো মিথ্যে নয়। ওঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আপনার মতো। হয়তো কিছু বেশি। মানে, আপনার সঙ্গে আমার পথের পরিচয়। আর আমার মা মানুষ হয়েছিলেন মামার বাড়িতে। ভাই বোনের মতো মানুষ হয়েছিলেন বলেই মামা বলি।

আর আপনি!

আমি আমার মায়ের কাছে মানুষ হয়েছি। মামার নাম শুনেছি তাঁরই মুখে। পরিচয় অল্প দিন হয়েছে।

বাবা মা বেঁচে আছেন?

না।

শান্তিদি চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন: কী করেন জিজ্ঞেস করলে কি অসন্তুষ্ট হবেন?

কেন হব! আমি কেরানীর কাজ করি কলকাতা শহরে।

সেই সঙ্গেই যোগ করলুম: গাঁয়ের বাড়ি ভেঙে পড়েছে, থাকি উত্তোরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘরে।

শান্তিদি কথা কইলেন না। মনে হল যে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার কথা শুনে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললুম: আর কিছু জানতে চান না?

ভাবছি কি জিজ্ঞেস করব।

রাণার কথা?

সে কে বলুন তো!

বড় লোকের কাজের ছেলে। বাপ-বেটা দুনো থাপ উথাপ।

শান্তিদি হেসে ফেলেছিলেন আমার কথার ধরন দেখে। তারপরেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন: সেই রাণা বুঝি আবু পাহাড়ে অপেক্ষা করছে?

তাই তো শুনছি।

অনেকক্ষণ পরে শান্তিদি আবার কথা কইলেন, বললেন:

কলকাতায় একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন? আমি আপনাকে ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

মনে পড়ল যে শান্তিদি বড় ঘরের মেয়ে, বউও বড় ঘরের। হয়তো আমাকে সাহায্য করবেন বলেই ডাকছেন। বললুম: পথের পরিচয় পথেই শেষ হয়ে যাক্ না, শান্তিদি, তাকে কেন ঘরে নিয়ে ফিরতে চান!

বুঝেছি!

এর বেশি শান্তিদি কিছুই বললেন না। কিন্তু আমার মনে হল যে ওই একটি শব্দেই সব কিছু বলা হয়ে গেছে। বাকি বুঝি আর কিছুই নেই।

ট্রেন এসে ছোট একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। বাহিরের অন্ধকারে স্বাতির গলা শুনতে পেলুম: আমাদের গাড়িতে একবার আসবে গোপালদা?

আসছি।

শান্তিদিকেও সেই কথা বলে নেমে এলুম।

একখানা বড় কোচে আমরা এক সঙ্গেই চলেছি। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমরা পৃথক কামরায়। পাশাপাশি কামরা। স্বাতি আগে উঠল, আমি তাকে অনুসরণ করে মামার গাড়িতে উঠলুম।

মামী খাবার নিয়ে বসে ছিলেন। মামা বললেন: বেশ ছেলে যা হোক। খেতে হবে না আজ!

ক্ষিধে যে একেবারে নেই।

মামী সে কথা মানলেন না। জোর করেই খাওয়ালেন। পরের স্টেশনে নামবার সময় শান্তিদির জন্যও কিছু ফলমূল আর মিষ্টি দিলেন।

আমি জানতুম, শান্তিদি এ বেলা কিছুই খাবেন না। খাবার জিনিস হাতে দিতেই তিনি হেসে উঠলেন। আমি লজ্জা পেলুম। শান্তিদি আমার লজ্জা দেখেই বোধ হয় অনুগ্রহ করলেন। ফলগুলো

তুলে রাখলেন ঝোলার ভিতর। মিষ্টি নিলেন না। বললেন: পিঁপড়ে ধরবে।

পিঁপড়ের অত্যাচারের কথা আমি জানি। মিষ্টি কেন, পাঁউরুটিতেও এত পিঁপড়ে ধরে যে রাত পোহালে তা আর খাওয়া যায় না। কলকাতার মিল্কব্রেড তো মিষ্টির শামিল। সে খাওয়াও যায় না, শুধু মামীর কাজ বাড়ে। খুঁটে খুঁটে অন্য সব জিনিসপত্র পরিষ্কার করতে হয়। সে এক বিষম জ্বালা: যতক্ষণ না সব পরিষ্কার হয়, ততক্ষণ মামী বকতে থাকেন।

বললুম: যখন খাবেনই না, তখন একটু চোখ বুজুন। মারবাড়ে আমি জাগিয়ে দেব।

সে কথার উত্তর না দিয়ে শান্তিদি বললেন: আবু পাহাড়ে আপনারা কদিন থাকবেন?

এক দিন। এক বেলাও বলতে পারেন।

শান্তিদির চোখ বুঝি কপালে উঠল। তাই বুঝিয়ে বললুম: সকালে পৌঁছে বিকেলের ট্রেন ধরব।

আশ্চর্য হয়ে শান্তিদি বললেন: এইটুকু মাত্র সময়ের জন্যে রাণা কি সেখানে অপেক্ষা করছে!

আশ্চর্য হবারই কথা। দিল্লী থেকে রাণা এসে আমাদেরই অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমরা সেখানে থাকতে যাচ্ছি না। তখুনি মনে পড়ল যে মামারা সেখানে দুটো দিন থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। চিতোর ও উদয়পুর ঘুরে না গেলে আমরা দুটো দিন তার সঙ্গে কাটাতে পারতুম। এ কথাও মনে পড়ল যে এই নতুন ব্যবস্থায় স্বাতিরই আগ্রহ ছিল বেশি। সে না জোর করলে রাণাকে আমরা নিরাশ করতুম না। কিন্তু স্বাতি এমন কেন করে! বললুম: দুদিন আগে আমাদের পৌঁছবার কথা ছিল।

কেন দেরি হল সেই কারণও শান্তিদিকে জানালুম। প্রসন্ন হাসিতে শান্তিদির সারা মুখ ভরে গেল। বললেন: বুঝেছি।

কী বুঝেছেন?

খিলখিল করে হেসে উঠলেন শান্তিদি, বললেন: তাও কি বলে দিতে হবে!

বলে দিতে হবে না তা আমি জানি, কিন্তু সে কথা স্বীকার করে নিতে পারলুম না।

রাত সাড়ে বারোটার সময় আমরা মারবাড় জংসনে পৌঁছলুম। নামবার জন্য শান্তিদি ব্যস্ত হয়েছিলেন। বললুম: নামবার তাড়া কিসের! আমাদের এই গাড়িই তো দিল্লী এক্সপ্রেসে লাগবে। এখনও তার এক ঘণ্টা দেরি আছে।

শান্তিদি বসে পড়ে বললেন: যা করবার তা চুকিয়ে রাখাই ভাল।

ইচ্ছে করলে এই গাড়িতেই ঘুমতে পারতেন। এও তো আহমেদাবাদ যাবে।

বাহির থেকে স্বাতির গলা শুনে চমকে উঠলুম। আস্তে আস্তে ডাকল: গোপালদা!

আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে নেমে পড়লুম। বললুম: তুমি ঘুমোও নি!

স্বাতি বলল: না। শান্তিদিকে তুলে নিয়ে আমাদের গাড়িতেই ফিরে এস।

শান্তিদি শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন: এখুনি চলে যান না ভাই, আমি একটু আরাম পাই।

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না। স্বাতিকে বললুম: কেন পাগলামি করছ বল তো!

পাগলামি কিসের!

পাগলামি নয়! এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে আছ, গোলমাল করলে মামা মামীরও ঘুম ভাঙবে।

গাড়ির ভিতর থেকে শান্তিদি বললেন: ওকেও তো একটু ঘুমোতে দেবেন, না জাগিয়ে রাখবেন সারা রাত?

স্বাতি লজ্জা পেল অপরিমিত। বলল: আমি ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে কথা দাও, তুমি আসবে।

হেসে বললুম: আসব।

দিল্লী এক্সপ্রেস আসবার আগে শান্তিদিকে নিয়ে বিপদ হল। বললেন: আপনি এ গাড়ি ছাড়বেন না। আমি গিয়ে ও-গাড়ির জন্যে দাঁড়াই।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম: আপনাকে একা কী করে ছেড়ে দিই বলুন!

ছেড়ে না দিয়ে কি আমায় বিপদে ফেলবেন!

বিপদ কিসের?

আপনি থাকলেই তো বিপদ! সবাই তো আপনার মতো সাধু নন কিনা!

আমি নিরুপায়! শেষ পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে শান্তিদিকে দেখতে লাগলুম। এক্সপ্রেস গাড়ির একখানা গোটা কামরা নিয়ে তাঁর দল এল। দরজার হাতল ধরে বিমল দাঁড়িয়ে ছিলেন। শান্তিদিকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে ডেকে উঠলেন। ভিড়ের ভিতর আমাকে তাঁরা চিনতে পারেন নি। আমি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেলুম।

আমি জানি যে স্বাতি এখনও আমার জন্যে জেগে আছে। গাড়ির দরজার উপর টোকা দিলেই ছিটকিনি খুলে দেবে।

অদ্ভুত মেয়ে!

ভোর বেলায় নিজেদের গাড়িতে আমাকে দেখতে পেয়ে মামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন: গোপাল, তুমি এ গাড়িতে!

মামী বললেন: তাই আমি মাঝ রাত্তিরে খুটখাট শব্দ পাচ্ছিলুম।

খুটখাট শব্দ!

বলেই স্বাতি হেসে উঠল। আমি জানি যে এ তার লজ্জা এড়াবার চেষ্টা। সেই হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে মামা বললেন: ব্যাপার কী!

স্বাতি বলল: দরজা প্রায় ভেঙে ফেলবার যোগাড়। কে একজন দেখতে পেয়েছে যে একখানা বার্থ খালি আছে। উল্টো দিক থেকে নেমে গোপালদাকে আমি ডেকে আনলুম।

সাবাস!

মামা তারিফ করলেন স্বাতিকে। কিন্তু মামীর চোখে অবিশ্বাস দেখলুম ঘনিয়ে আছে।

সকাল সাড়ে পাঁচটার পর আবু রোডে গাড়ি পৌঁছল। নামবার সময় মামীকে বড় ব্যস্ত দেখলুম। প্ল্যাটফর্মের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত তিনি চেয়ে দেখছেন। মামা বললেন: কাকে খুঁজছ!

সত্যি কথাটা মামী এড়িয়ে গেলেন। বললেন: রামখেলাওন নেমেছে তো!

নামিয়ে নেব।

সবাইকে ওয়েটিং রুমে পৌঁছে দিয়ে আমি ট্যাক্সির চেষ্টায় বাহিরে গেলুম। যাঁরা বাসে যাবেন, তাঁদের ভাবনাই বেশি। বাসের টিকিট যেখানে পাওয়া যায়, সে ঘর তখনও খোলে নি। তবু

অনেকে পরিবারের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন বললেন: দাঁড়িয়ে যান মশাই। আগে জায়গা, তারপর টিকিট।

আর একজন বললেন: তারপর যখন সাদা খড়িতে নিশান দিয়ে দেবে!

এই নিশান জানলুম, রিজার্ভেসনের চিহ্ন। তার হাত থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। বললেই হল যে এগুলো রিজার্ভ করা আছে।

আমি দাঁড়ালুম না দেখে প্রথমজন বললেন: ট্যাক্সিতে যাবেন ভাবছেন তো! টোল দিতে মরে যাবেন। বাসে গেলে টাকা টাকা, ট্যাক্সিতে আড়াই টাকা।

খানিক পরেই আমি ট্যাক্সির সন্ধান পেলুম। তার পিছনে বাসও এল। যাত্রীরা যখন মারামারি করে বাসের ভিতরে ঢুকছিলেন, আমি তখন একটা ট্যাক্সি ঠিক করে স্টেশনের ভিতরে চলে গেলুম। শুধু ভাবনা ছিল রামখেলাওনের জন্য। তাকে সঙ্গে নিলে পাঁচজন হয়। কিন্তু ওয়েটিং রুমে পৌঁছে দেখলুম যে এ সমস্যার সমাধান হয়েই আছে। একবার পাহাড়ে উঠবার সময় সে নাকি বমি করে বাস ভাসিয়ে দিয়েছিল, সেই ঘেন্নায় মামী তাকে এখানেই রেখে যাবেন। বিকেলেই তো আমরা ফিরব। মালপত্রও স্টেশনে জমা থাকবে। মামার হুকুমে এক একটা গরম জামা সবাই বার করে নিয়েছেন। আমার জন্যও একটা গরম চাদর। না হেসে আমি থাকতে পারলুম না।

মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে আমরা রওনা হলুম। সমতল পথে মাইল ছয়েক গিয়ে পাহাড় শুরু হল। আরাবল্লী শ্রেণীরই একটা বিচ্ছিন্ন পাহাড়। গুরুশিখর এরই চূড়া। ভূগোলে কত উচ্চতা দেখেছিলুম মনে ছিল না। গাইড বইয়ে দেখলুম, পাঁচ হাজার ছ শো তিপ্পান্ন ফুট উঁচু। গাইড বই স্টেশনের বাহিরেই কিনতে পাওয়া যায়।

আবু শহর এত উঁচুতেও নয়। চার হাজার ফুট উঁচু হবে।

রেল লাইন থেকে সাড়ে সতের মাইল দূর। অন্য সব পাহাড়ের মতোই উঠেছে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে।

বাসখানা আমাদের কিছু আগে ছেড়েছিল। সেখানা পেরবার সময় স্বাতি হেসেই আকুল। মামী ধমক দিয়ে বললেন: অত হাসছিস কেন?

স্বাতি কোন রকমে যা দেখতে বলল, তা ওই বাসের ভিতরে। আমি এক ভদ্রলোককে দেখলুম গলাবন্ধ কোট ও গায়ের চাদরে আপাদমস্তক ঢেকেও ক্ষান্ত হন নি, মাথায় একটা ব্যালাক্লাভা টুপি পরেছেন। স্বাতি বোধ হয় ওই টুপি দেখেই হাসছে। খানিকটা সংযত হয়ে বলল: শীত দেখ।

মামা নিজেদের গরম জামাকাপড় দেখলেন। বললেন: এগুলো গায়ে দিয়ে নিলেই ভাল হত।

মামার মন্তব্য শুনে মামীও একটু হাসলেন। জোরে জোরে বাতাস বইছিল ঠিক, কিন্তু সে বাতাসে কারও শীত করে না। মামা তবু তাঁর আদেশটাকে জারি করবার চেষ্টা করলেন। বললেন: আমার সোয়েটারটা দাও।

উত্তরে মামী বললেন: এমনিতেই মাথা গরম, আর গরম জামা গায়ে দিয়ে কাজ নেই।

ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করলে কি খুব ভাল লাগবে!

মামী উত্তর দিলেন না। মামা আরও ঘন ভাবে পাইপ টানতে লাগলেন। তাঁকে ভোলাবার জন্য আমি বললুম: অম্বাজীর মন্দির আমাদের দেখা হবে না।

কেন?

স্টেশন থেকে অম্বাজী প্রায় মাইল বারো দূরে। তার অন্য পথ। আমাদের হাতে এমন সময় নেই যে ফেরার পথেও দেখে যেতে পারব।

মামী বললেন: কোনও নাম করা তীর্থ!

তা একটু নাম করা বইকি। গোটাকয়েক ধর্মশালা যখন আছে, তখন যাত্রীর ভিড় নিশ্চয়ই হয়।

সেই সঙ্গেই যোগ করলুম: কিন্তু শুনেছি কোন মূর্তি নেই মন্দিরে। দেওয়ালে আঁকা মূর্তি রঙে ও কাপড়ে সাজানো।

মামা যেন আমাদের কথাই শুনছিলেন না, এমনই ভাবে বললেন: তা হলে রাজস্থান ভ্রমণ মামাদের শেষ হয়ে গেছে, কী বল!

এখনও তো আমরা রাজস্থানের ভিতরেই আছি।

কেমন করে?

আবু এখন রাজস্থানের মধ্যে এসেছে, সীমা কমিশনের রিপোর্টে তো সবই পড়েছিলেন।

মামী বললেন: উনি সবই পড়েছিলেন!

জানি না আজ মামীর কী হয়েছে! কিছু না হলে ঠিক এমন করে তিনি কথা বলেন না। তাড়াতাড়ি আমি বললুম: আবু খুবই পুরনো জায়গা। মেগাস্থিনিসের লেখায় এর উল্লেখ আছে। প্লিনি এর নাম দিয়েছিলেন মন্‌স্ ক্যাপিটালিয়া, তার মানে, মৃত্যু-দণ্ডের পাহাড়। মেগাস্থিনিসের লেখা পড়েই নাকি প্লিনি এই নাম রেখেছিলেন।

আমি ড্রাইভারের পাশে বসে ছিলুম। পিছন থেকে স্বাতি বলল: হিউএন চাঙ কী নাম দিয়েছিলেন?

স্বাতি যে কৌতুক করছে তা বুঝতে আমার দেরি হল না। বললুম: পাহাড়ের নিচে দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন। ওপরে উঠলে নিশ্চয় একটা নাম রাখতেন।

ফা হিয়েন?

স্বাতির চোখ দুটো দেখলুম দুষ্টুমিতে ভরা। বললুম: ফা হিয়েন নয়, কর্নেল টড। তিনি এই পাহাড়ে জায়গাটা আবিষ্কার করেন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন এটা শিরোহীর মহারাওএর অধীনে।

ইংরেজের এ জায়গাটা ভারি ভাল লাগল। একজন দুজন করে আসতে আসতে শেষে বেশ ভাল করেই জাঁকিয়ে বসল। শেষ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পাকাপাকি ভাবে শহরটা ইংরেজের হাতে গেল। অর্থাৎ সরকার বাহাদুরের সন্তুষ্টির জন্যে মহারাও এই শহরটি উপহার দিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার লোক ভাল। পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরবার সময় শহরটি আবার মহারাওকেই ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু মহারাওএর সম্পত্তি যখন ভারত সরকার দখল করলেন, তখন আবু পড়ল বোম্বাইএর পাতে। রাজস্থান এ অবিচার সইল না। সীমা কমিশনের সঙ্গে লড়াই করে তার হকের জিনিস ফিরে পেয়েছে।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : তা হলে আমরা রাজস্থানেই আছি বলছ!

আবু ছাড়লে আমাদের রাজস্থান ভ্রমণ শেষ হবে।

মামী বললেন : কিন্তু ভ্রমণের ভূত তো আমাদের ছাড়বে না!

পিছন ফিরে আমি বললুম : বেড়াতে কি আপনার ভাল লাগে না মামীমা ?

মামী একটু রুক্ষ স্বরে বললেন: বেড়াবারও একটা সীমা আছে। তোমার মামার সে মাত্রাজ্ঞান নেই।

আমি আবার কার পাকা ধানে মই দিলুম!

বিরক্ত ভাবে মামী বললেন: তা বুঝবে কেন! আমার সর্বনাশটা না হলে তোমরা কিছুই বুঝবে না।

আমি এই উষ্মার কারণ জানি না। কিন্তু স্বাতি হাসছিল মুখ লুকিয়ে।

বিস্মিত ভাবে মামা বললেন : আমি করব তোমার সর্বনাশ!

হ্যাঁ, আমার।

বলে মামী গম্ভীর হয়ে রইলেন।

স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল যে মামীর

অসন্তোষের কারণ আমি জানতে পেরেছি। তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন রাণার কথা ভেবে। সে এখনও অপেক্ষা করে আছে, না ফিরে গেছে দিল্লীতে! অভিমান করে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়, অসঙ্গতও হবে না। আগে থেকে সমস্ত ঠিক করে এখানে আসছে। তাঁদের জন্যই আসছে। কয়েকটা অর্বাচীনে মিলে সমস্ত ব্যবস্থা একেবারে পণ্ড করে দিল! আবু শহরে এখন মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা কাটানো হবে। তারই মধ্যে যা কিছু কথাবার্তা, যা কিছু দেখাশুনো। ইচ্ছে করলেও আর একটা দিন থাকা যাবে না। রিজার্ভেসনের জাল চারিদিকে এমনই ছড়ানো আছে যে তা থেকে মুক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। মামী চিন্তিত হয়েছেন, বিচলিতও হয়েছেন। রাণা তো গোপাল নয়, রাণার সঙ্গে স্বাতির বিয়ে হবে। দিল্লীতে ফিরেই মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিয়ের দিন স্থির করতে হবে। সে কথা মামী আমাকে অনেক বার বলেছেন, অনেক ভাবে বলেছেন। ভুলে যাতে না যাই, সেজন্য অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই মনে করিয়ে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে আমি একটি অনূঢ়া মেয়ের মায়ের মন দেখলুম তার নগ্নরূপে। স্নেহসিক্ত কল্যাণময় ভীরু সঙ্কীর্ণ মন। মামীকে প্রণাম করলুম মনে মনে।

নীরবে অনেকক্ষণ পাইপ টানার পর মামা বললেন: তা বলবে বইকি!

ততক্ষণে আমরা অর্ধেক পথ উঠে এসেছি। ভাল করে তা বোঝা গেল রাস্তার দু ধারে কয়েকটা বড় বড় বটগাছ দেখে। ঘন পাতায় নীল আকাশ আড়াল হয়ে গেছে, সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে না পাতার ফাঁক দিয়ে। স্বাতি বলল: ভারি সুন্দর জায়গা তো!

ড্রাইভার এতক্ষণ পর প্রথম কথা কইল। বলল: খানিকটা বিশ্রাম করবেন কি?

উত্তরের অপেক্ষা না করে অঙ্গনের মতো প্রশস্ত একটা জায়গায়

গাড়ি থামাল। তারপর নেমে খানিকটা দূরে গিয়ে বিড়ি ধরাল। অল্প একটু সময়, তারপরেই ফিরে এসে আবার যাত্রা।

আমি রাণার কথা ভাবছিলুম, সে কোথায় উঠেছে জানি না। কোথায় তার সঙ্গে দেখা হবে, সেই কথা জানতে চাইলুম মামার কাছে। বললুম: রাণাবাবুর সঙ্গে কোথায় আমাদের দেখা হবে?

উচ্ছ্বসিত ভাবে মামী বললেন: সে কথা কি উনি একবারও ভাবছেন!

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে মামা বললেন: এরই জন্যে—

এর বেশি বলবার অবকাশ মামা পেলেন না। মামী একেবারে বারুদের মতো ফেটে পড়লেন: এরই জন্যে মানে? একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে আসবার জন্যে অনুরোধ করে—

বুঝেছি বুঝেছি।

বলে মামা থামিয়ে দিলেন মামীকে। আমি আড়চোখে চেয়ে দেখলুম, কৌতুকে স্বাতির দু চোখ যেন নাচছে। এমন খুশী হতে তাকে অনেক দিন দেখি নি, কিন্তু কেন খুশী হচ্ছে! রাণার সঙ্গে দেখা হবার আশায়! কিন্তু—

মামী কোন জবাব দিলেন না। এক রকমের অদ্ভুত অনুভূতিতে হৃদয় আমার ভারাক্রান্ত হল, বেদনায় আচ্ছন্ন হল চিন্তা। স্বাতিকে কি আজও আমি চিনতে ঠিক পারি নি! আজও কি সে আমার কাছে রহস্য দিয়ে ঘেরা থাকবে!

মোটর এবারে বড় বেশি পাক খাচ্ছে। আমার পেটের ভিতরটা কেমন ঘুলিয়ে উঠল। মুখ খুলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলুম। রামখেলাওনের কথা এই সময় আমার মনে পড়ল। মামী বলেছিলেন—

সে কথা ভাবতে আর ইচ্ছে হল না। পিছনের দিকে তাকিয়ে কোন সান্ত্বনা পেলুম না। সবাই দেখলুম সহজ ভাবে বসে আছেন। স্বাতির ঠোঁটে প্রসন্ন হাসি লেগে আছে।

মাথাটা বড় গরম বোধ হচ্ছে। ঠাণ্ডার বদলে গরম বোধ হচ্ছে সারা শরীর। বোধ হয় ভিতরটা ঘামে ভিজছে। কত ছলই জানে এই মেয়েটা! এই মেয়েটা কেন, দুনিয়ার সব মেয়েই বুঝি ছলনা দিয়ে পুরুষদের ভুলিয়ে রেখেছে। আমি আর ভুলে থাকব না। আমাকে সে আর ঠকাতে পারবে না।

মামা বললেন: গোটাকয়েক কমলালেবু সঙ্গে নিলে ভাল হত। তোমার কি—

মামী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

মামা বললেন: আমার একার জন্যে বলছি না। সবারই ভাল লাগত।

ড্রাইভার কিছু সন্দেহ করেছিল আমার দিকে তাকিয়ে। বলল: আমরা প্রায় পৌঁছেই গেছি।

মামী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন: আমরা এখন কোথায় যাব?

মামা চিন্তিত ভাবে বললেন: তাই তো!

বললুম: কোথায় আপনাদের ওঠবার কথা ছিল?

কথা তো অন্য রকম ছিল।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। মামা বললেন: কথা ছিল রাণা যে গাড়িতে আসবে, আজমীর থেকে আমরা সেই গাড়ি ধরব। তারপর এখানে এসে দেখে শুনে একটা ভাল হোটেল ঠিক করা যাবে।

কোন হোটেলের নাম জানেন?

না।

মাউণ্ট হোটেল, যোধপুর হোটেল, ডাক বাংলো!

মামা বললেন: মোটরওয়ালাদের অফিসের ওপর ভাল রেস্ট রুম আছে শুনেছি।

খুব ভাল।

বলে ড্রাইভারকে আমি সেইখানেই যেতে বললুম।

সেই জায়গাই আবুর দরজা। সমস্ত মোটর বাস এসে দাঁড়ায় বড় বড় রাস্তার সঙ্গম। লোকজন মোটরওয়ালাদের অফিস, উপরে সেই রেস্ট রুম। আমরা এসে তারই সামনে দাঁড়ালুম।

হ্যালো গোপালবাবু!

বলে চাওলা এসে আমার দরজা খুলে দিল। নমস্কার করল ভিতরের সবাইকে। আমি নেমে পড়েই চাওলার হাত ধরে ঝাঁকানি দিলুম।

ড্রাইভার অন্য দিকের দরজা খুলে ধরল মামা মামীকে নামাবার জন্য। ওঁরা একটু সময় নিয়ে নামলেন। আমি চমকে উঠলুম আর একটি পরিচিত কণ্ঠ শুনে। মিত্রা কথা কইছে মামীর সঙ্গে।

মামী বললেন: রাণা কোথায়?

দাদা! দাদা আসতে পারে নি।

আমি ফিরে দেখলুম, স্বাতির মুখের প্রসন্নতা এতটুকু কমে যায় নি। পাহাড়ের মিঠে রোদে তাকে যেন আরও বেশি খুশী দেখাচ্ছে।

৩৪

অনেক দিন পরে আবার মিত্রাকে দেখলুম। কমার্স মিনিস্ট্রির নতুন অফিসার রাণা ব্যানার্জির বোন মিত্রা। তাদের বাপ হলেন ব্রিটিশ আমলের দুঁদে সিভিলিয়ান ব্যানার্জি সাহেব। স্বাতির চেয়েও সে বেশি রোগা, বেশি ফরসা। পায়ে চঞ্চলতা নেই, মুখে নেই বাচালতা। চশমার কাচের ভিতর দিয়ে তার যে দৃষ্টি দেখি, তাতে স্নিগ্ধতাও নেই। কাচের উপর আলো পড়ার মতো তার দৃষ্টিটা সারাক্ষণ তীব্র দেখায়। মনটাও তীব্র। তাই দিল্লীতে আমার সম্বন্ধে আমার সামনেই যে কথা বলেছিল, আজও তা স্পষ্ট মনে আছে। বাউলির ধারে দিল্লী দেখার প্রোগ্রাম করতে বসে স্বাতি বলেছিল, দিল্লী আমরা দেখেছি, গোপালদা কিন্তু না দেখেও আমাদের চেয়ে বেশি জানে। উত্তরে মিত্রা একটা বক্রোক্তি করে বলেছিল, কলকাতার একজন হিরো বলে শুনেছি।

মিত্রা কেন আমাদের কাছে এসেছিল, সে কথা শুনেছিলুম পাঞ্জাবী যুবক চাওলার কাছে। বলেছিল, দুদিন পরে তুমি কোটি-পতি হবে, অর্ধেক রাজত্ব পাবে। এ দিকে রাজকন্যার মত হলেই হল। রাজা যে নিজেই তাঁর রাজকন্যা পাঠিয়েছিলেন তোমার কাছে। এলাহাবাদের বিখ্যাত ধনী জ্ঞানশঙ্করবাবু আমায় পোষ্যপুত্র নিচ্ছিলেন। নিজের কথাও চাওলা বলেছিল, মিত্রার মনের কথা জানতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। তবে বিয়ে করতে রাজী হলে বুঝতুম, খাঁটি জিনিস পেয়েছি। মিত্রা কখনও মিথ্যা বলবে না।

সত্যিই মিত্রা মিথ্যা বলে নি। ওখলায় আমাকে টেনে এনে বলেছিল, চাওলাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

আমি বলেছিলুম, ভালই যখন বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কী ?

মিত্রা উত্তর দিয়েছিল, তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটেকুড়নীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যার দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

এই অসুস্থ লোকের সঙ্গে মিত্রা আজ আবু পাহাড়ে এসেছে। তাই ভারি আশ্চর্য বোধ হল। মনে হল যে তাদের এই আসার ভিতর আরও কোন গভীর অর্থ আছে। সে কথা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট হয় নি।

চাওলা আমাদের চায়ের দোকানে ধরে আনল। বলল : অনেকক্ষণ মুখ বন্ধ করে এসেছেন, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন।

মামা বললেন : গোপাল বলছিল, হাতে আমাদের সময় কম। একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে।

মামী তাঁর সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। কোন কথা না বলে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন। চাওলা বলল : দেখবার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সব দেখিয়ে দেব।

আশ্চর্য হয়ে মিত্রা বলল : তুমি দেখাবে !

ক্ষতি কি ! তোমার ভাই এঁদের দিল্লী দেখাতে পারল, আর আমি আবু দেখাতে পারব না !

স্বাতি হেসে বলল : বলুন তো, কী কী দেখাবেন !

চাওলা আঙুলে গুনে শোনাল দেখবার জায়গাগুলো—অচলগড়, দিলওয়ারা, নকি লেক ও সানসেট পয়েন্ট।

এই দুপুর রোদে সানসেট পয়েন্ট দেখাবেন ! সূর্যাস্ত হবে তো আমরা চলে যাবার পর !

আমাদের সঙ্গে মালপত্র নেই দেখেই এরা বুঝতে পেরেছিল যে

আমরা আজই ফিরে যাব। এ নিয়ে আলোচনাও শেষ হয়ে গেছে। কাজেই চাওলা উত্তর দিল প্রথম কথাটার, বলল: ওটা বড়লোকের খেয়ালের জায়গা। হিন্দুস্থানের যে কোন গাঁয়ের মাঠে দাঁড়ালে আমরা অমন সূর্যাস্ত রোজ দেখতে পাই। কিন্তু তাতে যে পয়সা খরচ হয় না। সে দেখায় আর সুখ কী বলুন!

বলে আমার দিকে তাকাল। আমরা সবাই- তখন বসবার উদ্যোগ করেছি। চাওলা চায়ের ফরমাশ করে বাহিরে গেল একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে। ফিরে এসে বলল: সর্দারজী লোক ভাল। পিক আপ গাড়িটাকে আটকে এলুম।

সর্দারজী হলেন মোটর অফিসের কর্মকর্তা। চাওলা এ কথা বলবার সময় হেসেই আকুল!

কী হল তোমার!

সে কথা মিত্রাকে জিজ্ঞাসা কর।

সেই সঙ্গেই যোগ করল: কাল তিনি আমাদের নটার সময় গাড়ি দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বারোটা বেজে গেল।

বলেই আবার হাসতে লাগল। বুঝতে পারলুম যে এ হল পাঞ্জাবী ছেলের রসিকতা। শিখদের নিয়ে এমন রসিকতা আজকাল অনেকে করে। অসংখ্য মুখরোচক গল্পও আছে তাদের নিয়ে।

মিত্রা আমার ঠিক পাশে বসেছিল। চামচ দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল: সেবারে এলাহাবাদে না নেমে আপনি সোজা কলকাতায় গেলেন, তাতে আমাদের শ্রদ্ধা বেড়েছে।

চাওলা আমার উল্টো দিকে বসেছিল। দেখলুম, সে শুনতে পেয়েছে। আমার দিকে চোখ পড়তেই একটুখানি চোখ টিপল। বলতে যাচ্ছিলুম যে সে প্রাণের দায়ে। কিন্তু আমার যা গলার স্বর, তাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হত। তাই চুপ করে গেলুম। মিত্রা বলল: আপনিও কি আজই নেমে যাবেন?

এ প্রশ্ন যে অবান্তর মিত্রা সে কথা জানে। তাই যোগ করল: থেকে যান না কয়েকটা দিন।

কৌতুকে চাওলার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। স্বাতিকে আমি লক্ষ্য করলুম। টেবিলের উপর মুখ নামিয়ে সে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। কিন্তু দৃষ্টি রেখেছিল আমার উপরেই। যথাসম্ভব গলা নামিয়ে বললুম: ভেবে দেখি।

মনে হল যে মিত্রার কানের পাশ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

চায়ে আমরা বেশি সময় নষ্ট করলুম না, নষ্ট করবার উপায় নেই। চাওলা নিজের পেয়ালাটা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করেই চায়ের দাম চুকিয়ে দিল। মামা কিছু বলবারই অবকাশ পেলেন না। বারান্দায় বেরিয়ে ড্রাইভারকে বলল: গাড়ি লাও।

আমরা তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এলুম। চাওলা ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খুলে মামা মামীকে বলল: আপনারা সামনে বসুন, ঘেঁষাঘেষি হলেও আরাম পাবেন। ঝাঁকানি কম।

আমরা উঠলুম পিছনে। চাওলা ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল। পোলো গ্রাউণ্ডের পাশ দিয়ে সানসেট পয়েণ্ট যাবার। আমাদের বলল: সূর্যাস্ত যখন দেখতেই পাবেন না, তখন এই সকাল বেলাতেই দেখে নেওয়া ভাল।

সানসেট পয়েণ্ট এমন মারাত্মক কোন জায়গা নয়। পশ্চিমে এই পাহাড় যেখানে আচমকা শেষ হয়েছে, সেইখানে একখণ্ড জায়গা। খানিকটা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিচে রাজস্থানের রুক্ষ সমতলভূমি। কল্পনা করতে কষ্ট হল না যে সূর্যদেব ওইখানে এসে নানা রঙে পশ্চিম আকাশটা রাঙিয়ে দিয়ে অস্ত যাবেন। চাওলার মতে এ অতি সাধারণ দৃশ্য। সঙ্গে মনোমত সঙ্গী থাকলে হয়তো অসাধারণ মনে হতে পারে।

সেখান থেকে আমরা নকি লেক দেখতে গেলুম। এ সমস্তই আবু শহরের ভিতর। বাজারের মধ্য দিয়ে যে বড় রাস্তাটা গেছে,

তার থেকেই ছুটো পথ ছু দিকে গেছে। বাঁয়ে নকি লেক, রঘুনাথজীর মন্দির, আরও খানিকটা এগিয়ে সানসেট পয়েণ্ট। আর ডানে দিলওয়ারা গুরুশিখর অচল গড়। চাওলা আমাদের ভাববার সময় দিল না। বলল: চল আগে রঘুনাথজীর মন্দির দেখিয়ে আনি, তারপর এই লেকের ধারে খানিকটা বসা যাবে।

রাস্তার এক ধারে লেক, আর এক ধারে মন্দির আর ধর্মশালা। ছোট একটি সাদা মন্দিরের ভিতর কালো পাথরের মূর্তি। চাওলা বলল: লোকে বলে চতুর্দশ শতাব্দীতে গুরু রামানন্দ এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুশিখরে যে পায়ের ছাপ আছে, তাও নাকি রামানন্দের নিজের পায়ের।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা নকি লেকের ধারে বেঞ্চিতে এসে বসলুম। এই ছোট বাগানটির নাম এখন গান্ধী পার্ক। নকি লেকে মহাত্মাজীর অস্থি বিসর্জনের পর এই নাম হয়েছে। এরই সঙ্গে চাওলা আমাদের পুরাণের কাহিনী শোনাল। বলল: নকি তালাও কেন নাম হল জানেন?

স্বাতির পুলক যেন ধরে না। আমার দিকে ফিরে বলল: বল এই বারে।

নখ থেকে নখি!

হুঁ। ফাঁকি চলবে না।

গল্পটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বললুম: রাক্ষসের অত্যাচারে দেবতারা পর্যন্ত জর্জরিত। ব্রহ্মা বললেন, আবু পাহাড়ে গিয়ে যজ্ঞ কর। দেবতারা এসে নখ দিয়ে আঁচড়ে এই হ্রদের সৃষ্টি করলেন।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: গাঁজা।

তোমার মত পাপীরা অবশ্য অন্য কথা বলে।

মামাও আমার মুখের দিকে চাইলেন। বললুম: বলে, এটা আগ্নেয়গিরির মরা মুখ।

সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য হল চাওলা, বলল : কোথায় জানলে এ সব কথা ?

আমি যেন এই প্রশ্নই দেখলুম মিত্রার চোখে। আর স্বাতির চোখে পুলক। আমার পকেটে যে একখানা গাইডবই আছে আর পাহাড়ে উঠবার সময় সেখানার উপর যে খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়েছি, সে কথা আর স্বীকার করলুম না। জ্ঞানবৃদ্ধের মতো গম্ভীর ভাবে মাথা দোলালুম।

সুন্দর জায়গা। প্রায় চারি দিকটাই পাহাড়ে ঘিরে আছে। পাহাড় দূরে বলে আরও যেন সুন্দর। ব্যাঙের মতো একটা পাথর দেখিয়ে চাওলা বলল : ওটার নাম টোড হিল। এমনি আর একটা পাথরের নাম নান হিল। রাজপুতানা ক্লাবের কাছে। দেখতে ঠিক ঘোমটা দেওয়া মেয়ের মতো। অনেক দিন আগে বাজ পড়ে তার নাকটা উড়ে গেছে।

চাওলা বোধ হয় আরও অনেক কিছু দেখবার জায়গার নাম করতে যাচ্ছিল। কিন্তু মামা তাকে অন্য প্রশ্ন করে বসলেন : তোমরা কত দিন এখানে এসেছ ?

চাওলা হেসে বলল : পরশু। রাণার সঙ্গে মিত্রা আসবে ঠিক ছিল। ব্যবস্থা পাকা। কিন্তু বিধির ইচ্ছে অন্য রকম।

মামী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : রাণা এল না কেন ?

উত্তরের জন্যে তিনি মিত্রার দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু চাওলা জবাব দিল : চাকরি !

পূজোর সময়েও চাকরি!

গম্ভীর ভাবে চাওলা বলল : ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন কিনা! তাই ছুটি বলে আর কিছু নেই।

আমি তার পাশে ছিলুম। আমায় একটা চিমটি কাটল লুকিয়ে। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল : সিনিয়ারের ইচ্ছে নয়।

বুঝতে পারলুম যে মিস্টার ব্যানার্জি এই মাখামাখিটা চান না। তখুনি আমার মনে পড়ল মামার একটি কথা। দিল্লীতে এক দিন আমায় মিস্টার ব্যানার্জির কথা বলেছিলেন, তুমি জান না গোপাল, আমাদের প্রতি কত গভীর ঘৃণা ওরা বুকের ভিতর পুষে রেখেছে। যাদের চাল চুলো ছিল না, আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দু দলকেই ওরা ঘৃণা করে। সরকারি প্রতিপত্তিওয়ালা বন্ধুমহলে যা বলে, তাও জানি। সে সব নোংরা কথা নাই বা শুনলে! বলেছিলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। সেইখানেই সম্বন্ধের শেষ। বি. এ. পাস করে সে বিলেত গেল, ফিরল সিভিলিয়ান হয়ে। আমি বাপের জমিদারী দেখছি শুনে বলল, ফু-উ-ল। সম্পত্তি দেখছে, না অধঃপাতে গেছে। আসকারা দিয়ে দিয়ে গভর্নমেণ্ট এক গুষ্টি অপদার্থ পুষছে।

মামা কী বুঝলেন তিনিই জানেন। কিন্তু গম্ভীর ভাবে বললেন: বুঝেছি।

আমি মিত্রার দিকে চেয়ে দেখলুম, তার দৃষ্টি একটু অবনত হয়েছে। চাওলা বলল: ওঠ এইবারে। অচল গড় দূর আছে।

অচল গড় বড় প্রাচীন গড়। নবম শতাব্দীর শেষ বৎসর বোধ হয় কোন পরমার রাজা এই গড় নির্মাণ করেন। চন্দ্রাবতীর পরমার ও সিরোহীর চৌহান রাজাদের রাজধানী। এক সময় মেবারের রাণা কুম্ভ এসে অধিকার করেন। অচল গড়ের গৌরবের দিন আজ শেষ হয়ে গেছে। বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে আজ যা আছে তাও এক দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আবু সিভিল স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল রাস্তা। কিন্তু চাওলা নিশ্চিন্ত মনে কিছু বলবার সময় পেল না। পথের ধারে তাকে অনেক জিনিস দেখাতে হচ্ছে। পথ গেছে উত্তর পূর্বে। বাজার থেকে পোস্ট অফিস পুরনো পলিটিক্যাল এজেন্টের অফিস

রাজপুতানা হোটেল ও রাজপুতানা ক্লাব। ভারত স্বাধীন হবার পর এদের জাঁকজমক শেষ হয়ে গেছে। তারপর আসবে পালানপুর হাউস আলোয়ার হাউস বিকানীর হাউস। আবু পাহাড়ে বাড়ি নেই এমন রাজা নেই রাজস্থানে।

হঠাৎ একটা রাস্তা দেখাল চাওলা, বলল : এই হল অধর দেবীর মন্দিরের রাস্তা। অর্বুদা দেবীও বলতে পার। অনেকটা উঠতে হয়। দেবীর মূর্তি একটা গুহার ভেতর। আর একটা অলৌকিক ব্যাপার এখানে দেখা যায়। মূর্তি শূন্যে ঝুলে আছে। এ কথা প্রমাণ হবে মূর্তির পায়ের নিচে এক খণ্ড কাপড় চালিয়ে দিয়ে।

স্বাতি বলল : আশ্চর্য তো!

বোধ হয় চুম্বকের ব্যাপার।

সেই সঙ্গেই বলল : এই দেবীর নাম থেকেই পাহাড়ের নাম আবু হয়েছে।

দিলওয়ারার জৈন মন্দির আরও খানিকটা এগিয়ে। কিন্তু আমাদের গাড়ি সেখানে থামল না। ড্রাইভারকে চাওলা আগেই বলেছিল সোজা অচল গড়ে যেতে। দিলওয়ারার মন্দির নাকি সাধারণের জন্য খোলা হয় বেলা এগারোটার পর। আমরা তাই ফেরার পথে নামব।

অচল গড়ের রাস্তা ভাল নয়, কিন্তু দৃশ্য ভাল। এক সময় একটা জলাশয় পেরিয়ে গেলুম। চাওলা বলল : নাম ট্রেভর তাল। আবুতে জল সরবরাহের জন্যে ট্রেভর সাহেব তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয় নি। এখন আর একে কৃত্রিম বলে মনে হয় না।

ওরিয়া নামে একটা গ্রাম পেরিয়ে গেলুম। চাওলা বলল : এই গ্রামে হিন্দু মন্দির আছে, আছে জৈন মন্দিরও। কিন্তু তার চেয়েও যা বড় জিনিস আছে, সে গুরুশিখরে ওঠবার রাস্তা। আড়াই মাইল চড়াই রাস্তা ভাঙলেই আরাবল্লীবাসীর মাউণ্ট এভারেস্ট। চমৎকার খোলা শীতল জায়গা!

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল : তুমি তো ওপরে যাও নি!

চাওলা বলল : আমি তো বলি নি ওপরে উঠেছি!

যে ভাবে গল্প বলছ, সবাই ভাববেন যে ওপরটা দেখে এসেছ ?

তাতে কারও ক্ষতি নেই, বরং লাভ আছে। যে জায়গা এঁরা সময়ের অভাবে দেখতে পাবেন না, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা নিয়ে ফিরবেন!

বললুম : তুমি বলে যাও।

মিত্রার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে খুশী হল না।

চাওলা বলল : গুরুশিখরে গুরু দত্তাত্রেয়র পায়ের ছাপ আছে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : আপনি রামানন্দের পায়ের ছাপের কথা বলেছিলেন!

চাওলা হেসে বলল : তাও আছে। আর আছে একটি ছোট শিবের মন্দির আর একটি বড় ঘণ্টা।

অচল গড় জায়গাটি আমাদের ভাল লাগল। রাস্তার বামে দেখলুম কুমারপালের তৈরি একটি জৈন মন্দির, আর দক্ষিণে রাণা কুম্ভের ভাঙা প্রাসাদ। দেখলুম মন্দাকিনী কুণ্ড ও তার তীরে তিনটি মহিষের সঙ্গে আদিপাল পরমারের মর্মর মূর্তি। এই নিয়ে একটি গল্প আছে। একদা এই মন্দাকিনী কুণ্ড ঘিয়ে পূর্ণ থাকত, আর তিনটি রাক্ষস মহিষ মূর্তিতে এই ঘি চুরি করত। আদিপাল এক সঙ্গে এই তিনটি মহিষ বধ করেছিলেন।

খানিকটা এগিয়ে আমরা অচলেশ্বর শিব দর্শন করলুম। লিঙ্গমূর্তি নয়, পায়ের আঙুল। তার নিচে পাতালের পথ। মন্দিরের সামনে পিতলের নন্দী, তার এক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। লোকে বলে, আমেদাবাদের সুলতান মহম্মদ বেগরা হিন্দুর গড় লুট করতে এসে ভেবেছিলেন এই নন্দীর পেটে ধনরত্ন আছে লুকনো। তাই ফুটো করে ভিতরটা দেখেছিলেন। শিব তাঁকে

সাজাও দিয়েছিলেন এই জন্য। এক ঝাঁক মৌমাছি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সব ফেলে দিয়ে পালাতে তাঁরা পথ পান নি।

আরও খানিকটা উঠে আমরা কয়েকটি জৈন মন্দির দেখতে পেলুম। রাণা কুম্ভ ও তাঁর ছেলে উদার মূর্তি, ওখা রাণীর প্রাসাদ, আর শাবন ভাদোয়াঁ নামে এক জোড়া জলাশয়। চাওলা বলল: এই দোতলা মন্দিরটির ওপর না উঠলে অচল গড়ে ওঠা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মামা মামী উঠলেন না। মিত্রাও দাঁড়িয়ে রইল। স্বাতি ও আমি উঠলুম চাওলার সঙ্গে। সত্যিই উঠবার মতো জায়গা। এক দিকে গুরুশিখর আর এক দিকে নিচের সমতল ভূমি। রেল লাইনও দেখা যাচ্ছে আজমীর থেকে আবু আসছে, আর দেখা যাচ্ছে পাকা রাস্তা আবু স্টেশন থেকে পাহাড়ে উঠছে পাক খেয়ে খেয়ে।

নামবার সময় চাওলা বলল: নিচে আরও একটি দেখবার স্থান আছে। একটি দোতলা গুহা। লোকে বলে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাসস্থান।

নির্মল আনন্দে মন আমাদের পূর্ণ হয়ে গেছে।

অচল গড় থেকে নামবার সময় আমি আর চাওলা একটু এগিয়ে গিয়েছিলুম। পিছন ফিরে মিত্রা আর স্বাতিকে দেখলুম অনেকটা দূরে। বললুম : এঁদের সঙ্গে আমাকে দেখে তুমি আশ্চর্য হও নি!

কেন আশ্চর্য হব!

চাওলা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

বললুম : এঁরা সবাই দিল্লী থেকে আসছেন, আর আমি—

চাওলা একবার দমকা হাসি হেসে নিল, তারপর বলল : দোস্ত, তোমার কথাই আলাদা। আসল দুজন মানুষই তোমার পক্ষে। মেয়ে আর মেয়ের বাপ।

বল কি!

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে আরও কিছু জানবার চেষ্টা করলুম।

চাওলা বলল : কেন ন্যাকা সাজছ! আমার মতো একটা বিজনেস থাকলে মেয়ের মাও ভুলে যেতেন। আমার মতো ফুটো বিজনেস—

বলে চাওলা হাসতে লাগল।

মিত্রা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, বলল : অত হাসি কিসের?

গোপালবাবুকে আমার বিজনেসের পার্টনার করে নিতে চাইছি। কিন্তু কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

হঠাৎ বলে উঠল : স্‌প্লেনডিড কন্‌ফেসন। কী বলেছিলে যেন! —নিজের সম্পত্তি বলতে উত্তরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘর আছে, আছে নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন, আর ডালহৌসি স্কোয়ারে আছে সারি সারি টেবিলের ভেতর একখানা কাঠের চেয়ার।

বলে আর একবার সে হেসে উঠল।

গাড়ির কাছে পৌঁছে আমরা মামা মামীর অপেক্ষা করছিলুম। মামা কাছে এসেই বললেন : বড় উল্লাস দেখছি!

চাওলা বলল : গোপালবাবুকে একটু রাজধানীর খবর দিচ্ছিলুম। চাল চালিয়াতি ও বক্তৃতার যুগ এটা। ধোঁকা দিয়ে ধাপ্পাবাজী করে লুটে পুটে খাও। ভাল ছেলে হয়েছ কি পেটে ইঁদুরের ডন বৈঠক।

তার কথার ধরনে সবাই হাসলেন।

·

এবারে আমরা দিলওয়ারায় যাচ্ছি। মোটরে খানিকটা ঝাঁকানি খেতেই চাওলার মনে পড়ল তার কর্তব্যের কথা। বলল : একটা ভাল জায়গা তোমাদের দেখাতে পারব না।

কোন্ জায়গা বল তো!

বশিষ্ঠের আশ্রম। যদি থেকে যাও, তা হলে এক দিন সেখানে চড়ুইভাতি করতে ভুলো না। সিভিল স্টেশন থেকে মাইল তিনেক, তারপর সাত শো সিঁড়ি নামতে হবে। যা শুনলুম তাতে পরিশ্রমের মূল্য পেয়ে যাবে।

স্বাতি বলল : আমরা তা হলে শুনেই যাই।

চাওলা বলল : আমাকেও হয়তো আপনাদের সঙ্গেই ফিরতে হবে।

কেন?

সেই রকম কণ্ট্রাক্ট আছে।

আড়চোখে একবার মিত্রাকে দেখেই চাওলা বশিষ্ঠাশ্রমের গল্প শুরু করল : এবারে আশ্রমের কথা বলি। সিঁড়ি শেষ হয়েছে একটা নির্মল সরোবরে। সাদা মার্বল পাথরের একটা গোমুখের ভেতর দিয়ে স্ফটিকের মতো নির্মল জল পড়ছে। আশেপাশে কয়েকটি মন্দির—বশিষ্ঠ অরুন্ধতী, তাঁদের প্রিয় গাভী নন্দিনী ও প্রিয় শিষ্য রাম-লক্ষ্মণের মন্দির। যাত্রীদের থাকবারও জায়গা আছে।

এ তো পুরাণের গল্প : চাওলা বলতে লাগল : ইতিহাসের কথাও আছে এখানে। পৃথ্বীরাজের সভাকবি চাঁদ বরদাই অগ্নি-

কুলের গল্প লিখেছেন তাঁর বইএ। এখানে একটি অগ্নিকুণ্ড আছে। পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্বংশ করবার পর বশিষ্ঠ এখানে যজ্ঞ করেন। ব্রাহ্মণের শান্তি রক্ষার জন্যে ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন আবার হয়েছিল। এই কুণ্ড থেকেই অগ্নিকুলের জন্ম—পরমার, চালুক্য, পরিহার ও চৌহান বংশ।

তারই সঙ্গে যোগ করল: যদি নাস্তিক হও, মানতে না ইচ্ছে করে এই কথা, তবে টড সাহেবের বই পড়। ম্লেচ্ছ হয়েও তিনি এই গল্প মেনে নিয়েছেন।

মিত্রা উত্তর দিল: তবে আর কী!

খুশী হয়ে চাওলা বলল: এখানে আরও অনেক তীর্থ আছে—ব্যাস তীর্থ, নাগ তীর্থ। গৌতম আশ্রম বোধ হয় মাইল চারেক দূরে হবে।

বাহির থেকে দিলওয়ারার মন্দির দেখে ভিতরটা অনুমান করা যায় না। ভিতরে যার এত জাঁক, বাহিরে তার কোন বিজ্ঞাপন নেই। একটা মন্দির নয়, মন্দিরপুঞ্জ। এক সঙ্গে পাঁচটি মন্দির, কিন্তু লোকে দুটি দেখেই পরিতৃপ্ত মনে ফিরে আসে। চাওলা বলল: দিলওয়ারার মানে বোঝবার চেষ্টা কোরো। তুমিও তো আমারই মতো জাত আওয়ারা, দিল শুনেই ভুল করে বসো না। দিল এখানে দেবলের অপভ্রংশ। মানে, দেউলের দেশ।

স্বাতি হাসছিল তার কথা শুনে। চাওলা বলল: চল এইবারে।

মহাবীর স্বামীর মন্দিরের পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলুম। ডান দিকে ঘুরে দেখলুম হাতিশালা। সামনেই ঘোড়ায় চড়া বিমল শাহর মর্মর মূর্তি। তার পিছনে ভাঙা ভাঙা দশটি হাতি।

চাওলা আমাকে জিজ্ঞেস করল: বিমল শাহ কে ছিলেন জান?

খুশী হয়ে স্বাতি বলল: বল দেখি!

চালুক্যরাজ ভীমদেবের মন্ত্রী। আবুর পরমার রাজা ধন্দুক যখন বিদ্রোহ করেছিলেন তখন বিমল শাহ তাঁকে হারিয়ে আবুর

শাসনকর্তা হলেন। এ সব একাদশ শতাব্দীর ঘটনা। এই মন্দির তৈরি করেছেন বিমল শাহ।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে চাওলা বলল: বাঁচালে। তুমি বলতে না পারলে আমি বিপদে পড়তুম। এ সব কথা আমার মনে থাকে না।

তার ভাব দেখে স্বাতিও হাসল।

চাওলা বলল: তা হলেই বুঝতে পারছ বিমলবাসী মন্দিরের নাম ঠাকুরের নামে নয়, প্রতিষ্ঠাতার নামে। মন্দিরের ঠাকুর হল জৈন তীর্থঙ্কর।

মিত্রার দিকে ফিরে বলল: তুমি গোপালবাবুকে দিগম্বর জৈন মন্দিরটা দেখিয়ে আন। এই গাইড, সাথ্‌মে যাও।

মামা আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার সময় পেলেন না। চাওলা চেঁচিয়ে বলল: আসুন আমার সঙ্গে।

বলে স্বাতিকে নিজের পাশে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

অন্য পথ ধরেই মিত্রা বলল: চাওলার মতলবটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন।

সন্দেহ করছি।

চাওলা ভাবছে যে আপনার সঙ্গে একান্তে আমার কিছু কথা বলার দরকার। সেই সুযোগ আমাদের দিয়েছে।

একান্তে বলবার মতো কিছু আছে কি! আমি বিস্মিত হলুম। কিন্তু মুখে কিছুই বললুম না। মিত্রা বলল: আপনি কেন এসেছেন, কার ডাকে এসেছেন, সে কথা আমি জানতে চাইব না। আমি শুধু আমার প্রশ্নেরই উত্তর চাইব।

বললুম: আপনার প্রশ্ন বলুন।

মিত্রা বুঝি কিছু ক্ষুণ্ণ হল, বলল: প্রশ্ন! কোন প্রশ্ন কি আপনাকে আমি করি নি!

তাড়াতাড়ি আমি বললুম: সে তো প্রশ্ন নয়, সে অনুরোধ।

আদেশও বলতে পারেন। এখানে কয়েকটা দিন থেকে যেতে বলেছেন। সত্যি, এ কথা রাখতে পারলে আমি সুখী হব।

বাধা কিসের?

বাধা যে বাহিরের নয়, বাধা আর কোন খানে, সে কথা আমি বলতে পারলুম না। বললুম: দিল্লীতে আপনার একটা কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল। ওখলায় বলেছিলেন যে চাওলাকে আপনি ভালবাসেন, কিন্তু বিয়ে করবেন না।

বলেছিলুম। কিন্তু সে কথা এখানে কেন!

মনে মনে এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন? নারী হয়ে পুরুষকে ভালবাসবেন বন্ধুর মতো, কিংবা পুরুষ হয়ে নারীকে?

কেন সম্ভব নয় বলুন!

চাওলার কথাই আমার কাছে প্র্যাকটিকাল মনে হয়। সে এক দিন বলেছিল, পুরোপুরি অধিকার না পেলে ভালবাসা পানসে মনে হয়। পুরুষের প্রেম হবে বাঘের লোভের মতো।

নাক সিঁটকে মিত্রা বলল: বর্বরতা।

দিগম্বর মন্দির দেখে আমরা একটা ছোট স্তম্ভ দেখলুম, তার নাম কীর্তিস্তম্ভ। এরই গায়ে একটি লেখা দেখাল গাইড, বলল: মেবারের রাণা কুম্ভ যাত্রীদের কাছে শুল্ক আদায় নিষিদ্ধ করেছেন।

খানিকটা এগিয়ে মিত্রা বলল: আপনারও এই মত?

ভেবে দেখি নি। দেখবার দরকার হয় নি।

প্রয়োজন না হলে বুঝি আপনি কিছু ভাবেন না!

তাও না। সযত্নে এই ভাবনাটাকে এড়িয়ে যাই।

কেন বলুন তো?

তা হলেই নিজের কর্তব্য স্থির করতে হবে। কর্তব্যের বোঝা আমি বাড়াতে চাই না।

ও।

বলে মিত্রা চুপ করে রইল।

একট ছোটো মন্দিরের পাশ দিয়ে আমরা লুনবাসী মন্দিরে এলুম। নেমীনাথের মন্দির, নির্মাণ করেছেন লুনিঙ্গের ছোট দুই ভাই বস্তুপাল ও তেজপাল। এঁদের দেশ গুজরাট, ধর্ম জৈন। সৌরাষ্ট্রের পলিতানা ও জুনাগড়ে জৈনদের বিরাট কীর্তি। এঁদের দানও কম নয়।

বিমলবাসী ও লুনবাসী মন্দির দুটি দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। মর্মরের অপূর্ব মন্দির। অজস্র অদ্ভুত বেদনার্ত কারুকার্য। নিষ্ঠুর সুন্দর। পায়ের নিচের মসৃণ মেঝের দিকে তাকিয়ে খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। সম্পদের শ্রমের ও সৌন্দর্যের এমন বেপরোয়া অপচয় আর কোথাও আমরা দেখি নি। টড সাহেব ঠিকই বলেছেন, তাজ ছাড়া ভারতের অন্য কোন সৌধের সঙ্গে এদের তুলনা হয় না।

চাওলা কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল দেখতে পাই নি। বলল ঃ কেমন দেখছ বন্ধু ?

সংক্ষেপে বললুম ঃ চমৎকার !

আমার কী মনে হচ্ছে জান ! আমার এক শেঠের কথা মনে পড়ছে। লায়ালপুরে আমাদের বাড়ির পাশে ছিলেন শেঠ মহাবীর প্রসাদ। বিরাট ধনী, কিন্তু প্রতিবেশী বলে আমাদের যাতায়াতের ছিল অবাধ অধিকার। আমরা তখন ছোট ছেলে। কিন্তু সেই বয়সেই জেনেছিলুম যে শেঠজীর মতো ধার্মিক লোক ভারতে আর নেই।

মন্দির থেকে তখন আমরা বেরিয়ে আসছি। মামা মামীও সঙ্গে ছিলেন। তাঁরাও দেখলুম কৌতূহলী হয়েছেন। চাওলা বলল : শেঠজীর বাড়ির ভেতর একটা মস্ত পুকুর ছিল। তার অর্ধেক জল নাকি গঙ্গার। ক্যানেস্তারা ভরে জল এনে এনে সেই পুকুরে তিনি ঢালতেন। সকাল বেলায় স্নান সেরে খালি গায়ে পাড়ায় বেরতেন। বাঁ হাতে একটা চিনির থলে, আর ডান

হাতে সেই চিনি ছড়াতেন রাস্তার ধারে। পিঁপড়ের খাবার। বাড়ি ফিরে এক ধামা লুচি আর হালুয়া লায়ালপুরের ষাঁড়গুলোকে নিজে হাতে খাওয়াতেন। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

কলকাতার বড়বাজারেও এমন ধার্মিক আছেন শুনেছি। কিন্তু সে কথা আর চাওলাকে বললুম না। চাওলা বলল: শেঠজীর গদি ছিল বাজারে, কিন্তু একটা গুদাম ছিল বাড়ির পিছনে। ঘিয়ের বড় ব্যবসা ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও আমরা অনেক কাজ দেখতুম। বড় বড় ক্যানেস্তারা কেটে কেটে চাকরেরা ঘিয়ের সঙ্গে ঘি মেশাত। চাকরদের আমরা বলতুম, তোমরা বোকার মতো খাট, ভরা টিনগুলো খালি করে আবার ভরছ। এক দিন একটা চাকর বললে, এ তো ঘি নয়, এ চর্বি, নেপাল বর্ডার থেকে আসে। ঘিয়ের সঙ্গে এই চর্বি মেশাই।

সত্যি!

স্বাতি যেন শিউরে উঠল।

চাওলা বলল: পর দিন শেঠজীকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। বলেছিলুম, ষাঁড়েরা যে লুচি খায়, তা কোন্ ঘিয়ের? শেঠজী উত্তর দেন নি, কিন্তু আমার বাবা দিয়েছিলেন। ডেঁপো ছেলে বলে বেদম প্রহার করেছিলেন সেদিন।

বলেই দমকা হাসিতে সে একেবারে ভেঙে পড়ল। মামা হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে গেলেন। এই হাসির পিছনে যে বেদনা, তা তো হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আর একটি মন্দির আমরা দেখলুম। সেটি নাকি শিল্পী ও মজুরদের তৈরি। পয়সার বিনিময়ে যারা একদিন বছরের পর বছর এখানে কাজ করেছিল, তারাই তাদের অবসরের সময় এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিল বিনা পারিশ্রমিকে। কিন্তু কেন করেছিল, সে কথা কেউ বলতে পারল না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়েছিল সবচেয়ে বেশি! বলল: তারা কি সময় কাটাবার জন্যে এই কাজ করত?

এ কথার উত্তর আমার জানা ছিল না। তাই বললুম: কিংবা ধর্মের টানেও হতে পারে। ধনী যেমন মন্দির নির্মাণ করে দেবতার জন্যে, আর যাত্রীদের জন্যে ধর্মশালা, কিংবা পুণ্যের লোভে খনন করে পুষ্করিণী, এও তেমনি শ্রমিকদের পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা হতে পারে?

স্বাতির বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল: শ্রমদানের এই আদর্শ কি এদেশে আবার ফিরে আসবে!

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আজ কেউই পারবে না।

গাড়িতে উঠবার সময় মামী জিজ্ঞাসা করলেন স্বাতিকে: কী ঠাকুর দেখলাম রে?

চুপি চুপি স্বাতি বলল: গোটাকয়েক ধ্যানস্থ মূর্তি দেখেছি। কোন জৈন তীর্থঙ্করের হবে।

মিত্রা যে মুখ টিপে হাসল, আমি তা দেখতে পেলুম। কিন্তু মামী দেখতে পান নি। বললেন: বেশ মন্দিরটি।

স্বাতি বলল: চমৎকার।

আমার দিকে ফিরে বলল: জান গোপালদা, অসংখ্য ছবি তুলেছি।

মামা হেসে বললেন: শুয়ে বসে গড়িয়ে কিছুই বাদ রাখে নি।

বিড়লা মন্দিরের মতো নকল মনে হল না?

চাওলা জিজ্ঞাসা করল।

নকল! আমি চমকে উঠলুম। বেশি ঐশ্বর্য কি নকলেরই শামিল!

গাড়িতে বসে চাওলা আমাদের কুমারী কন্যার গল্প শোনাল। এই দিলওয়ারা গ্রামেরই একটি অনাদৃত মন্দিরের গল্প। বলল: লোকে বলে রসিয়া বালম, আমার মনে হয় রসিক বাল্মীকি। একজন ঋষি একটি দেবীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল: তুমি তো দেখ নি।

সবই কি সবাই দেখে বলে! মঙ্গল গ্রহে কী আছে, তাও তো লোকে বলছে। তাদের বাধা দাও তুমি!

আমার দিকে ফিরে বলল: শোন গোপালবাবু, রসিক বাল্মীকির গল্প তোমাকে বলি। সেই বুড়ো ঋষি এক দিন একটি কুমারী

কন্যার প্রেমে পড়লেন। তারপর তার মাকে ধরাধরি। মা রাজী হয় না। শেষ পর্যন্ত এই শর্তে রাজী হল যে রাতারাতি বুড়োকে এই পাহাড় থেকে ওঠা নামার জন্যে একটা রাস্তা করে দিতে হবে।

তথাস্তু! বলে বুড়ো আদাজল খেয়ে কাজে লাগলেন। রাতের শেষ প্রহরে কাজও প্রায় শেষ করে এনেছেন। এমন সময় শুনলেন মুরগির ডাক। এই যা! এত শ্রম ব্যর্থ হল! বলে বুড়ো বাড়ি ফিরে এলেন। দেখলেন, তখনও সূর্যোদয় হয় নি। বুঝতে পারলেন যে এ মেয়ের মায়ের কারসাজি। তখুনি তাদের শাপ দিয়ে পাথরের মূর্তি করে দিলেন। তাতেও রাগ পড়ল না। মায়ের মূর্তিটাকে দিলেন গুঁড়ো করে, কিন্তু মেয়ের মূর্তিটার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। রাগের মাথায় এ তিনি কী করলেন! ছোট একটি মন্দিরের ভেতর তাদের এই মূর্তি আজ পূজো পাচ্ছে।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তেও দেখেছি কন্যাকুমারীর মন্দির। কুমারী কন্যা তা হলে সর্বত্রই আছে। ব্যর্থ প্রেম ভগ্ন মনোরথ কন্যা।

বললুম: এবারে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

চাওলা বলল: যেখানে দরকার। অর্থাৎ হোটেলে। ভরা পেটে তোমার কর্তব্য স্থির কোরো।

আমি জানি সে কিসের ইঙ্গিত করল। মিত্রার দৃষ্টি বুঝি আর একটু কঠিন হল।

খেয়েদেয়ে মামী বললেন: রাজস্থানের জিনিস কিছু নেব না!

মামা বললেন: তাই তো, রাজস্থান ভ্রমণ তো আমাদের এইখানেই ফুরল।

চাওলা বলল: হাতে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। চলুন, আপনাদের রাজস্থানের সরকারী দোকানে নিয়ে যাই।

মামীর ভারি পছন্দ হল এই দোকানটি। সবই আছে। জয়পুরের ছাপা শাড়ি, জরির কাজকরা ব্যাগ, নাগরা জুতো, ছাপা বেডকভার ও টেবলক্লথ, তার উপর পিতল হাতির দাঁত ও চন্দন

কাঠের জিনিস। মামী দু হাতে কিনলেন। মিত্রাকে একটা জরির কাজ করা ব্যাগ দিলেন, চাওলাকে নাগরা। আমাকে বললেন: তোমাদের জিনিস বাড়ি গিয়ে বার করব।

আবুর সিভিল স্টেশনে আমরা ফিরে এলুম। যে গাড়ি আমাদের এনেছিল, সে এসে তৈরি আছে। এ গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে। মামা হেঁকে বললেন: গোপাল, তুমি সামলাও। ও যেন ভাড়া দিতে না পারে।

এখানে মোটরের হিসেব দেখলুম চমৎকার। মিটার নেই। সানসেট পয়েন্ট নকি লেক অচল গড় থেকে যাতায়াতের ভাড়া বাঁধা আছে। তার সঙ্গে ওয়েটিং চার্জ। মোটর কতক্ষণ আমাদের কাছে ছিল, তার থেকে যাতায়াতের জন্যে খানিকটা সময় বাদ দিয়ে নিমেষের মধ্যে সর্দারজী বিল তৈরি করে দিলেন। মামা ততক্ষণে অফিসের ভিতর পৌঁছে গেলেন। নিজেই টাকাটা মিটিয়ে দিলেন।

মিত্রা ও চাওলার কাছে বিদায় নিয়ে মামা ও মামী মোটরে উঠে বসলেন। স্বাতিও বিদায় নিল, স্বাতিও উঠল। কিন্তু আমি এমন সহজ ভাবে বিদায় নিতে পারলুম না। মিত্রার কঠিন দৃষ্টির সামনে শরীর যেন আড়ষ্ট বোধ হল। চাওলা বলল: তুমি থাক, তোমার জায়গায় আমি চলে যাই।

আমি পিছন ফিরে মামা মামীকে দেখলুম, দেখলুম স্বাতিকে। সামনে মিত্রা। ভাল করে অনুভব করলুম নিজের অবস্থাটা। মন আমার মোটরে গিয়ে বসেছে, কিন্তু মিত্রাকে উপেক্ষা করি সে সাহস আমার নেই। চাওলার কথার কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

মামা ডাকলেন: এস গোপাল, সময় হয়ে গেছে।

মামী বললেন: আর দেরি কোরো না।

মনে হল যে মামীও উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কিন্তু কৌতুক দেখলুম

স্বাতির চোখে। এমন নিশ্চিন্ত ভাবে হাসল যে কর্তব্য স্থির করতে আমার আর একটুও দেরি হল না। চাওলার দিকে হাত বাড়িয়ে বললুম: আসি।

মিত্রাকে নমস্কার করলুম।

চাওলা ডান হাতে আমার হাত চেপে ধরেছিল। আর বাঁ হাতে তার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে আমার পকেটে গুঁজে দিল, বলল: ভেবেছিলুম, এটা মিত্রার হাতে দিয়ে আমি তোমার জায়গায় ফিরে যাব। কিন্তু তার যখন দরকার হল না, তুমিই এখানা নিয়ে যাও।

মিত্রার দৃষ্টি যে এত কঠিন হতে পারে, আগে কখনও দেখি নি। কিন্তু শুধুই কি কঠিন! তার আড়ালে আর কিছু জমে নেই! যদি কিছু থাকে তো সে চাওলা দেখবে। আর দেরি না করে আমি ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলুম।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আমি আবার তাদের দেখবার চেষ্টা করলুম। চাওলা আর মিত্রা হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করেছে। দেখে অদ্ভুত ভাল লাগল। পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করে দেখলুম, অত্যন্ত কাঁচা হাতে এক ছত্র কবিতা লেখা: তোমারই হউক জয়।

চাওলা বলেছিল যে মিত্রার কাছে সে বাঙলা শিখেছে। আগে দেখলে এই কাগজখানা আমি তাকেই উপহার দিতুম।

রাজস্থান পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

ভ্রমণের আনন্দ চিরন্তন—নূতন দেশ দেখার বাসনা একটা নেশার মতো। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের কাছে তো অপরিহার্য; যাঁরা ভ্রমণ না করেও ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁরাও রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর আশ্চর্য গ্রন্থ রম্যাণি বীক্ষ্যর পর্বগুলি পর পর পড়ে যান। ভ্রমণের শখ তাঁদের অনেকাংশে মিটবে।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, রম্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল তারই কথা। আর বাস্তবিকই রম্য-দর্শনই হল রম্যাণি বীক্ষ্যর মূল সুর, তার বিস্তার অতীতের ঐতিহ্য আলোচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, পৌরাণিক কাহিনী ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। এতে সমগ্র ভারতের বিচিত্র দর্শনীয় স্থানগুলির সবিস্তার বর্ণনার সূত্র ধরে লেখক তাদের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট-আলোকিত কঠরিতেও যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তীর্থ-মাহাত্ম্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্যের বা সংশ্লিষ্ট তীর্থ ও জনপদের বর্তমান পরিচয় দানেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তার অতীত কাহিনী কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে বিবৃতি হয়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ—নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে।

শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর পাশে পাশে একটি রম্যকাহিনীও গ্রথিত আছে। এই জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনী বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসের সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এ গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণরসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাসরসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ধরতে এসেছেন। স্টেশনে তাঁদের ভৃত্য নিখোঁজ, আর এ সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। কিন্তু সামাজিক মাপকাঠিতে গোপালের বাজারদর যাই হোক, সুরুচি ও সুশিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন আর গোপালও স্বাতির চোখের তারায় আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। ফলে সেও হল তাঁদের সহযাত্রী।

প্রথম গ্রন্থ **অন্ধ্র পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ধরা দেবার মতো সহজ পাত্রীও সে নয়। সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াডা ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুর ও পক্ষী তীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরু-চেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কর্ণাট পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কেরালা রাজ্য থেকে নীলগিরি, সেখান থেকে মহিসুর রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেল-গোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

তারপর যখন যবনিকা উঠল তখন গোপালকে দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত দেখা গেল। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়। মামা গোপালকে গরিব জেনেও জামাই করতে পারতেন, কিন্তু নিতান্ত সামাজিক কারণে মামীর তাতে গভীর আপত্তি।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা। গোপাল ও স্বাতির সম্পর্ক আগের মতই সহজ রইল।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্যস্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **মহারাষ্ট্র পর্বে**ও তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুণা ভ্রমণে ব্যস্ত। তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু বিদিশা ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ও খাজুরাহো।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পযন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা। কুমায়ুনের শৈলাবাস ও হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলির পরিচয়ও এতে বাদ পড়ে নি।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুইজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে

কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস্ বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। একদিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্যদিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে যাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা নাগারাজ্য ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্প পরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার কথা। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

বাকী আছে **পশ্চিম বাঙলার** কথা।

এ. মুখার্জী
প্রকাশক